জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

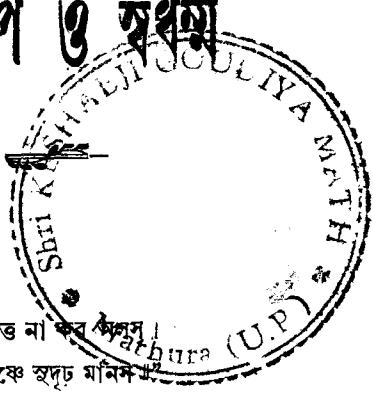

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-
প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৮২

ছয় টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, কলিকাতা-২

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কয়ার) কলিকাতা-১২

ঢাকা ষ্টোর্স
রাজার বাজার, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌররায় গোস্বামী
কোয়ার্টার নং সি. এন. ৯০, দুর্গাপুর-২, জিলা-বর্ধমান।

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

—নিবেদন—

(প্রথম সংস্করণের)

'শ্রীশ্রীগৌররায়'-হরি—আমার অভিভাবক ও আরাধ্য দেবতা যিনি—তাঁহারই সুমঙ্গল ইচ্ছায়, 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' প্রকাশিত হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হইবে কি না, অথবা বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের কোনও উপযোগিতা আছে কি না, আমি নিজে তাহা বুঝিতে পারি নাই। নিরপেক্ষ পাঠকগণের স্বাধীন চিন্তাই সে বিষয় নির্ণয় করিবে। পুস্তক সম্বন্ধে আমার বলিবার বিষয় কেবল এই যে, ইহা সার্থকতা বা নিরর্থকতা যাহাকেই বরণ করুক না কেন,—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিবার জন্য অন্ততঃ যে-টুকুও যোগ্যতা থাকার আবশ্যক, আমাতে তাহার বিশেষ অভাব আছে—ইহা যেমন আমার অন্তরের অকপট-বিশ্বাস, সেইরূপ আমার ইহাও বিশ্বাস যে, যন্ত্র-চালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত, জানি না কি অভিপ্রায়ে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানেরই প্রেরণা, আমাকে এই পুস্তক লিখাইয়াছেন; অতএব ইহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই গ্রন্থের দ্বারা যদি কেহ কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার বোধ করেন, তবে তাহার জন্য তিনি শ্রীভগবানকেই ধন্যবাদ দিবেন; আর ইহাতে ভ্রম, প্রমাদাদি যে-কিছু দোষ পরিলক্ষিত হইবে, তাহার জন্য একমাত্র আমার অযোগ্যতা ও অজ্ঞতাকেই দায়ী জানিয়া, সদাশয় সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুকম্পায় আমি যে সকল মহানুভবের নিকট বিবিধ প্রকারে উপকৃত, তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। সুপ্রসিদ্ধ 'শ্যামসুন্দর' পত্রিকায় 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক যে প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়,—এই পুস্তক তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও বহুল পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয় সেই প্রবন্ধ প্রকাশকালে আমাকে নানাপ্রকারে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহা না পাইলে আমি এবিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি তদীয় অনাবিল স্নেহাভিষিক্ত প্রীতি, ইহাও আমার নিকট অসামান্য সম্পদ বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ জগৎপূজ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎ দৌহিত্র বংশ বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত

শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের নিকট হইতেও আমি বিশেষভাবে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার এই প্রাচীন বয়সে ও অসুস্থতার মধ্যেও তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়া ও যেরূপ আন্তরিকতার সহিত ইহার ভূমিকা লিখিয়া ইহার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁহার সেই স্নেহের ঋণ অপরিশোধনীয়। তৃতীয়তঃ, যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য, ভক্ত, মনীষী ও সজ্জন আমার এই অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ও অভিমতাদি প্রদান পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকেও আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, কলিকাতাস্থ গৃহী-ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য আমার নিকট মূল্যবান সম্পদ;—ব্যবহার ও পরমার্থ পথে যাঁহারা ছায়ার ন্যায় সুখে, দুঃখে, উৎসাহে, নিরুৎসাহে—সকল অবস্থায় আমার সঙ্গী; সেই সকল উদার-চরিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনচন্দ্র রায়, বি-এ; মহাপ্রাণ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীমান্ শ্যামাপদ সিংহ, বি-এল, শ্রীমান্ রাধাশ্যাম রায়, বি-এল, শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দে, শ্রীমান্ হরিমোহন শীল, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমান্ যুগল কিশোর দে প্রভৃতি ও পরবর্ত্তীকালে "হা-গৌরাঙ্গ" নামসাধক—শ্রীমৎ নারায়ণদাস ভক্তের নাম এই পুস্তক-প্রকাশ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইঁহাদেরই উৎসাহে ও চেষ্টায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। যদি কোন ভক্তের হৃদয়ে এই গ্রন্থ কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ প্রদানে সমর্থ হয়, তবে তাহার বিনিময়ে ইঁহাদিগের কৃষ্ণভক্তিবর্দ্ধনের জন্য শ্রীভগবৎ-সমীপে তিনি যেন প্রার্থনা করেন,—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। ইতি—

ভাজনঘাট (নদীয়া)
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৯০

শ্রীশ্রীগৌররায়-চরণাশ্রিত
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

॥ শ্রীহরিঃ ॥

উৎসর্গ-পত্র

ঘোর তিমিরাবৃত ও নিদ্রালস-নিমীলিত নয়ন

যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণ-সম্পাতে

উন্মীলিত হইয়া উঠে,

সেইরূপ

যাঁহার অসীম করুণার একটি কিরণচ্ছটায়

আমার চির-তমসাচ্ছন্ন ও অবিদ্যা-নিমীলিত

নয়ন সম্মুখেও

শ্রীনাম-প্রধান-ভক্তির উজ্জ্বলতম পথ

প্রকাশ পাইয়াছে,

সেই আমার সর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজ ও পরমারাধ্যতম

শ্রীগুরুদেব ও পিতৃদেব

শ্রীহরিপাদপদ্ম-গত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ)

শ্রীশ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-প্রভুপাদের

পুণ্য-স্মৃতি তর্পণ স্বরূপ

অযোগ্য শিষ্য ও অকৃতি সন্তানের

এই প্রথম অর্ঘ

তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ত এতদধি গচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥

(শ্রীভা° ১২।৬।৩৩)

— তাৎপর্য্যার্থ —

তাঁহারাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারেন;—যাঁহাদের চিত্ত হইতে নিজ দেহে "আমি" ও সেই দেহ-সম্বন্ধীয় গেহ-বিত্ত-কলত্রাদি অনাত্ম বিষয়ে "আমার"-বুদ্ধিরূপ দুর্জ্জনতা দূরীভূত হইয়াছে।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগৌররায়জীর অপার করুণায় এবং সুধী ও সজ্জনবৃন্দের শুভেচ্ছায়, এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমানে মুদ্রণ-ব্যয় তিন-চার গুণ অধিক হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া ইহার মূল্য ছয় টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। তথাপি যদি কোন পাঠক ইহার পাঠে মূল্য অপেক্ষা অধিকতর লাভবান্ মনে করেন, তাহা হইলেই আমাদের আনন্দের বিষয় হইবে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে—বর্তমানে কালপ্রভাবে পরমার্থের মধ্যেও অনর্থের সঞ্চার পরিদৃষ্ট হইতেছে। গ্রন্থকার-কৃত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম', 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি' এবং 'ভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই মুক্ত কণ্ঠে মত প্রকাশ করিয়াছেন। (গ্রন্থের ভূমিকা ও অভিমত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থত্রয়ের নাম প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ না করিয়া, উহার অংশ বিশেষ প্রবন্ধাকারে কিম্বা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া অথবা ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বা প্রকাশের উদ্যোগ চলিতেছে—এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমরা তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এই মাত্র নিবেদন জানাইয়া রাখিতেছি যে,—উক্ত গ্রন্থ তিনখানির প্রথম মুদ্রাঙ্কণ কাল নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল;* যদি উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকাংশ সকলের সহিত অন্য কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদির একরূপতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উভয়ের মুদ্রাঙ্কণ কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, পূর্ব্বাপর বিচার দ্বারা আসল ও নকল নিরূপণ করিবার পক্ষে

---

*১। 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' ভাদ্র ১৩৩৮ সাল হইতে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 'শ্রীশ্যামসুন্দর' পত্রিকায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রাঙ্কণ ১৩৪০ সাল।

২। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ) ১৩৪৯ সালে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত।

৩। শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা—শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৩।

কোন অসুবিধা হইবে না। আপাততঃ এ-বিষয়ে মাত্র এইটুকুই ইঙ্গিত করিয়া রাখিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে আমি নিম্নোক্ত সজ্জনগণের নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করি। তন্মধ্যে (১) আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীহরিনাম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (B. Sc., Dip. Lib.) মহাশয়, তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াও এই পুস্তক প্রকাশন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। (২) আমার মুদ্রিত গ্রন্থ স্বগৃহে সযত্নে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অশেষ মঙ্গলাস্পদ ভজনশীল ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সিংহ মহাশয়। (৩) এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন—চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুশীল সরকার। (৪) এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন কার্যের গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছেন নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বর্তমান নব-নিযুক্ত বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক—পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ কানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ। (৫) বিশেষতঃ আমার সকল গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়েই যাহার আনুকূল্য ও আন্তরিকতা সংশ্লিষ্ট থাকে, সেই শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজননিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ বাঙ্গালা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়। (৬) এবং বাসন্তী আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ নিয়াছেন অসুস্থ শরীরেও—এই সমস্ত কারণে ইঁহাদের সকলেরই পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীশ্রীগৌররায় হরির শ্রীচরণকমলে।

কলিকাতা
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৯০
কার্ত্তিক, ১৩৮২ সাল।

ভক্তপদ-রেণু প্রার্থী,
বিনীত
প্রকাশক।

ভূমিকা

দীর্ঘকাল অকর্ম্মণ্যতা ও উদাসীনতা বা মোহনিদ্রার পরে কোন সমাজে যখন জাগরণের চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়, তখন অধিকাংশ স্থলেই সাহিত্যেই তাহার প্রথম উন্মেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সাহিত্যকে নানা ভাবের মধ্য দিয়া আত্মগঠন করিতে হয়। অনেক প্রকার ঘাত সংঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও গড়ন ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া সাহিত্য-জীবন বিকশিত ও সম্পুষ্ট হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের নব-জাগরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সময়ে বহুল ত্রুটি দৃষ্ট হইলেও, আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, এখন সমাজদেহ, জীবনের স্পন্দনে পরিস্পন্দিত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে; জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে, সূত্রাত্মা সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই উদ্যম উদ্দামের সময়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের বর্ত্তমান আবির্ভাবের সময় যে সকল মহাপুরুষ সান্ধ্য আকাশের তারার ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রেম-ভক্তির স্নিগ্ধালোকে সমাজপ্রাণকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাপুরুষবৃন্দের বংশধরগণেরও এখন আত্মস্মৃতি সঞ্জীবিত হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। যে প্রেম-ভক্তির পীযূষ প্রবাহে ইঁহাদের পবিত্রাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ মৃত-সমাজের শুষ্ক অস্থি-কঙ্কালে প্রীতি-ভক্তির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যান্বিত গৌরবময় কুসুমিত কুঞ্জকাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের কাব্য সম্পদে বাঙ্গালার মৃত-সাহিত্যে নবপ্রাণ, নবসৌন্দর্য্য ও নবমাধুর্য্য আনিয়া দিয়া জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, জাগতিক সাহিত্যে বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যকে সম্মানার্হ ও পূজার্হ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন আপনাদেরই বংশগত কার্য্যাধিকার বুঝিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইতেছেন। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহাশয়ের নাম সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিরচিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথার অবতারণার পূর্বে গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি।

পাঁচশত বৎসর পূর্বে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লীবিশেষে সময়ে সময়ে যে সকল মহানুভব মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেন, সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল প্রভায় নরনারীগণের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেন, প্রেমভক্তির যমুনা-জাহ্নবী-প্রবাহে ত্রিতাপতাপে প্রতপ্ত নরনারীগণের হৃদয় অভিষিক্ত করিতেন, আদর্শ চরিত্রের সুস্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় নরনারীগণের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার প্রভাব সংস্থাপন করিতেন, এই গ্রন্থকার সেই সকল মহাত্মারই একতমের সর্ব্বগুণান্বিত সুযোগ্য বংশধর।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে যে সকল মহাত্মার নাম ভক্তিভরে গৃহীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রীসদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস ও তৎপুত্র শ্রীকানু ঠাকুর বা ঠাকুর কানাই, এই পুরুষত্রয়ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদরূপে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

'শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর॥'

(শ্রীচৈতন্য-চারতামৃতে ; আদি—১১ পঃ।৩৫-৭)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে 'ভক্তামৃত' নামক উত্তর খণ্ডে নির্ণীত হইয়াছে —শ্রীহরিভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত; এতাদৃশ পাণ্ডবগণ হইতেও কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ, —আবার সমস্ত যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ; উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী; যে হেতু শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ও সেই ব্রজদেবীগণের শ্রীচরণধূলি প্রার্থনা করেন; আবার এতাদৃশ ব্রজরমাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন,—

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ ৪।১)

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা যূথেশ্বরীদিগের মধ্যেও শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। যাঁহাদিগের যূথমধ্যে কোটি কোটি গোপী ছিলেন।

এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত-বল্লভা বলিয়া, একমাত্র শ্রীরাধিকাই সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি।

আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীল সদাশিব কবিরাজকে পূর্ব্বলীলার সেই চন্দ্রাবলী রূপেই নির্ণীত দেখিতে পাই,—

'চন্দ্রাবলী প্রাণতুল্যা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।' (অনন্ত সংহিতা)

'পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা।
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিবঃ॥'

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১৫৬)

শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীল পুরুষোত্তমদাসও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিভাজন ছিলেন। শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের সহচর—দ্বাদশ-গোপালরূপে বিখ্যাত যে কয়েকজন মহাত্মা এই বঙ্গদেশে নাম ও প্রেমের বিশাল প্লাবন আনিয়াছিলেন, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুর সেই সকল মহাত্মারই অন্যতম ছিলেন। ইনি

পূর্ব্বলীলায় স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সখার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'স্তোককৃষ্ণ' রূপে বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন ;

'স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।'

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা—১৩০)

'স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম' ॥ (ভক্তমাল)

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীল দেবকীনন্দন এই শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পদাশ্রয় করিয়া পরম পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিলেন,—ইহাও 'বৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল পুরুষোত্তমদাসের পুত্র শ্রীকানু-ঠাকুরও পিতা ও পিতামহের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদরূপেই সম্মানিত হইয়াছেন অতি শৈশবকালে ইঁহার নাম ছিল 'শিশু-কৃষ্ণদাস'। অত্যল্প বয়সেই ইহার হৃদয়ে অলৌকিক প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে প্রিয়-নর্ম্মসখাগণেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান ; তন্মধ্যে আবার সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন ;—'প্রিয় নর্ম্ম-বয়স্যেষু প্রবরৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।'—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর তদীয় 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে * ইঁহাকে ব্রজের সেই উজ্জ্বলসখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

'পুরুষোত্তম-সুত শিশু-কৃষ্ণদাস গোস্বামী
উজ্জ্বল স্বরূপ অনুভবে জানি আমি ॥'

ইনি কিশোর বয়সে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অনুপমনৃত্য-ভঙ্গিমার সহিত অপূর্ব্ব বংশীবাদন-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, শ্রীপাদ শ্রীজীব

* শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' গ্রন্থ. হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে, নিত্যধামগত কবিরাজ ৺সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহাশয় কর্ত্তৃক ৪২৯ চৈতন্যাব্দে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। পরে সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় কর্ত্তৃক উহার অপর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভৃতি ব্রজবাসী আচার্য্যগণ চমৎকৃত হয়েন এবং সেই সময় হইতে তাঁহাকে 'শ্রীকানু-ঠাকুর' নামে অভিহিত করেন। এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহোদয় তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

'কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে।
মহা অনুভাব তাঁর দেখিয়াছি নয়নে॥
সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল।
মণিহার কণ্ঠে দোলে গলে বনমাল॥
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইল প্রতীত॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন॥
সেই হৈতে হৈল নাম 'শ্রীকানু-ঠাকুর'।
কি আর কহিব তাঁর মহিমা প্রচুর॥
এই উজ্জ্বল সখার কৃপা কিছু যারে হয়।
সহজেই সেই জন রাধাকৃষ্ণ পায়॥'

কথিত আছে এইনৃত্যকালে তাঁহার চরণস্খলিত নূপুর বিচ্ছুরিত হইয়া যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে পতিত হয় ; এই কারণে পরবর্ত্তীকালে তিনি বোধখানা গ্রামকেই স্বীয় বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করেন। এখানে তাঁহাদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা-প্রাণবল্লভবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান আছেন* এবং তাঁহার পঞ্চমদোল উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এই স্থানে আনন্দময় উৎসবাদি হইয়া থাকে এবং তদ্দিনে আশ্চর্য্য কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হয়।

---

* পাকিস্তানী হাঙ্গামায় স্থানান্তরিত হইয়া; বর্ত্তমানে কলিকাতায় বরাহনগরে ১।১ পাঠবাড়ী লেন. শ্রীমৎ গৌরহরি গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামীগণের মধ্যে কেহ কেহ বোধখানা হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্রীশ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামক যুগল বিগ্রহত্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি তাঁহাদিগের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীল ঠাকুর কানাই, এই পরম প্রেম-ভক্তিসম্পন্ন পবিত্র বংশের শেষ নিত্যসিদ্ধ পুরুষ। এই নিমিত্ত 'ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামী' বলিয়াই ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

বঙ্গের বৈদ্যবংশ চিরদিনই প্রতিভার জন্য প্রখ্যাত। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৈভব-গৌরবে চিরদিনই ইঁহারা জনসমাজে মানাস্পদ হইয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে ইঁহাদের মধ্যে বহুল সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নয়, শাক্ত ও শৈব-সম্প্রদায়েও এই বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক ত্যাগী বৈদ্য সাধক ও সিদ্ধপুরুষের নাম আমরা শ্রুত হইয়া আসিতেছি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতকারগণের মধ্যেও শ্রীল মুরারি গুপ্ত, শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল লোচন দাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষ স্বীয় আবির্ভাব দ্বারা বৈদ্যবংশ ধন্য করিয়াছেন। শ্রীল সদাশিব কবিরাজ হইতে শ্রীল ঠাকুর কানাই পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই নিত্যসিদ্ধ পুরুষত্রয়ের* আবির্ভাবেও সেইরূপ বৈদ্যবংশের গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীকানু ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়েও এই বৈষ্ণব কুলে অনেক পুণ্যাত্মা ও কৃতবিদ্য সাধুপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যা-গৌরবে ও ভক্তি-বৈভবে ইঁহাদের অনেকেই সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালেও এই বংশে যে সকল স্বধর্ম্ম-

* কোন কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিকের মতে, শ্রীল কংসারি সেন ব্রজের রত্নাবলী সখী, শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পিতা। তাহা হইলে এই বৈষ্ণব বংশকে উপর্য্যুপরি চারি পুরুষ নিত্যসিদ্ধের বংশ বলা যায়।

পরায়ণ ও কৃতবিদ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 'শ্রীকানুতত্ত্ব-নির্ণয়'-প্রণেতা ৺বিহারীলাল গোস্বামী ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞ ৺হারাধন গোস্বামী মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহার গীতি-কাব্যনিঃসৃত ভক্তিরস এক বিপুল আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্বনামধন্য পরম-শ্রদ্ধাস্পদ ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামি মহোদয় ভাজনঘাটে এই পবিত্র বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ঢাকায় সাক্ষাৎকার হয়। আমি তখন তরুণ যুবক, তিনি প্রবীণ। তাঁহার কবি-প্রতিভায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়; স্বপ্ন-বিলাস, বিচিত্র-বিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও ভরত-মিলনের অনেক গানই আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল; এখনও সেই গানগুলি আমার স্মৃতিপটে বিরাজমান আছে। প্রাচীনকালের ভক্তনিষ্ঠ সদাচার সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের আচার, ব্যবহার, সৌজন্য ও বিনয়, আমি নিজেও তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই গ্রন্থ-প্রণেতার পরমারাধ্য ঋষিকল্প নিত্যধামগত পিতৃদেব, কবিরাজ ৺সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ, এল-এম-এস, মহাশয় আমার পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব উপজাত হইয়াছিল। বয়সে তিনি আমার দীর্ঘকালের কনিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্থৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে বিদ্যানুরাগিতায়, ত্যাগ-স্বীকারে, সত্যনিষ্ঠায়, মিতভাষিতায়, সরলতায় ও সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবতায় সততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইত। আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম—স্নেহ করিতাম; কিন্তু সে স্নেহ ঠিক কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহের ন্যায় ছিল না; উহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বিমিশ্র স্নেহ ছিল। আমি অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব লইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতাম। তাঁহার নিত্যধাম প্রবেশে আমি দীর্ঘকাল নিদারুণ শোকের জ্বালা অনুভব করিয়াছি।

এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী আবাল্য আমার

পরিচিত। ইঁহার সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, মর্য্যাদা-রক্ষণ-বুদ্ধি, বাল্যকালেই বিকশিত হইয়াছিল, আমি তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ইনি এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে এত অধিক সমাদৃত, সম্মানিত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সাহিত্যে এত উৎকর্ষলাভ করিয়া জগৎপূজ্য স্বীয়বংশের সম্মান-সংবর্দ্ধনে যে কৃতিত্ব লাভ করিবেন, তখন সে ধারণা করিতে পারি নাই। ইঁহার ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, ভোগলালসা ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইঁহার তরুণ বয়স হইতেই বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থবীজে যেমন উহার মহা-মহীরুহত্বনিষ্ঠ গুণ সকল লুক্কায়িত থাকে, কালে কালে ধরিত্রীবক্ষে উহা যেমন ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সুবিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়, সেইরূপ বাল্য হইতে ইঁহার অশেষ চারিত্রিক সদ্‌গুণের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতাম; কিন্তু এই সিদ্ধ-বংশের ধারা ইঁহাতে যে এত অধিক সম্প্রসারণ লাভ করিবে তাহা তখন অনুমানেরও অগোচর ছিল। ইনি স্কুলে, কলেজে বা কোন চতুষ্পাঠিতে শিক্ষালাভ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রতিভা-প্রভাবে এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও সে সকল গুণ অতি বিরল। ইঁহার বাগ্মিতা-শক্তি-প্রবাহ গঙ্গা-যমুনা প্রবাহের ন্যায় অনর্গল অথচ শব্দশুদ্ধিপূর্ণ ও ভাবশুদ্ধিপূর্ণ। তাহাতে কোন প্রকার অসম্বন্ধ-ভাষিতা উদ্দেশ্যভ্রষ্টতা, শ্রুতিকর্কশতা বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাগ্‌ব্যবহার প্রভৃতি আবর্জ্জনার লেশাভাসও পরিলক্ষিত হয় না। বক্তৃতার অনেক পরেও ভাবরসগ্রাহী সুশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সেই বক্তৃতার ভাবপূর্ণ মধুর ঝঙ্কার বর্ত্তমান থাকে।

এখন ইঁহার লিপিকুশলতার কথা বলিতেছি। এ-সম্বন্ধে এই গ্রন্থ খানিই সমুজ্জ্বল প্রমাণ। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা জনসাধারণ যত সহজ মনে করেন, প্রকৃত ব্যাপার সে ধারণার অতীব বিপরীত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় তদীয় নিত্যপার্ষদ শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীপাদগোস্বামি মহোদয়গণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ অতীব সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহের বিপুল ভাণ্ডার ; ভগবৎ কৃপা ব্যতীত কেবল আমাদের শ্রমার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধিবলে সে-সিদ্ধান্ত ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার হয় না। কেবল প্রতিভাবলে যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিনৈপুণ্য থাকিতে পারে, শব্দ-বিন্যাস-কৌশলে অথবা ভাষার লালিত্যে তাহা সুপাঠ্য হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি সাধনা বিহীন লেখকগণের তাদৃশ গ্রন্থ পাঠে ভক্ত পাঠকগণ বিন্দুমাত্রও প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। এই গ্রন্থ খানিতে অতীব কঠিন দার্শনিক তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে ; গ্রন্থকার ভক্তির দিব্য-নয়নে সেই সকল তথ্যের নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া, সহজ ও সরলভাবে উহা জনসমাজের সুখপাঠ্য করিয়াছেন। ইঁহার ভাষা প্রাঞ্জল অথচ সুমার্জ্জিত ; প্রত্যেক কথাই চিন্তাশীলতার পরিচায়ক অথচ লিপিনৈপুণ্যে অল্পশিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষেও সুখবোধ্য। প্রবন্ধগুলি দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ অথচ কাব্যের সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে এবং ভাষার লালিত্যে উহা পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। এই গ্রন্থের আরএক বিশিষ্টতা এই যে, গ্রন্থকার যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ভাবের নূতনত্ব এবং চিন্তার মৌলিকত্ব অতীব পরিস্ফুট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাধারার এইরূপ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব অন্যত্র অতি বিরল। অতীব সূক্ষ্মতথ্য সম্বলিত সিদ্ধান্তগুলিও ইঁহার ব্যাখ্যান কৌশলে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। উপমা, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সুললিত সুমধুর ভাষার সৌন্দর্য্যে, প্রবন্ধ গুলিকে পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ-যোগ্যতা-সাধনও ইঁহার এক প্রধান বিশিষ্টতা।

স্থান বিশেষে বিষয় বিশেষের পুনঃ পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়। কোন কোন পাঠকের নিকট উহা অসমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

কিন্তু কোন গূঢ় গভীর সূক্ষ্ম তথ্যকে সাধারণ পাঠক পাঠিকার হৃদয়ঙ্গম যোগ্য করিতে হইলে নানাপ্রকারে, নানাভাবে, নানা উপায়ে ও নানা উদাহরণে কোমলবুদ্ধি পাঠকগণের চিত্তমুকুরে তাহা প্রতিফলিত করিতে হয়। স্থলবিশেষে 'স্থূণা নিখনন' প্রণালী অবলম্বন দূষণীয় না হইয়া ভূষণীয়ই হইয়া থাকে। সমালোচক মাত্রেরই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করা আবশ্যক। মানুষের দৈহিক আকার প্রকার যেমন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের নিয়মাধীন, তাহাদের মনোনয়ন, যুক্তিনির্দ্ধারণ এবং বিচারবুদ্ধি-প্রক্রিয়ারও স্বাতন্ত্র্য অতি স্বাভাবিক ; আমি এ-স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের কথাই বলিতেছি। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থ দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি অতি উচ্চস্থান লাভ করিবে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, রুচি সুমার্জ্জিত, ভাব সমুচ্চ, ইহা ব্যাখ্যান নৈপুণ্য-প্রাঞ্জলতায় ও উপমা উদাহরণ সংযোজনায় সমলঙ্কৃত এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-পূর্ণ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষার লালিত্য, ভাবরসের মাধুর্য্য এবং সৎ-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান-বিন্যাসকুশলতার পরিস্ফুট নিদর্শন সমুজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান।

দয়াময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে আমার প্রার্থনা এই যে, তাঁহার কৃপায় এই গ্রন্থকার নীরোগ দেহ, মানসিক শান্তি ও সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তভাবের আদর্শরূপে মানব সমাজে বিরাজিত হউন এবং তাঁহার শ্রীচরণ নখচন্দ্র চন্দ্রিকা-বিকীর্ণ কিরণচ্ছটায় যেন তদীয় সুধামধুর আনন্দজ্যোতির্ম্ময় ধামের নিত্যাধিবাসী হইয়া, ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যানে ত্রিতাপদগ্ধ জীবদিগকে ভক্তি-সুধা-রসে অভিষিক্ত করেন। অলমিতি বিস্তারেণ।

১৩৪০ সাল,
১২ই অগ্রহায়ণ, মহাদ্বাদশী।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা (বিদ্যাভূষণ)
২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অবতরণিকা*

জীবের অন্তরে—মানব হৃদয়ে, জড়ীয়-বিষয়-বাসনারূপ অস্থিরতাই অশান্তির উদ্ভবস্থল। শান্তিই প্রকৃষ্ট স্থিরতা। যথার্থ শান্তি বা সুপ্রসন্নতার নাম—'ভগবদ্ভক্তি'। পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাসের আধিক্য বা অল্পতা অনুসারেই জন-সমাজে যথাক্রমে প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা অর্থাৎ শান্তি ও অশান্তির বৃদ্ধি বা হ্রাসতা সংঘটিত হইয়া থাকে,—এ-কথা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জীব-হৃদয়ের সেই দুর্দ্দমনীয় বিষয়-বাসনার সংঘাত হইতে বহির্জ্জগতে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিরূপ অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হয়, কেবল ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভক্তি-বারির সেচন দ্বারাই তদনুপাতে উহা প্রশমিত হইতে পারে। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে জীবহৃদয় সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও সুনির্ম্মল হইলে, সেই সুপ্রসন্ন জীবাত্মা, পরম স্থিরতা বা প্রকৃষ্ট শান্তির অধিকারী হয়েন। এই ভক্তির সংযোগ ও বিয়োগ হইতেই সমাজ-দেহেও শান্তি ও অশান্তির আবির্ভাবের কারণ ঘটিয়া থাকে। মানব অন্তরের এই প্রকৃষ্ট শান্তির উদয় উদ্দেশ্যেই—তাই বেদাদি শাস্ত্রের শান্তি-পাঠ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় শান্তি-জলের ব্যবস্থা।

অস্থির হইবার উদ্দেশ্যেই কোন কিছু অস্থির হয় না; স্থিরতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই—স্থিরতা না পাওয়া অবধি সকলকেই অস্থির হইতে

---

* গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত 'বিশ্বশান্তি ও সাম্যবাদ' নামক যে প্রবন্ধটি 'সঙ্কর্ষণ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৫৭ ; ইং অক্টোবর ১৯৫০ ; ভাগবত বিদ্যালয় ; ১৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত), সেই প্রবন্ধই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে উক্ত 'অবতরণিকা' রূপে মুদ্রিত হইল। 'সঙ্কর্ষণে'র পূর্ব্বে উক্ত প্রবন্ধ মেদিনীপুরের কোন সাপ্তাহিক পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। —প্রকাশক।

হয়। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হইতেছে,—স্থিরতা বা শান্তিকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই স্থিরতা বা শান্তি কি বস্তু?—কিসের অভাবে আজ জগদ্‌ব্যাপী এই অস্থিরতা বা অশান্তির বিষবাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে? কী পাইলে এই অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়া, প্রকৃষ্ট শান্তির স্নিগ্ধ সমীরণে আবার জগৎ পূর্ণ হইতে পারে,—তাহার যথার্থ সংবাদ অবগত না হইতে পারিলে, এই শান্তিহারা জগতে প্রকৃষ্ট শান্তির পুনরাবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভব হইবে না—নিম্নোক্ত বিষয়টি স্থিরভাবে প্রণিধান করিতে পারিলে, বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও উহার কারণ এবং তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ দিক্ নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

বর্ত্তমান জগতের আজ শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কী?—এই প্রশ্নের এক কথায় সর্ব্বসম্মত উত্তর হইতেছে—'শান্তি'। শান্তি অপেক্ষা অধিকতর কাম্যবস্তু বর্ত্তমান শান্তিহারা বিশ্বে যে অপর কিছুই নাই, এ কথা কেহই আজ অস্বীকার করিতে পারেন না। ঘোরতর বিপদ ও দুর্দ্দিনের ঝটিকাবর্ত্তে আজ সমস্ত পৃথিবী বিধ্বস্ত ও বিপন্ন! অশ্রুতপূর্ব্ব প্রলয়ঙ্কর আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকায় সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত! অসত্য, অবিশ্বাস, দুর্নীতি, হিংসা, কলহ, বিদ্বেষের বিষবাষ্পে সমস্ত বিশ্ব আজ বিষাক্ত! প্রত্যেক নরনারীর চিত্ত আজ অশান্তি ও দারুণ দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত! রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আজ সকলেই এই অস্বাভাবিক অশান্তির দহনে সন্তপ্ত! একযোগে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এরূপ অশান্তি ও উদ্বেগ,—এরূপ অভাব ও অভিযোগের আর্ত্তনাদ—এরূপ অপ্রসন্নতা ও অস্থিরতা জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান জগতের দুর্দ্দিন ও দুরবস্থার কথা আজ কাহারও নিকট অবিদিত নহে। বিশ্বব্যাপী এই অস্বাভাবিক অমঙ্গল ও অশান্তির

কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া, কেহ বা বৈষম্যমূলক সমাজনীতিকে, কেহ বা শিক্ষানীতিকে, কেহ বা রাষ্ট্রনীতিকে, কেহ বা অর্থনীতিকে—এইরূপ নানাজনে ইহার নানাকারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। নীতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, সকলের মূলে বৈষম্যই যে, এই বিশ্বব্যাপী অশান্তির একমাত্র কারণ, এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

এই অশান্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আধুনিক সাম্যবাদিগণের মতের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে,—জগতের ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধা যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই মুষ্টিমেয় ধনপতিগণের করতলগত হইয়া পড়িতেছে; যাহা তাহাদিগের প্রয়োজন অপেক্ষা অত্যধিক। আর অপর পক্ষে—বিপুল জনসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রয়োজনের অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। সমাজ-দেহের একদিকে ধন-সম্পদ, সুখ-সুবিধার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এবং অপরদিকে নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য বা অভাবরূপ এই যে 'বৈষম্য'—এই বৈষম্যই বর্ত্তমান জগতের সকল চাঞ্চল্য—সকল অস্থিরতা ও অশান্তির মূল কারণ।

ইহার প্রতিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের মতের সার মর্ম্ম এই যে,—সকল মানুষ যদি সমান সমাজ ব্যবস্থা, সমান সুখ সম্পদ, সমান স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিয়া—সম অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে,—যদি এখানে উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সুস্থ, অসুস্থ, ছোট বড়, ভাল, মন্দ,—এমন কী ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত সকল ভেদ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবেই সকল বৈষম্য বিদূরিত হইয়া, জগৎ সমান সুখ ও শান্তিতে আবার পূর্ণ হইতে পারে। একপক্ষের অধিক সুখ-সুবিধার অধিকার লাভ এবং অপর পক্ষে উহার একান্ত অভাব,—এই বৈষম্যই হইতেছে বর্ত্তমান জগতের সমস্ত বিপদ ও বিশৃঙ্খলতা—সকল অশান্তি ও অস্থিরতার একমাত্র কারণ। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধতার নামই 'আধুনিক সাম্যবাদ'।

এই 'সাম্যবাদ' আপাততঃ যতই শ্রুতিমধুর কিম্বা অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের পক্ষে যতই আশা ও উৎসাহবর্দ্ধক হউক না কেন, বাহ্য স্থূলদৃষ্টিপ্রসূত বলিয়া এই মতবাদ সূক্ষ্ম বিচারসহ নহে ; এই হেতু ইহা সফলতা অর্জ্জনের পরিবর্ত্তে অধিকতর বিশৃঙ্খলতা সৃজন করিবার পক্ষেই সমধিক উপযুক্ত।

উক্ত মতবাদের অসারতা, নিম্নোক্ত কারণগুলি একে একে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ;—

১। জনসমাজের একাংশের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধা লাভ এবং অপরাংশের পক্ষে উহার একান্ত অভাবরূপ এই বৈষম্যই যদি বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী অশান্তির মূল কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার অপ্রাচুর্য্য স্থলে যেমন শান্তির অভাব দেখা যাইবে, তেমনি উহার প্রাচুর্য্যস্থলে আবার শান্তির প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হইবার কথা ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কি তাহাই ঘটিয়াছে ? কখনই নহে। উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আজ সকলের অন্তরেই অশান্তির উত্তাপ অনুভূত হইতেছে ; বরং অভাবগ্রস্ত জনসাধারণকে ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া, অন্ততঃ রজনীর বিশ্রামাবকাশে সুনিদ্রার অধিকারী হইতে দেখা যায় ; কিন্তু প্রচুর বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে অধিকতর সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির লালসায়, 'কালো-বাজার' প্রভৃতির উৎকট চিন্তা লইয়া প্রায়শঃ বিনিদ্র রজনী যাপন করিবার কথাই শুনা যায়। এমন কি ধন-কুবের কোটীশ্বরদের মধ্যেও আজ আত্মহত্যার হিড়িক দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং যে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ বা সুখ-সুবিধার অধিকার, একজনকেই শান্তি দান করিবার পক্ষে অসমর্থ,—বরং তদ্দ্বারা অধিকতররূপে শান্তিহারা হইতেই দেখা যাইতেছে,—সেই সুখ-সম্পদাদি দশজন সমভাগ করিয়া লইলেই তাঁহারা যে, তদ্দ্বারা শান্তিলাভ করিয়া জগতের অশান্তি দূরীভূত করিতে পারিবেন, এরূপ কল্পনা করা

নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। যে অন্নে একেরই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, সেই অন্ন বিভাগ করিয়া দশের ক্ষুধা মিটাইবার আশা করা যায় কী? তবে যে ব্যক্তি অনাহারে আছে, আপাততঃ তাহার পক্ষে প্রাপ্ত অন্নের অল্পাংশই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, পরক্ষণেই পুনরায় তাহার অন্তরে পূর্ব্ববৎ অভাব বোধের অপ্রসন্নতাই যে, জাগিয়া উঠিবে—ইহা স্থির।

২। যদি বৈষম্যপ্রাপ্ত বর্ত্তমান জগতের সুখ-সম্পদ, সকলের মধ্যে সমভাগে বিভাগ করিয়া লইলেই, এই সমতা-বিধান দ্বারা আপাততঃ জগতে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেও যে কারণ বর্ত্তমান সমাজ দেহে একদিকে উহার আধিক্য ও অপরদিকে অল্পতারূপ বৈষম্য আনয়ন করিয়াছে, পুনরায় সেই কারণেই কাহারও পক্ষে প্রাপ্ত অর্থাদি হইতে অধিকতর সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিবার এবং কাহারও পক্ষে উহা বিনষ্ট করিয়া অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না কী? যদি তাহাই হয়, তবে সেই বৈষম্যের পুনঃ পুনঃ সমতা বিধান করিয়া, জগতের শান্তি অব্যাহত রাখা কি সম্ভব? আজ পৃথিবীর প্রধান সাম্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও কৃষকের মধ্যে কি প্রভাব ও প্রতিপত্তির সমতা রক্ষিত হইয়াছে?

৩। যদি ধনসাম্য সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণা প্রকৃতির বৈষম্য হইতেই সমুৎপন্ন জগতের সকল ভোগ্য বস্তুর সমতা বিধান করা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ত্রিগুণা প্রকৃতির বৈষম্যই হইতেছে সৃষ্টির রূপ। উহার সাম্যেই প্রলয় হইয়া থাকে। সৃষ্টি যাঁহার কার্য্য,—উহার স্থিতি ও প্রলয়ে একমাত্র তাঁহারই অধিকার। ইহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং অর্থের সমতা বিধানও যদি সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তথাপি বৈষম্যযুক্ত জাগতিক ভোগ্যবস্তু সকলের সমতা বিধান যে, একান্তই অসম্ভব ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে।

সকল গাভীই সমান দুগ্ধবতী নহে, সকল বৃক্ষেই সমান ফলপুষ্প হয় না, সকল ক্ষেত্র সমান ফসল প্রদান করে না, সকল অশ্বই সমান বেগবান্ নহে, সকল সন্তানই সুন্দর ও সুবুদ্ধি হয় না, সকল স্ত্রীকেই সমান রূপ-গুণ সম্পন্না দেখা যায় না, সকল পতিই সমান কৃতিত্বের অধিকারী নহেন,—এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই যেখানে বৈষম্য বিদ্যমান,—এমন কি দুইটি মুখ—দুইটি ধূলিকণাও যে বৈষম্যময় বিশ্বে একরূপ হইতে দেখা যায় না, সেখানে সকলের সকল ভোগ্য বিষয়ের সমতা বিধান পূর্ব্বক অশান্ত জগতের শান্তি স্থাপন প্রয়াস যে, পরিহাস ভিন্ন অপর কিছুই নহে, স্থিরভাবে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না।

৪। যদি বলা যায়, সর্ব্বোত্তম বস্তু সকল সংরক্ষণ পূর্ব্বক উহাই সমভাগে বিভাগ করিয়া লইলেই সাম্য ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে,—এ-কথাও যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ একের নিকট যাহা উত্তম বলিয়া গ্রাহ্য হয়, অন্যের নিকট তাহাই আবার হেয় ও ত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়; একের যুক্তিতে যাহা গ্রহণীয় অপরের যুক্তিতে তাহাই বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। এইজন্য মানুষের স্বভাব ও রুচি ভেদ অনুসারেই একই প্রকার সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে, গৃহাদি নির্ম্মাণ, উহার আসবাবপত্রাদি সংগ্রহ ও সংস্থাপন, সাজ সজ্জা, আহার বিহারাদি প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং এখানে বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় হইবে কাহার বিচার দ্বারা?

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বৈষম্যের বৈচিত্র্যকে লইয়াই সৃষ্টিকে বাঁচিতে হইবে। সুতরাং যতদিন প্রলয় না হইতেছে, ততদিন সৃষ্ট জগতকে বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, ধনী, দরিদ্র, বিজ্ঞ, অজ্ঞ, স্থূল, কৃশ, সুস্থ, অসুস্থ, সুন্দর, কুৎসিত, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বৈষম্য লইয়াই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। এই সকল বৈষম্যের সম্পূর্ণ সমতা সাধন, কেবল

প্রলয়েই সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং জগতের এই বাহ্য-বৈষম্য ঘুচাইয়া উহার সমতা বিধান না করিতে পারিলে, যদি জগতের শান্তি স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে বর্ত্তমান জগতে শান্তির আশা সুদূরপরাহত অথবা উহাকে প্রলয়ের শান্তিই বুঝিতে হইবে।

এখন বর্ত্তমান বিশ্বের এই শান্তিহারা মূর্ত্তির প্রকৃষ্ট কারণ ও উহার যথার্থ প্রতিকার সম্বন্ধে যদি আমরা নিরপেক্ষতার সহিত বিশেষ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব—বর্ত্তমান জড়বাদমূলক স্থূল-সাম্যবাদের মূলেই এক মহাভুল নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতেছে—'শান্তি' এবং বৈষয়িক 'সুখ'—এই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করা। কালপ্রভাবে দেহ ও আত্মার বৈশিষ্ট্যবোধ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া, যেমন দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম ঘটিতেছে,—সেই একই কারণে সুখ ও শান্তির পার্থক্য-বুদ্ধিও দিন দিন অধিকতররূপে আচ্ছন্ন হইয়া,—সুখকেই এখন শান্তি বলিয়া মনে করা হইতেছে। তাই আধুনিক সাম্যবাদীর ধারণা,—বিষয় ভোগ-সুখের সমতাবিধান করিতে পারিলেই অশান্ত জগতে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই ধারণা যে, সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, প্রথমে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিবার জন্য, ত্রিকালদর্শী প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ-চিন্তিত—বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রকৃষ্ট সাম্যবাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) 'মনুষ্য' বলিতে 'মানব-দেহেন্দ্রিয়াদি' ও 'মানবাত্মা'—এই উভয়ের সম্মিলিত ভাবকেই বুঝায়। সুতরাং মানব-দেহেন্দ্রিয়াদি বা 'দৈহিক-মানুষ' এবং মানবাত্মা বা 'আত্মিক-মানুষ' এই উভয়ে পৃথক বস্তু। এই-হেতু উভয়ের প্রয়োজনও পৃথক। দৈহিক-মানুষ,—জড়; এ-জন্য তাহার পক্ষে, অভিপ্রেত জড়ীয় বিষয়ের সংযোগ দ্বারা বৈষয়িক 'সুখ' প্রাপ্তিই প্রয়োজন; আর আত্মিক-মানুষ চিন্ময় অর্থাৎ চিদ্‌বস্তু;

এইজন্য তাহার পক্ষে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সংযোগ দ্বারা 'শান্তি' লাভ করা প্রয়োজন। মানবদেহেন্দ্রিয়াদির ক্ষণিক তর্পণের নাম 'বিষয়-সুখ' এবং মানবাত্মার পরিতৃপ্তি বা প্রসন্নতার নামই 'শান্তি'। অতএব 'সুখ' এবং 'শান্তি'—এই উভয়েও পৃথক বস্তু। শ্রুতির ভাষায় ইহাই 'প্রেয়' ও 'শ্রেয়' নামে অভিহিত হইয়াছে; (কাঠকে° ১।২।১-২)।

(২) দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, দৈহিক-মানুষের প্রয়োজনীয়—বিষয়-সুখ অপেক্ষা, আত্মিক-মানুষের প্রয়োজনীয় শান্তিই শ্রেষ্ঠ; তাই 'সুখের চেয়ে স্বস্তি (শান্তি) ভাল'—এই প্রচলিত জনশ্রুতি হইতেও ইহা বুঝা যায়। 'সুখ' ও 'শান্তি' এক বস্তু হইলে উক্ত প্রকারে উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইত না।

(৩) ধর্ম্মই হইতেছে আত্মার প্রয়োজনীয়—আধ্যাত্মিক বস্তু। এইজন্য একমাত্র ধর্ম্মই শান্তি লাভের উপায়। মানবাত্মা বা আত্মিক-মানুষের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কেবল ধর্ম্মই উপযোগী। প্রায়শঃ ধর্ম্মের মূল-নীতি হইতেছে—জন-সমাজে দেহাতিরিক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। মনুষ্যের দেহই যে সর্ব্বস্ব নহে,—কেবল দৈহিক-মানুষের সুখ-সুবিধার বিধান করিলেই জন-সমাজে শান্তি স্থাপিত হয় না,—দেহাতিরিক্ত যে আত্মিক-মানুষ রহিয়াছে, তাহার প্রসন্নতা বিধান দ্বারাই সমাজ-দেহে অর্থাৎ জগতে শান্তি অব্যাহত থাকে,—এইরূপ দেহাতিরিক্ত মানবাত্মার যে পৃথক অস্তিত্ববোধ,—ইহাই উজ্জ্বল রাখা ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(৪) আত্মার অনুভূতি হইতেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বিষয়ে উপলব্ধি ও তাঁহাতে ক্রমে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। তাহারই আনুষঙ্গিক ফলে স্বর্গ, নরক, এবং জাগতিক সুখ-দুঃখাদি ভোগ বিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপকেই কারণ বলিয়া বিশ্বাস করাও স্বাভাবিক হয়। সেই বিশ্বাসের ফলে মানুষ অসত্য ও অন্যায়ের পথ

পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা মানবাত্মায় শান্তি বা প্রসন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন সেই সুপ্রসন্ন জন-সমাজ কর্ত্তৃক বিষয়-সুখ-সম্পদাদি ভোগ অপেক্ষা, পরার্থে উহার ত্যাগই অধিক লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং তদবস্থায় বৈষয়িক সুখের সমতা বিধানের জন্য, ধনীর সম্পদ বলপূর্ব্বক কিম্বা আইনের দ্বারা গ্রহণ করিয়া দরিদ্রের মধ্যে বিতরণের বৃথা পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। ঐহিক সুখ-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি নিজেই নিঃস্বার্থভাবে ও স্বেচ্ছায় উহা বিতরণের জন্য ব্যাকুল হয়েন। আবার দীন ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিতৃপ্ত থাকায়, উহা গ্রহণ করিবার জন্যও উৎসাহী হয়েন না। তদবস্থায় বহির্জগতে বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলেও, তদ্দ্বারা জনসমাজে শান্তি ব্যাহত হইতে পারে না। এইরূপে জনসমাজে কেবল প্রকৃষ্ট ধর্ম্মভাবের বিকাশ দ্বারাই অন্তরাত্মার প্রসন্নতা বশতঃ বহির্জগতের শান্তিও অব্যাহত থাকে। তাই ধর্ম্মকেই 'ধরা-ধারক' বলা হয়। ধর্ম্মহীন জগতের অস্তিত্বই অসম্ভব।

(৫) ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের তর্পণ দ্বারা যদি মানবাত্মার শান্তি বা প্রসন্নতা বিধান না করা যায়, তাহা হইলে সেই অপ্রসন্ন—অশান্ত আত্মা হইতে যে অভাবের অভিযোগ ধূমায়িত হইতে থাকে, উহাই দেহাত্ম-বোধ-রূপ অজ্ঞানে আবৃত হইয়া, দেহেন্দ্রিয়েরই অভাব রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং তদবস্থায় জনসমাজে অধিকতর দৈহিক সুখ-সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষারূপ স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে; যাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে হিংসা, বিদ্বেষ, অসত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, কলহ, কপটতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদির আকারে অন্তরাত্মার সেই অশান্তির আগুন বহির্জগতে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।

(৬) ধর্ম্মের সর্ব্বসার সত্য বা জীবের পরম ধর্ম্ম হইতেছে পরমেশ্বরে বা শ্রীভগবানে বিশ্বাস—ভক্তি—প্রেম। এই পরম

আধ্যাত্মিক বিষয়ই হইতেছে আত্মিক-মানুষ বা মানবাত্মার পরম শান্তি বা সুপ্রসন্নতা বিধানের পরম উপায়। ভগবদ্ভক্তিই নিখিল আত্মার অন্ন,—ভগবৎ প্রেমই নিখিল আত্মার পানীয়,—ভগবৎ বিশ্বাসই নিখিল আত্মার নিশ্বাস বায়ু। এই পরম ধর্ম্ম বা পরম আধ্যাত্মিক সম্পদের অন্ততঃ আংশিক সংযোগেও মানবাত্মা কথঞ্চিৎ প্রসন্ন থাকিলে বৈষয়িক সুখ-সুবিধার অল্পতা ঘটিলেও তদ্দ্বারা বহির্জগতে কোন অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তি ঘটে না। উক্ত আধ্যাত্মিক বিষয় হইতে মানবাত্মাকে বঞ্চিত রাখিয়া, কেবল দৈহিক-মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য বিধান করিলে,—এই বৈষম্য দ্বারা জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

(৭) অগ্নি নির্ব্বাপণে একমাত্র জল সেচনেরই উপযোগিতা ভিন্ন, ঘৃতাহুতির ইন্ধনে হুতাশন যেমন অধিকতর বিবর্দ্ধিতই হইয়া উঠে, সেইরূপ জন-সমাজের অন্তর্নিহিত অশান্তির উদ্ভবস্থল যাহা,—সেই বিষয়-বাসনানল নির্ব্বাপণে একমাত্র ভক্তিবারি সেচন ভিন্ন বৈষয়িক সুখ-সম্পদের আধিক্য বিধানরূপ ভোগবাদের ইন্ধনে উহা যে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে এবং তৎফলে বহির্জগতেও অস্বাভাবিকরূপ অশান্তির উত্তাপ ও অস্থিরতা সৃজন করিবে,—ইহাতে অসম্ভাবনার কিছুই নাই।

(৮) আত্মিক-মানুষকে তাহার প্রাপ্য পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় হইতে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিয়া, দৈহিক-মানুষের উপযোগী বৈষয়িক সুখ-সুবিধার সমাবেশ করা হইবে,—এই বৈষম্য মূলক ব্যবস্থার অনিবার্য্য বিষময়ফল-স্বরূপ,—মানবাত্মার সেই অভাবের অভিযোগ অনুপাতে বহির্জগতেও সেই পরিমাণে বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তির আবির্ভাব ঘটিবে—ইহা সুনিশ্চয়।

(৯) দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা আত্মাই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, দৈহিক-প্রয়োজন বা 'সুখ' হইতে আত্মিক-প্রয়োজন বা 'শান্তিই' জীবের অধিক কাম্য;

সুতরাং সর্ব্বভাবে উহার আধিক্য প্রদান করাই প্রয়োজন হইলেও, উহার একান্ত অভাব স্থলে অন্ততঃ-পক্ষে যদি জনসমাজ কর্ত্তৃক উভয়বিধ প্রয়োজন সমভাবে সাধিত হয়, তাহা হইলেও এই সাম্যবিধান দ্বারা সমাজ-দেহে বা জগতে কোনও অস্বাভাবিক অশান্তির আবির্ভাব ঘটে না। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ প্রয়োজনের সমতা ভঙ্গ করিয়া দৈহিক প্রয়োজন যতই আধিক্য প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই অশান্তির এবং আত্মিক প্রয়োজন যত আধিক্য লাভ করে, জগতে ততই অধিকতর শান্তির আবির্ভাব ঘটিবার কারণ হয়। অন্তরাত্মা পরাশান্তি দ্বারা পূর্ণরূপে পরিসিক্ত থাকিলে, ব্যবহারিক বা দৈহিক বস্তুর লেশমাত্রও আবশ্যক হয় না।

(১০) অতএব আধুনিক সাম্যবাদিগণ যে সমাজদেহের একদিকে অধিক সুখ-সুবিধার অধিকার লাভ ও অপরদিকে উহার একান্ত অভাবরূপ বাহ্য বৈষম্যকেই বর্ত্তমান জগতের সকল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতার মূল কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন,—ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যে বৈষম্যের বিষময় ফলে জগৎ আজ শান্তিহারা হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট কারণ বহির্জগতের সুখ-সম্পদের বৈষম্যে নহে ; উহা হইতেছে মানুষের আভ্যন্তরিক বৈষম্য ; অর্থাৎ আত্মিক-মানুষ বা মানবাত্মাকে তাহার প্রাপ্য ও তৎস্বজাতীয় আধ্যাত্মিক বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া,—এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া, কেবল দৈহিক-মানুষের অর্থাৎ মানব-দেহেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন যাহা—সেই বৈষয়িক সুখ-সুবিধার অত্যধিক সমাবেশ প্রচেষ্টা। কেবল আধুনিক সাম্যবাদের মূলেই নহে,—আধুনিক জড়বাদমূলক শিক্ষা ও সভ্যতার মূলেও এই মহাভুল নিহিত থাকায়, তদ্দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াসই যে বিপরীত ফলপ্রসূ হইতেছে,—বর্ত্তমান জগতের দিন দিন অধিকতর শান্তিহীনতা প্রত্যক্ষ করিলে ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পূর্ব্বেকার দিনের অপেক্ষা বর্ত্তমানে বৈষয়িক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা যে, কল্পনাতীতরূপে প্রাচুর্য্যের সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। গো-যানের স্থলে ব্যোমযান, তৈল প্রদীপের স্থলে বিদ্যুতালোক, তালবৃন্তের স্থলে বৈদ্যুতিক ব্যজন, অশ্ববাহিত বার্ত্তা বহনের স্থলে বেতারবার্ত্তা—এই প্রকার দৈহিক-মানুষের প্রয়োজনীয় সুখ-সম্পদের যত প্রকার অভিনব ও উন্নত ব্যবস্থা হইতে পারে, জড়বিজ্ঞান আধুনিক জনসমাজের জন্য তাহা প্রচুর ভাবেই সমাধান করিয়াছে। কিন্তু দৈহিক সুখ-সুবিধার এই প্রাচুর্য্যের মধ্যেও সমস্ত জগৎ আজ শান্তিহারা কেন? পূর্ব্বকালে আধ্যাত্মিক জীবন-সম্পন্ন মনুষ্যসমাজে দৈহিক সুখ-সুবিধার শত অভাবের মধ্যে ছিল প্রচুর শান্তি, —মানবাত্মা ছিল ভক্তির শান্তিজলে পরিসিক্ত; আর বর্ত্তমানে দৈহিক সুখ-সুবিধার প্রাচুর্য্যের মধ্যেও হইয়াছে শান্তির নিদারুণ অভাব!—অন্তরাত্মা তাহার প্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত। এইরূপে আত্মিক ও দৈহিক মানুষের প্রয়োজন সাধন বিষয়ে যে বৈষম্য সৃজন করা হইতেছে, —এই বিশ্বব্যাপী অশান্তির বিষবাষ্প সেই বৈষম্যেরই অনিবার্য্য ফল।

বর্ত্তমানে দেহ-সর্ব্বস্ব জগতে, জড়বাদ বা ভোগবাদমূলক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রখর আলোক সম্পাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মনুষ্য-সমাজের অন্তর্দৃষ্টি যতই অন্ধ হইয়া পড়িতেছে, উহারই অনর্থকারিতায়, পরমার্থ বিষয়ের প্রয়োজনবোধ ও সমাদর অপেক্ষা কেবল ব্যবহার বিষয়েই উদ্দাম উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা ততই অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ আত্মা ও পরমাত্মা বা জীব ও পরমেশ্বরের কথা গল্পের মতই অলীক এবং পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, দৈব-অদৃষ্ট প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয় সকল পরিহাসের সামগ্রীরূপেই বিবেচিত হইতে দেখা যাইতেছে। দেহ ও ইহ-সর্ব্বস্ব জনগণ কর্ত্তৃক এইরূপে একদিকে যেমন আত্মবস্তু বা

চিদের অবমাননা চলিয়াছে, তেমনি অপরদিকে অনাত্ম বা জড়বিষয়ে এবং তৎবিষয়ক কৃতিত্বকেই বিপুল সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে। জড়বাদের মোহে ও জড়বিজ্ঞানের কুহকে বিভ্রান্ত বর্ত্তমান জনসমাজ কর্ত্তৃক কর্ম্মফল, দৈব ও অদৃষ্ট প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয় সকলকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই বিপুল পৌরুষরূপে বিবেচিত হইলেও, আজ জগতের প্রায় প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ঘটনা অপ্রত্যাশিত রূপেই সংঘটিত হইয়া এবং সেই অদৃষ্ট ও দৈবেরই জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া, জননায়কগণকেও হতভম্ব করিয়া দিতেছে না কি? মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অপেক্ষা না করিয়া, এই যে অচিন্ত্য—অপ্রত্যাশিত ঘটনা সকলের সংঘটন—ইহারই নাম 'দৈব' বা 'অদৃষ্ট'; আর ইহাকেই কুসংস্কারাদি বলিয়া অবজ্ঞা করিবার যে সাহস,—তাহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস।

অতএব আজ আত্মিক-মানুষের প্রয়োজনীয় যাহা, একদিকে সেই নিত্য ও চিরসত্য আধ্যাত্মিক বা পরমার্থ বিষয়ের অপমান ও অন্য দিকে দৈহিক-মানুষের প্রয়োজনীয়—অনিত্য ও অসত্য—ক্ষণভঙ্গুর ব্যবহারিক বা জড়ীয় বিষয়ের বিপুল সম্মানপ্রদান—এই যে বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের সৃজন করা হইতেছে,—'প্রগতি' নামে এই যে দুর্গতির পথে মোহগ্রস্ত জগৎ আজ দ্রুতগতিতে প্রধাবিত হইতেছে,—অনতিবিলম্বে এই গতির পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে জগতের ধ্বংস অনিবার্য্য। যে জড়বাদ ও জড়-বিজ্ঞানের জয়গানে প্রমত্ত হইয়া আজ বিশ্বের সর্ব্বত্রই পরমার্থ বস্তু উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবমানিত,—এই মহাপরাধের দণ্ডস্বরূপ সেই জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অশনিপাতেই বর্ত্তমান ঈশ্বর-বিমুখ সভ্যতা ধ্বংস হইবার অধিক বিলম্ব নাই।

যদি এই অন্তিম মুহূর্ত্তেও আমরা প্রকৃষ্ট সম্বিৎ লাভ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সচেতন হইতে পারি,—যদি সকল বিষয়ে ব্যবহারের উপর—

অন্ততঃ ন্যূনপক্ষে ব্যবহারের সহিত সমতা বিধান করিয়াও পরমার্থ—পরমেশ্বরের মহামহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি,—দেহ অপেক্ষা আত্মাতেই সমধিক আত্মবোধ উদয় হইবার উপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া উহা ব্যাপকভাবে প্রচারের আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি, তাহা হইলেই অশান্তির সকল বিষবাষ্প বিদূরিত হইয়া জগৎ আশু ধ্বংস হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ও শান্তি সমীরণে আবার পূর্ণ হইতে পারে। পরমেশ্বরের কৃপায় বিশ্ব-মানবের সেই সুমতির উদয় হউক—ইহাই তদীয় চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

সর্ব্বধর্ম্মের আদি ও আকর স্বরূপ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে জগন্মঙ্গল যে সাম্যবাদ চিন্তিত হইয়াছে, উহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল।

জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মেরই মূলনীতির সমতা রহিয়াছে। যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিই সেই মূলনীতি। ধর্ম্মের পার্থক্য-মূলক বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান অপেক্ষা, এখন সর্ব্বত্র যদি সেই মূলনীতিরই প্রাধান্য প্রদান করা হয়,—ধর্ম্মের মূল অভিপ্রায় যদি অধিকরূপে বিশ্বমানব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে প্রগাঢ় দেহাত্মবোধ হইতে সমুত্থিত প্রবল জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতা বুদ্ধিরও হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া, তৎস্থলে সর্ব্বজীবের পক্ষে এক পরমেশ্বরের অধীনতারূপ একতার সম্বন্ধ অন্তরে অনুভূত হইলেই তদ্দ্বারা জগতের আকাঙ্ক্ষিত শান্তির পুনরাবর্ত্তন সহজ ও সম্ভব হইতে পারে।

অবিদ্যার প্রভাবে জীবের আত্মবিস্মৃতি ঘটিলেই যুগপৎ পরমাত্ম-বিস্মৃতি বা পরমেশ্বর-বৈমুখ্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে; যাহা হইতে জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মের যথার্থবোধ আচ্ছাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বিপরীত বুদ্ধির সংযোগ ঘটিয়া থাকে। অতএব সকল অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ

স্বরূপ আত্মবিস্মৃত জনসমাজে প্রকৃষ্ট আত্মচেতনা উদয়ের নিমিত্ত, আজ আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য ও বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—'আমি কে?' 'কেনই বা আমি সংসারতাপ সন্তপ্ত হইয়া আবার সেই সংসার মরুপথেই প্রধাবিত হইতেছি?' 'আমার এই সন্তাপের কারণই বা কি?' 'কি পাইলে আমার সকল সন্তাপ—সকল অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তি হইয়া, আমি পরম শান্তি লাভ করিতে পারি?' 'সুখই কি শান্তি? অথবা সুখ ও শান্তি পৃথক বস্তু?' 'আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই পরম-শান্তিস্বরূপ পরমানন্দ লাভের উপায় কি?' এই সমস্ত প্রশ্নের সুসমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বে প্রকৃষ্ট শান্তির পথ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে।

আবার স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি-বিচার দ্বারাও এই সকল প্রশ্নের কোনও সমাধান হইতে পারে না; কারণ মনুষ্যের দৈহিক আকার-প্রকারের পার্থক্যের ন্যায় মনোবুদ্ধি ও বিবেচনাদিরও পার্থক্য থাকায়, লৌকিক যুক্তি-তর্কাদিরও প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা নাই। এই-হেতু অলৌকিক বিষয় নির্ণয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশকেই চিরদিন প্রায় সকল দেশে—সকল জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপেই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। তাই আমরাও সর্ব্বধর্ম্মের আদি ও আকর স্বরূপ সনাতন বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ বা নির্দ্দেশ অনুসারেই এই পুস্তকের পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সকলে, উক্ত প্রশ্নের সুসমাধান বিষয়ে যথামতি সচেষ্ট হইতেছি।

মাদৃশ অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য জীবের পক্ষে এতাদৃশ দুরূহ বিষয়ের সমাধান প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া একান্তই দুঃসাহসিকতা হইলেও,—যিনি পঙ্গুকে শৈললঙ্ঘন ও মূক ব্যক্তিকেও শ্রুতি আবৃত্তি করাইতে সমর্থ,—সকল অসম্ভাবনা যাঁহার ইচ্ছা ও কৃপার লেশাভাস মাত্রেই সম্ভব হয়, সেই পরম কারুণিক দীনবৎসল শ্রীভগবানের প্রেরণাই আমাকে এই কার্য্যে পরিচালিত করিয়াছেন, ইহাই অন্তরে উপলব্ধি করিয়া এবং সেই

বিশ্বাস ও ভরসা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে এবম্বিধ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থদ্বারা বর্ত্তমান অশান্ত জগতে পরাশান্তি বিধানের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র সার্থকতা আছে বলিয়া সাধু ও সুধী সমাজে বিবেচিত হয়, কিম্বা শান্তিহারা একটি জীবেরও অন্তরে শ্রীভগবদ্ভক্তি বিশ্বাস উদয়ে প্রকৃষ্ট শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক বিবেচনায় তজ্জন্য সেই অনন্ত মহিমময় শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দেই পুনঃ পুনঃ আমার সকৃতজ্ঞ প্রণতি জ্ঞাপন করা রহিল। ইতি—

কলিকাতা।
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা।
শ্রীচৈতন্যাব্দা, ৪৭১।

বিনীত
গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তি ॥

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

সম্বন্ধ-প্রকরণ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

জীবমাত্রেই দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকে। জীব-জগতে 'সুখ' ও 'দুঃখের' মত এমন পরিচিত শব্দ অপর কিছুই নাই।

দুঃখের পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তিই জীবমাত্রের অভিপ্রায়।

জীবমাত্রেই কর্ম্মশীল; কায়িক, বাচিক বা মানসিক, যে কোন প্রকার কর্ম্মই হউক,—কর্ম্ম ব্যতীত জীব তিলার্দ্ধকালও অবস্থান করিতে অসমর্থ। কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করেন না। কর্ম্ম ও তাহার প্রয়োজন স্থূলতঃ বহুপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ সকল কর্ম্ম ও সকল প্রয়োজন, এক উদ্দেশ্য বহন করিয়া থাকে। 'জিহাসা' বা দুঃখ ও দুঃখেরহেতুভূত-বিষয়ের ত্যাগেচ্ছা এবং 'অভীপ্সা' বা সুখ ও সুখেরহেতুভূত-বিষয়ের গ্রহণেচ্ছা,—কর্ম্মমাত্রই এই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। ত্যাগ বা দুঃখনিবৃত্তি, ও গ্রহণ বা সুখপ্রাপ্তি—ইহাই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য; অতএব দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি ইহাই

জীবের একমাত্র প্রয়োজন ; এবং সেই প্রয়োজনও আত্ম-প্রয়োজন বা স্ব-প্রয়োজন।

পর-প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মই করেন না। স্থূলতঃ কোন কর্ম্মের পর-প্রয়োজন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, মূলতঃ স্ব-প্রয়োজনেই সেই পর-প্রয়োজন-লক্ষণ পর্য্যবসিত। লৌকিক জগতে যে সকল কর্ম্ম 'পরার্থ' নামে পরিচিত, সে সকল কর্ম্মেরও স্ব-প্রয়োজনপরতা মুখ্য উদ্দেশ্য। পর-প্রয়োজন সাধনই যাঁহাদের স্বার্থ,—পরহিত —পর-প্রয়োজনকে যাঁহারা যত অধিকতর স্ব-প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই তত অধিক পরার্থপর। অতএব স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে পরার্থপরতাও যে, স্ব-প্রয়োজনপরতায় পর্য্যবসিত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জীবের কর্ম্ম মাত্রেই স্ব-প্রয়োজনপর।

'আমি সুখী হইব' 'আমার দুঃখ না হউক', জীবমাত্রেরই এইরূপ একটি স্বাভাবিক অভিপ্রায় আছে। কীটাণুকীট হইতে ব্রহ্মা অবধি সকলেই সর্ব্বক্ষণ সুখ বা আনন্দকেই অভিলাষ করেন। ভাবের পার্থক্য থাকিলেও যে ভাবেই হউক, 'আমি সুখী হইব' এইরূপ বাসনা ও চেষ্টা আমরা সকলেই করিয়া থাকি ; 'কিন্তু আমি কে ?' 'আমার স্বরূপ কি ?' সাধারণতঃ আমরা সে সংবাদ বিদিত নহি ; 'আমি'র স্বরূপ অবগত না হইলে 'আমার' স্বভাব কি ?—স্ব-প্রয়োজন কি ? তাহা কিছুতেই অবধারিত হইতে পারে না।

স্ব-সুখ বা আত্মসুখই জীব-মাত্রের অভিলষিত বস্তু।

সাধারণতঃ আমরা দেহকেই 'আমি' বলিয়া চিনিয়া লইয়াছি। 'আমি' বলিতে জীব-সাধারণ আপন আপন দেহেন্দ্রিয়াদি জড়বস্তুকেই বুঝিয়া থাকে ; সেই জন্যই দেহ কৃশ বা স্থূল হইলে 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' অথবা চক্ষু অন্ধ কিম্বা কর্ণ বধির হইলে 'আমি অন্ধ' বা

'আমি বধির' ইত্যাদি দেহাত্মবোধক উক্তি, জীব-সাধারণ কর্ত্তৃক উক্ত হইতে শুনা যায় যদি এই 'দেহাত্মবোধ' অর্থাৎ জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিকেই 'আমি' জ্ঞান,—ইহা সত্য হয়, তবে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি রূপ 'আমি'কে সুখী করিলেই 'আমার' চিরাভীষ্ট সেই 'সুখ' নামক পদার্থ যে প্রকৃষ্টরূপেই আমার উপভোগ্য হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবসরমাত্রও নাই ; কিন্তু যদি সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বস্তু 'আমি' না হইয়া দেহাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থ 'আমি' হয়,—যদি 'আমি নির্ণয়ে' বা আত্মজ্ঞানের মূলে এরূপ কোনও ভ্রম সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে অনন্তকাল ধরিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি-সুখ-বিধান-তৎপরতায় জীবনের পর জীবন—অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিলেও, যথার্থ 'আমি' যে বস্তু, তাহার সুখ-বিধান বা সম্যক্ প্রসন্নতা-সম্পাদন কিছুতেই যে সম্ভব হইতে পারে না, এ-কথা কে না স্বীকার করিবেন ? পিশাচ বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন উত্তম আহার করিয়াও সর্ব্বদা ক্ষুধিত থাকে ও কৃশতা প্রাপ্ত হয়;—তাহার ভোজনেচ্ছা, ভোজনক্রিয়া ও ভোজ্যবস্তু সমস্তই যেমন স্ব-প্রয়োজন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াও পর-প্রয়োজনার্থে অর্থাৎ সেই আবিষ্ট পিশাচাদির তুষ্টি ও পুষ্টির নিমিত্তই সাধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মনির্ব্বাচনের মূলে কোনও ভুল ঘটিয়া থাকিলে, আমাদের স্ব-প্রয়োজন-উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মই যে প্রতিনিয়ত পর-প্রয়োজনেই পর্য্যবসিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

আত্মানুসন্ধান বা 'আমি' নির্ণয়।

'আমি'র নাম আত্মন্ বা 'আত্মা' ; এই আত্মাই জীব বা জীবাত্মা। 'আত্মা' ও 'আমি' এক বস্তু। দেহই কি আত্মা ? অথবা আত্মা দেহাতিরিক্ত—দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু ? ইহাই নির্ণয়-করণের নাম 'আত্মবোধ'। সমস্ত বেদ ও বেদানুগতশাস্ত্র এই আত্ম-তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মানুসন্ধানই ধর্ম্মানুসন্ধানের

মূল। বর্ণপরিচয় ব্যতীত যেমন ভাষাজ্ঞান হয় না, সেইরূপ আত্মপরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত লৌকিকালৌকিক কোন কর্ম্মই স্ব-প্রয়োজনের সাধনরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। 'আমি' কে? তাহা না জানিলে, 'আমার' প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, সকলই ভুলে পর্য্যবসিত হইবে। মূলে ভুল থাকিলে, আগাগোড়া সমস্তই ভুলফল হইবার কথা; অর্থাৎ স্ব-প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পর-প্রয়োজন সাধিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অঙ্ক কষিবার মূলে, যদি একটি অঙ্কের ভুল থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল হইলেও, ভুল-ফলই যেমন তাহার পরিণাম, সেইরূপ আত্মপরিচয়ের মূলে ভুল থাকিলে, সমস্ত জীবনাঙ্কের পরিণাম এক মহাভুলে পর্য্যবসিত হইবেই।

সর্ব্বকার্য্যমূলে আত্মবোধের প্রথম আবশ্যকতা।

জীবনাঙ্কের মূলে এই একটিমাত্র ভুলের জন্যই, জীবনের হিসাব-নিকাশকালে ব্যর্থতা-নদীর কূলে দাঁড়াইয়া কতবার যে জীবকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার যে পর্য্যন্ত না সেই ভুল সংশোধন হইতেছে, তাবৎ পুনঃপুনঃ সেই ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হইবে। 'আমি কে?' তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থিরীকৃত না হইলে, 'আমার প্রয়োজন কি?' 'আমার করণীয় কি?' তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। 'জীবাত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' অবগত হওয়াই ধর্ম্মানুসন্ধানের প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়। তাই নিজে তত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণি হইয়াও জীবহিতৈকব্রত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ জীবকে ধর্ম্মানুসন্ধানের ক্রম শিক্ষা দিবার জন্যই সানুনয়ে শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥' (শ্রীচৈঃ চ ২।২০।৯৬-৭)

'কে আমি ?' অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে হইলেই পরমাত্মার সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। ইহাকেই 'সম্বন্ধ-তত্ত্ব' কহে। সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-তত্ত্ব না জানিলে, অর্থাৎ 'আমি কে ?' তাহা না চিনিলে, আমার প্রয়োজন বা সাধ্য কি ?—তাহা নির্ণয় হইতে পারে না; আবার প্রয়োজন নির্ণীত না হইলে তৎপ্রাপ্তির সাধন বা অভিধেয় কি ?—ইহাও নিশ্চয় হয় না। এই কারণেই শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ, জীবশিক্ষার নিমিত্ত যথাক্রমে 'সম্বন্ধ', 'প্রয়োজন' ও 'অভিধেয়' বিষয়েই উপদেশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে সানুনয়ে নিবেদন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে 'কে আমি ?' তাহা আমরা জানি না। যাহাকে আমরা 'আমি' বলিয়া জানি, সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়ীয়-বিষয়ই যদি যথার্থ 'আমি' বা আত্মা হইত, তবে সেই দেহেন্দ্রিয়াদিকে উদ্দেশপূর্ব্বক 'আমি কৃশ' 'আমি স্থূল' 'আমি অন্ধ' 'আমি বধির' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা 'আমি' বলিয়া পরিচয় দিয়া, পরক্ষণেই আবার 'আমার হস্ত' 'আমার পদ' 'আমার দেহ' 'আমার নয়ন' 'আমার শ্রবণ' ইত্যাদি আত্মসম্পর্কীয়-বিষয় বা 'আমার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম না।

'আত্মা' ও 'আত্মীয়' অর্থাৎ আত্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় পৃথক্ বস্তু। আমার ধন, ধান্য, বসন, ভূষণাদি বিষয় সকল যেমন 'আমি' নহি, উহারা 'আমার' অর্থাৎ আত্মসম্পর্কীয় বিষয়মাত্র তেমনি 'আমার দেহ' 'আমার ইন্দ্রিয়' বলিতে, উহাও যে আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু, এবং এই পার্থক্যের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যে অপর কোনও এক 'আত্মবস্তু' আছে, স্থূলতঃ ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

আত্মা ও আত্মীয়ে পার্থক্য।

অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা-প্রতারিত জীব আমরা,—আমরা 'মিথ্যা আমি'র প্রয়োজন সাধনেই অমূল্য—অনন্ত জীবন বৃথা অতিবাহিত

করিয়া আসিতেছি। জীবের প্রতি অবিদ্যার ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পরিহাস আর কিছুই হইতে পারে না। মায়ার এই প্রবল প্রতারণা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিতে হইলে, দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ জড়স্তূপের অন্তরালে কোথায় কোন্ আঁধার-কোণে সেই 'সত্য-আমি' লুকান রহিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অবিদ্যার দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের কোন অজানা অন্তরাল হইতে, জীবাত্মার সকরুণ ক্রন্দন, অহর্নিশ—অবিশ্রান্ত সমুত্থিত হইতেছে।

নিত্যবদ্ধ জীবাত্মার অব্যক্ত ক্রন্দন।

সে সুর এতই অস্পষ্ট—এতই অব্যক্ত যে, বহির্দ্দেশ হইতে তাহার কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের অবসানে যখন নিশীথের নিস্তব্ধতা ক্রমে নিবিড়তর হইয়া উঠে,—পার্ব্বত্যদেশের সেই নীরবতার মধ্যেই যেমন নির্ঝরিণীর সকরুণ সঙ্গীত শ্রবণগোচর হয়, সেইরূপ রজস্তমো বিক্ষোভিত ইন্দ্রিয়সমূহের অবসাদ অথবা ঘোর কোলাহলের অবসানে, কোনও সময়ের জন্য সাত্ত্বিকভাবের উদ্রেক হইলে, কেবল সেই সময়েই—জীবনের সেই শান্ত মুহূর্ত্তের ভিতর হইতেই, গিরি-তরঙ্গিণীর কলধ্বনির মতই সকরুণ—চির বিরহখিন্ন জীবাত্মার অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তমো ও রজোভাবের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া, যদিও আমরা মায়া-নিগড়বদ্ধ ব্যথিত জীবের বেদনার গান প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারি না, তথাপি এই বিশ্বব্যাপী নিখিল-প্রাণীর অন্তর হইতে যে অতৃপ্তি ও অস্থিরতা নিরন্তর বহির্জগতে প্রকাশ পাইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহারই মূলদেশে উপনীত হইতে পারিলে তখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, ইহা অপর কিছুই নহে—ইহা সেই স্বপদচ্যুত—রোরুদ্যমান—ব্যথিত আত্মারই বেদনার গান বা অস্তিত্ব-সংবাদ।

শাস্ত্র বলেন, মৃগনাভি ও তাহার গন্ধের ন্যায় অথবা সূর্য্য ও তাহার কিরণাবলীর ন্যায় শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তি আছে। মৃগমদ

হইতে তাহার সৌরভ কিম্বা সূর্য্য হইতে তাহার কিরণপুঞ্জ অভিন্ন না হইয়াও যেমন কারণ ও কার্য্য কিম্বা আশ্রয় ও আশ্রিতাদি ভেদে ভিন্ন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ হইতে তাঁহার শক্তি অপৃথক্ হইয়াও কারণ ও কার্য্য, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক, ইত্যাদি রূপে নিত্যই পৃথক্। সূর্য্য বিরহিত কিরণ ও কিরণ বিরহিত সূর্য্যের অস্তিত্ব যেমন সম্ভব হয় না, ভগবান্‌কে বাদ দিয়া তচ্ছক্তির কল্পনা এবং শক্তিকে বাদ দিয়া ভগবানের কল্পনা করাও সেইরূপ অসম্ভব। একমাত্র শ্রীভগবানই সর্ব্বাধীশ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণ-পরতত্ত্ব হইলেও ('মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।'—গীতা ৭।৭) জানিতে হইবে, ভগবানে ও ভগবৎ-শক্তিতে পরস্পর একই সময়ে ভিন্নও হয়েন, অভিন্নও হয়েন, আবার ভিন্নও নহেন, অভিন্নও নহেন —এমন এক পরমাশ্চর্য্য ও অচিন্তনীয় ভিন্নাভিন্ন তত্ত্ব। দুর্ঘট বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহাতেই যুগপৎ সংঘটিত হয় বলিয়াই তিনি ভগবান্—তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বশক্তিমান্। এই অচিন্ত্য শক্তিমত্তাই ভগবানের ভগবত্তার নিদর্শন। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদত্ব যে যুগপৎ ও অচিন্তনীয়, গীতোক্ত (৯।৪-৫) শ্রীভগবদ্-বাক্যের এই যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

শক্তি ও শক্তিমানে সম্বন্ধ।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ।

"এই মত গীতাতেহো পুনঃপুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময়॥
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমাতে জগৎ বৈসে, না আমি জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥" (আদি। ৫।৭৩-৫)

ভুবড়ী হইতে যেমন অগ্নির উৎস উঠিতে থাকে, তেমনি কারণ-

স্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে তাঁহার শক্তি কার্য্যের ফোয়ারা নিত্যই উৎসারিত হইতেছে। তুবড়ী যেমন আলোক, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম এই ত্রিবিধ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইয়া, তদাশ্রয় বা তৎকারণ রূপে নিজেও স্বতন্ত্র অবস্থান করে, সেইরূপ অনন্ত শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান, নিজ নিখিল শক্তিকে প্রধানতঃ ত্রিবিধরূপে প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বতন্ত্র-স্বরূপে নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন। ত্রিবিধ ভগবচ্ছক্তি,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন ;—

শ্রীভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তিত্রয়।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (বিষ্ণু পু ৬।৭।৬১)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া, এই ত্রিবিধা শক্তি আছেন ; তদীয় স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য্য এবংবিধ শক্তিকে মায়াশক্তি কহে।

পরাশক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ;—ইহা অগ্নির প্রভাস্থানীয়া ; ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি ;—ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্থানীয়া ; মায়াশক্তির নামান্তর বহিরঙ্গা বা জড়শক্তি ; ইহা অগ্নির ধূমস্থানীয়া ; ('যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি' বৃঃ আঃ। ৪।৫) আর স্বয়ং শ্রীভগবান্ই কেবল তৎকারণ-স্বরূপ—অগ্নিস্থানীয়।

এক অখণ্ড শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ অশেষ বসুধাদিরূপে পরিণত হইয়াও যে নিজ মায়াতীত স্বতন্ত্র ও সবিশেষ স্বরূপে বা শক্তিমদ্রূপে নিত্যই বিরাজিত রহিয়াছেন, অগ্নি ও তৎপ্রভার দৃষ্টান্ত দ্বারা, শাস্ত্র সেই শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ এক অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্নত্বের রহস্য অতি সহজ কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ; যথা—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ (বিষ্ণু পু ১।২২।৫২)

অর্থাৎ অগ্নি যেমন যুগপৎ একদেশস্থিত হইয়াও স্বকীয় প্রভাদ্বারা বহুস্থানব্যাপী হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীহরি সবিশেষে এক-দেশবর্ত্তী হইয়াও নিজ শক্তিদ্বারা অখিল জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

জীব ও জড়শক্তির সমষ্টিই বিশ্ব-সংসার। তন্মধ্যে জীব চিৎকণ অর্থাৎ চৈতন্য শক্তির অংশ বা স্ফুলিঙ্গস্থানীয় বলিয়া প্রকাশ-স্বভাব; আর জড় অচিদ্ বা অচৈতন্য শক্তি বলিয়া, উহা ধূমের মতই আবরক বা অপ্রকাশ-স্বভাব; জীবশক্তি ও জড়শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবময়ী। শ্রুতিও জীবকে স্ফুলিঙ্গের মতই অণু ও বহু বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন;—

তটস্থা বা জীবশক্তির চিদণুত্ব ও বহুত্ব।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক উ ২।১।১)

অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে অগ্নিসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গকণা বিনির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য—অপরিমিত চিৎকণ বা চিদণু পুঞ্জকেই জীবরূপে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন;—

কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
(শ্রীভাগবতে—শ্রুতি-ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

তাহা হইলে বুঝিলাম এই যে, অগ্নিরাশি হইতে যেমন তৎসদৃশ অসংখ্য অগ্নিকণা বা স্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীভগবান্ হইতে সচ্চিদানন্দের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বা চিৎ-পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিনিঃসৃত হইয়া, সৃষ্টির অবসানে তাঁহাতেই বিলীন ও

পুনরায় সৃষ্টির সহিত তাঁহা হইতেই ব্যক্ত হইতেছে। এই অপরিসংখ্যেয় চিদণুপুঞ্জই 'জীব' নামক নিত্যবস্তু; যাহার আয়তন কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"
(শ্রীচরিতামৃতে। আদি ৭।১১১)

ঈশ্বরের সহিত জীবশক্তি ও জড়শক্তির সম্বন্ধ ও পার্থক্য।

স্ফুলিঙ্গ ও ধূম একই অগ্নির শক্তি হইলেও যেমন অগ্নির আলোক ও উত্তাপাদি স্বরূপগত ভাব তৎস্ফুলিঙ্গেই নিহিত থাকে কিন্তু ধূমে নহে, সেইরূপ জীব ও জড় এই উভয়বিধ শক্তি একই ঈশ্বরের হইলেও, তদীয় সৎ, চিদ্ ও আনন্দ ধর্ম্ম, স্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীবেই নিহিত আছে, কিন্তু ধূমস্থানীয় বহিরঙ্গ জড় বা মায়া শক্তিতে তাহা নাই। আবার কারণ-স্বরূপ অগ্নিরাশির ধর্ম্ম, তৎকার্য-স্বরূপ স্ফুলিঙ্গে নিহিত থাকিলেও, যেমন অগ্নিতে পূর্ণরূপে ও স্ফুলিঙ্গে অংশতঃ অবস্থিত, তেমনি সচ্চিদানন্দাদি নিজ স্বরূপগত ভাব সকল ভগবানে পরিপূর্ণরূপে ও চিৎকণ জীবে কণ পরিমাণে অবস্থিত জানিতে হইবে। ঈশ্বর বিভু-চৈতন্য স্বরূপ ও জীব অণু-চৈতন্য; চৈতন্যাদি ধর্ম্মে উভয়ে অভিন্ন হইয়াও, এই বিভুত্ব ও অণুত্বের মহা ব্যবধান—জীব ও ঈশ্বরের ভিন্নতা বা ভেদপক্ষ সৃজন করিয়াছে। এই বিভুত্ব ও অণুত্বের পার্থক্যবশতঃই ঈশ্বর মায়াধীশ ও স্বতন্ত্র এবং জীব মায়াধীন ও পরতন্ত্র হইয়া থাকেন। সূর্য্যের প্রভাবের নিকট তিমিররাশি পরাভূত হইলেও যেমন সেই তিমির খদ্যোতের ক্ষীণদ্যুতিকে পরাভব করিয়াই থাকে, সেইরূপ বিভু-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্যের পার্থক্যবশতঃ মায়া, শ্রীভগবৎ সমীপে সর্ব্বদাই বিলজ্জমানা হইয়াও স্বরূপ-বিস্মৃত ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া, জড়ীয়

দেহকেই 'আমি' ও দেহ-সম্পর্কীয় জড় বিষয় সকলকে 'আমার' বলিয়া বোধ করাইয়া থাকে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(শ্রীভাগবতে। ২।৫।১৩)

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, নির্ব্বোধ জীব সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

একই অভিন্ন বস্তুর বিভুত্ব ও অণুত্ব বা অংশিত্ব ও অংশত্বের পার্থক্যে স্বভাবেরও ভিন্নতা সংঘটিত হয়। শাস্ত্রে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ;—

বনানি দহতে বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবঃ॥

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রবল দাবাগ্নির বনদহনকার্য্যে সমীরণ অনুগত সখার ন্যায় সাহায্য করিয়া, সেই সমীরণই আবার ক্ষুদ্র দীপশিখার পক্ষে বিনাশের কারণ হইয়া থাকে ; অতএব ক্ষুদ্রত্বের কোন স্থলেই গৌরব নাই।

শ্রুতি, পরমেশ্বরকে বিভু-সচ্চিদানন্দ ('মহান্তং বিভুমাত্মানং—' কঠ উ ১।২।২২) এবং জীবকে অণু-সচ্চিদানন্দ ('এষোঽণুরাত্মা—' মুণ্ডক উ ৩।১।৯) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ হইলেও 'জীব' আখ্যাত সেই চিৎ-পরমাণু অনাদিকাল হইতেই নিজ অণুত্ব ও পরমাশ্রয় পরমেশ্বর হইতে বহিশ্চরত্ব নিবন্ধন, মায়ার অবিদ্যা নামক পাশ দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে। ভগবদ্-বৈমুখ্যরূপ ছিদ্র বা দোষই জীবের পক্ষে মায়াধীনতার কারণ হইলেও, অনাদিত্ব নিবন্ধন উক্ত কার্য্য-কারণ উভয়কেই যুগপৎ সংঘটিত বলিয়াই জানা আবশ্যক। যেমন

বীজই বৃক্ষের কারণরূপে প্রসিদ্ধ থাকিলেও, উভয়েই অনাদিসিদ্ধ বলিয়া বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না, সেইরূপ জীবের ঈশ-বিমুখতা ও মায়া-বশ্যতার মধ্যে যথাক্রমে কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধ থাকিয়াও উহা অনাদিসিদ্ধ বলিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে ও কোন্‌টি পশ্চাতে এরূপ বিচারের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। আলোক ও অগ্নিতে নিত্যই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিয়াও যেমন উহাদের অনাদিত্ব নিবন্ধন উভয়ই যুগপৎ জানিতে হইবে, সেইরূপ জীবের পক্ষে অনাদিকাল হইতে ঈশ-বিমুখতাই মায়াধীনতার কারণ হইয়াও উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত।

জীবের ঈশ-বিমুখতা ও মায়াধীনতার অনাদি-সিদ্ধত্ব।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
(শ্রীচরিতামৃতে। ২।২০।১০৪)

অনাদিকাল হইতেই জীবের এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বা ভগবদ্-বৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, সংসারদুঃখ-প্রদানরূপ দণ্ডবিধানপূর্ব্বক জীবকে সংশোধন মানসে, মায়া নিজ 'আবরিকা' ও 'বিক্ষেপিকা' নামক বৃত্তি বিশেষ দ্বারা যথাক্রমে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবরণপূর্ব্বক, জড়ীয় দেহ-গেহাদি বিষয়ে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকেন। আত্ম-বিস্মৃতির এই বিষময় ফলস্বরূপ জড়সঙ্গ ও জড়ীয় কর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বকর্ম্মানুরূপ যে বারম্বার বিবিধ প্রকার দেহ-সংযোগ ঘটে, তাহারই অপর নাম 'সংসারগতি'। সংসারগতি-প্রাপ্ত জীবমাত্রকেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বা ত্রিতাপের সহিত ঈশ্বর হইতে জড়রূপ দ্বিতীয়

জীবের সংসারগতি।

অভিনিবেশ বশতঃ সর্ব্বদা ভবভয়ে ভীত হইতে হয়। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রোপাখ্যানে জীবের ভবভয়ের কারণ সম্বন্ধে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ (শ্রীভাগবতে। ১১।২।৩৭)

অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিমুখ জীবের মায়া কর্ত্তৃক স্বরূপ-বিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন দেহাদিতে আত্মাভিমান ঘটে; দ্বিতীয় বিষয় যে জড়-দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইতেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীগুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক অনন্যা ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের ভজন করিবেন।

চিদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত জড়ে চেতনা লক্ষণের কারণ।

চৈতন্য বা জ্ঞান, চিৎকণ জীবের ধর্ম্ম,—উহা জড়ের ধর্ম্ম নহে। জড় দেহে যে শীত-গ্রীষ্মাদি ও সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে, সেই অনুভূতি জড়-দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম নহে,—চিন্ময় আত্মারই ধর্ম্ম। অগ্নিসন্তপ্ত লৌহদণ্ডে যেমন দাহিকা শক্তি পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ চিৎকণ জীবাত্মার অবস্থান ও অভিনিবেশ বশতঃ অচিদ্ বা জড়দেহেও চৈতন্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তপ্ত লৌহদণ্ডকে সলিলে নিমজ্জিত করিলে যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার দাহিকা শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায় ও তখন বুঝিতে পারা যায়, উত্তাপ লৌহে সঞ্চারিত হইয়াছিল মাত্র, বস্তুতঃ উহা অগ্নিরই ধর্ম্ম—লৌহের নহে, সেইরূপ ভৌতিকদেহ জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তখন বুঝিতে পারা যায়, যাহার সান্নিধ্যবশতঃ সেই জড়দেহেও শীতাতপাদির অনুভব হইত, তাহাই চিৎকণ-জীব—তাহাই জীবাত্মা—তাহাই যথার্থ 'আমি'।

হরিচন্দন-বিন্দু ললাট প্রদেশে স্থাপিত হইলেও যেমন তাহার সুগন্ধও শীতলতা সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎ-পরমাণু জীব, হৃদয়ের একদেশে অবস্থান করিলেও ('হৃদি হ্যেষ আত্মা'—প্রশ্ন উ। ৩।৬) তাঁহার চিৎপ্রভাব সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয়, ইহাই জানিতে হইবে।

জীবাত্মার ব্যাপকত্ব

অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন-বিপ্রুষঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পু)

চিদ্বস্তুর ব্যাপকতা ধর্ম্ম থাকায়, চিৎকণ জীবেরও ব্যাপকতা লক্ষণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেমন প্রদীপ শিখা একদেশস্থ হইলেও স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমগ্র গৃহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, চিদণু জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহের একদেশস্থ হইয়াও সমগ্র দেহে নিজ চেতনাশক্তি বিস্তার করেন।

যাহা কখন কোনও কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই নিত্যবস্তু, এবং যাহার কোনও বিকার বা ভাবান্তর নাই তাহাকেই নির্ব্বিকার বস্তু কহে। চিদ্বস্তুই নিত্য ও নির্ব্বিকার; জীব, চিৎকণ বলিয়া, জীবাত্মাও নিত্য ও নির্ব্বিকার পদার্থ। (গীতা ২।২০)। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর যে বস্তুর অভাব ঘটে, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, তাহাকেই অনিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। যে বস্তুর স্বরূপগত পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই বিকারী বস্তু। অনিত্যতা ও বিকৃতি জড়ের ধর্ম্ম। চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব; সুতরাং যে-বস্তু নিত্য ও নির্ব্বিকার, তাহাই চিদ্বস্তু এবং যাহা অনিত্য ও বিকারশীল, তাহাকেই জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। চৈতন্য ও জড়ের পার্থক্য নির্ণয়ে ইহাই প্রধান লক্ষণ।

অবিকার ও বিকার লক্ষণে আত্ম ও অনাত্মবস্তু নির্ণয়।

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে অবিদ্যাবশতঃ জীব যে

"আমি' বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ ঐ সকল পদার্থের কেহই 'আমি' বা আত্মবস্তু হইতেই পারে না, যে-হেতু আত্মা চিদ্‌বস্তু; সুতরাং অবিকারী ও নিত্য। দেহের যখন উৎপত্তি ও বিনাশ পরিলক্ষিত হয়, দেহের যখন কৃশতা ও স্থূলতাদি বিকার স্পষ্টতঃই পরিদৃষ্ট হয়, তখন এই অনিত্য ও বিকারশীল দেহ যে আত্মবস্তু নহে—জড়বস্তু, তাহা নিবিষ্ট-ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি। আবার অন্ধতা-বধিরতাদি বিকার কর্তৃক ইন্দ্রিয়বর্গকে, হিক্কা-শ্বাসাদি বিকার কর্তৃক প্রাণকে, ও কামক্রোধাদি বিকার কর্তৃক মনকে যখন বিকৃত হইতে দেখা যায়, তখন ইহারাও যে জড়বস্তু—আত্মবস্তু নহে, ইহা সুনিশ্চয়। বুদ্ধিকেও যখন সুষুপ্তি অবস্থায় নিজ কারণীভূত অবিদ্যায় বিলীন হইতে দেখা যায়, তখন উৎপত্তি ও বিলয়ধর্ম্মী বুদ্ধিও যে আত্মবস্তু নহে—জড়বস্তু, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আকাশ যখন স্বরূপতঃ নির্ম্মল হইয়াও সময় বিশেষে ধূলি ও ধূম-সংলিপ্ত বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের অতীত ও সাক্ষী হইয়াও যিনি তৎসংলিপ্তের ন্যায় 'বিশ্ব', 'তৈজস' ও 'প্রাজ্ঞ' নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, —দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত ঘুমাইয়া পড়িলেও, যিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলেন,—সমস্ত অনুভব ও স্মরণ করেন, তিনিই 'জীব' নামক আত্মবস্তু। কোষের মধ্যে যেমন অত্যুজ্জ্বল তরবারি সংরক্ষিত হইয়া থাকে সেইরূপ অন্নময়াদি কোষের অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ নামক দেহের অভ্যন্তরে যে চৈতন্যবস্তু নিজে প্রকাশিত থাকিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশ করিতেছেন তিনিই জীব—তিনিই আত্মবস্তু। অচেতন দেহাদি জড়বস্তু এই জীবাত্মার চৈতন্য-শক্তিতেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ংই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—(১৩।৩৩)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

হে ভারত! যেমন সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী—জীবাত্মা এই সমগ্র দেহরূপ ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।

অন্ধকার জগৎ কিরণালোকে প্রকাশিত হইলেও, সূর্য্যই যেমন কিরণাবলীর আশ্রয় ও কারণস্বরূপ হওয়ায়, সূর্য্যকেই জগৎপ্রকাশক বলা হইয়া থাকে, তেমনি চিৎকিরণকণা-স্বরূপ জীব-চৈতন্যের সান্নিধ্য নিবন্ধন জড়-দেহাদিতে চৈতন্যলক্ষণ প্রকাশিত হইলেও জীবশক্তির আশ্রয় ও কারণস্থানীয় যিনি,—সেই অনন্তজ্ঞানময় চিৎ-সূর্য্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকেই তাহার পরমকারণ বলিয়া অবগত হইতে হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান নিজ অবিচিন্ত্যশক্তি দ্বারা এক ও অখণ্ড হইয়াও প্রত্যেক জীবদেহের অভ্যন্তরে 'পরমাত্মরূপে' অবস্থান করিয়া থাকেন। তদীয় অধিষ্ঠানবশতঃই জীবের সত্তা ও জড়ের সত্তা বিধৃত হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন কিরণপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয় না, দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ পরমাত্মরূপে সর্ব্বজীবদেহের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, সেখানে তৎশক্তিস্থানীয় জীবের অস্তিত্বও অসম্ভব হয়; চিৎকণ-জীবাত্মাই অচৈতন্য জড়দেহাদিতে চেতনা-সঞ্চারকার্য্যের কারণ হইলেও, সেই জীবাত্মারও আশ্রয় ও কারণস্বরূপ বলিয়া, পরমাত্মা—পরমেশ্বরকেই উহার পরমকারণ জানিতে হইবে। অনাদি অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব, স্বীয় কর্ম্মোপলব্ধ দেহে আত্মাভিমানপূর্ব্বক যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন; পরমাত্মাও সেই দেহস্থিত জীবের পরমাশ্রয় রূপে সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ।

একই জীবদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও, অনাদি ঈশ্বর বহির্ম্মুখ ও অণুচৈতন্য বলিয়া জীবেরই কর্ম্মলিপ্ততা জানিতে হইবে; পরমাত্মা মায়াধীশ ও বিভুচৈতন্য-স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে যে,

অবিদ্যাকৃত কর্ম্মলিপ্ততা অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক জীব-দেহের অন্তর্যামী—পরমাত্মা, নিজে নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ ভাবে থাকিয়া জীবের কর্ম্ম ও তৎফলভোগ অবলোকন করিতেছেন মাত্র। তাই শ্রুতি, একই জীবদেহরূপ বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ও পরম সখ্যভাবাপন্ন যুগল বিহঙ্গসদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বর্ণন করিয়া, একের কর্ম্ম-লিপ্ততা ও অপরের নির্লিপ্ততার কথা ঘোষণা করিয়াছেন ;—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (শ্বেতাশ্ব উঃ ৪।৬)

অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয় একত্র সমান-ভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ; তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন (পরমাত্মা) ফলভুক্ না হইয়া কেবল দর্শন করেন।

পরমাত্মাই জীবাত্মার চিরাশ্রয় ও চিরসখা।

জীব স্বকর্ম্মবশে পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করিয়া যখন দেহান্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য গমন করে, তখন সকল আত্মীয়—সকল বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও জীবের সেই সহায়হীন অবস্থায় যিনি একমাত্র সঙ্গী হইয়া থাকেন, তিনিই জীবের আত্মা হইতেও প্রিয়তর সেই পরমাত্মা। জীব স্বকর্মবশে স্থাবর, জঙ্গম, দেব, মনুষ্য, কিন্নর, কীট, মান্য বা ঘৃণ্য যে কোনও দেহ পরিগ্রহ করুন না কেন,—কোনও সময়ের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া, চির-জীবনের চির-সহচররূপে যিনি জীবের সহিত সেই সেই দেহে অনুগমন করেন, তিনিই জীবের সেই পরমাশ্রয়—পরমাত্মা। সংজ্ঞাহারা সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার বিকারাচ্ছন্ন শীর্ণ মুখের দিকে আরোগ্যের লক্ষণ দেখিবার আশায় জননী যেমন দিনরাত

নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকেন, সেইরূপ অবিদ্যার বিকারঘোরে দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক সংসার স্বপ্নে নিমগ্ন জীবকে যিনি স্নেহাঙ্কে ধারণ করিয়া দেহমধ্যে উপবিষ্ট থাকেন, তিনিই জীবের সেই-জননী হইতেও পরমাত্মীয়—পরমাত্মা। পথভ্রান্ত পথিকের মত কর্ম্মের বোঝা স্কন্ধে লইয়া জীব অবিশ্রান্ত সংসার পথে ছুটিয়াছে, আর জীবাত্মার আত্মা যিনি—জীবের পরমসখা পরমাত্মা চির-সাথীরূপে নিরন্তর সঙ্গে চলিয়াছেন—তাহার সত্তা সংরক্ষণ করিবার জন্য। সংসার-মরুপথে জীব ও ঈশ্বরের এই সম্মিলিত মহা-অভিযানের অন্তরালে এক মহান্ উদ্দেশ্য লুকান রহিয়াছে, সে উদ্দেশ্য এই যে—সংজ্ঞাহারা জীব কোনও ভাগ্যে চেতনা লাভ করিয়া যে মুহূর্ত্তে নিজ স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অবগত হইবে—যেদিন জীব প্রকৃষ্ট রূপে বুঝিতে পারিবে, যাহার অন্বেষণে অনাদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহির্জগতের দিকে সে ছুটিয়াছে, সেই 'সুখ'-নামকবস্তুর মূল উৎস বাহিরে নহে—অন্তরে, যে দিন এই রহস্য অবগত জীব, তাহার বহির্মুখতা অবরোধ করিয়া পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিবে,—অন্তর্মুখী হইবে, তৎক্ষণাৎ আপন হইতেও আপনার যিনি, সেই পরম-প্রিয় পরমাত্মা, জীবকে বুকের উপর টানিয়া লইবেন। কবে কোন্ দিন অবিদ্যার ঘনান্ধকারের ভিতর হইতে জীবের সেই স্বরূপ ভাব জাগিয়া উঠিবে,—সেই একটি শুভ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় যিনি অনাদি-কাল হইতে জন্মে জন্মে, জীবনে মরণে জীবের চিরসঙ্গী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, তিনিই জীবের সেই কোটিপ্রাণ হইতেও প্রিয়তর—পরমাত্মা। প্রিয়তমা কান্তা, প্রিয়তম কান্তকর্ত্তৃক বাহুপাশে দৃঢ়বদ্ধ হইলে, আনন্দের আতিশয্য নিবন্ধন যেমন আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা আত্ম-বিস্মৃত জীবের কোনও ভাগ্যে স্বরূপভাব জাগিয়া উঠিলে তখন পরমাত্ম-বস্তুর সন্দর্শন লাভে ও তৎকর্ত্তৃক নিবিড় আলিঙ্গন-

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনানন্দ।

সুখে, পুনরায় আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। জীবের পক্ষে উক্ত উভয় প্রকার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মহান্ পার্থক্য এইযে, একটি অবিদ্যাকৃত ও অপরটি আনন্দোত্থিত। অবিদ্যাকৃত আত্মবিস্মৃতির নাম জড়ত্ব, আর আনন্দোত্থিত আত্মবিস্মৃতি যাহা, তাহাই পূর্ণ-অভিব্যক্ত জীবত্বের পূর্ণ পুরস্কার।

তাই শ্রুতিও উক্তপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারাই, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন জনিত আনন্দের কিঞ্চিৎ আভাস জীব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ;—

"তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" (বৃহদারণ্যক উঃ ৪।৩।২১)

অর্থাৎ যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই অনুভব করে না, তদ্রূপ জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া, কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারেন না।

চিৎকণ জীবাত্মার ও তদাশ্রয় পরমাত্মার অধিষ্ঠানবশতঃই যেমন অচিদ্ বা জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিতে চেতনা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ জড়ীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত যে এক বিরাট্ জীবনী-শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহারও মূলে জীবশক্তি ও তদ্-অন্তর্যামী পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যষ্টি জীবের আশ্রয়স্বরূপে যিনি এক ও অখণ্ড হইয়াও, নিজ অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা প্রত্যেক জীবদেহে পৃথগ্ভাবে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বীয় শক্তিস্থানীয় জীব-চৈতন্যের দ্বারা জড়দেহে চেতনা প্রদান করেন, সেই পরমাত্মাই আবার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীব-চৈতন্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে জীবনী-শক্তি

জীবদেহের ন্যায় জগদ্দেহেরও পরিচালনাদির মূলে অন্তর্যামি পরমাত্মা।

সঞ্চার করিতেছেন। 'নিয়ামক-শক্তি' নামে যাহা জড়জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, অন্তর্যামী পরমাত্মাই সে শক্তির মূল আশ্রয়। তদীয় সত্তায় নিখিল পদার্থের সত্তা বিধৃত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরমাত্মার অধিষ্ঠানকাল পর্য্যন্তই দেহ যেমন শবাকারে পরিণত হয় না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও সেই কাল পর্য্যন্তই প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয় না—যে পর্য্যন্ত পরমাত্মা অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। যাহা কিছু স্থূল,—যাহা কিছু সূক্ষ্ম,—তিনি সকলেরই অন্তর্যামী।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥"

(তৈত্তিরীয় উঃ ২।৬।২)

অর্থাৎ তিনি (পরমেশ্বর) এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়া, সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং তৎ অর্থাৎ অমূর্ত্ত তিনি উভয়ই হইলেন।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থানীয় জীবদেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ যে নিয়মে সংঘটিত হয়, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সেই একই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব অণু-চৈতন্য ও পরমেশ্বর বিভু-চৈতন্য বলিয়া, জীবে অল্পাকারে ও পরমেশ্বরে পূর্ণাকারে নিয়মনী শক্তি অবস্থিত। 'নিয়ম' চৈতন্যের ধর্ম্ম—জড়ের ধর্ম্ম নহে। জড়বস্তুকে নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতে দেখিলেও, সেই নিয়মের নিয়ন্তৃরূপে চিদ্‌বস্তুকে অবস্থিত বলিয়া জানিতেই হইবে। চৈতন্যই নিয়মের প্রবর্ত্তক; জড়বস্তু তদধীনে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র। দেহপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েই জড়বস্তু সুতরাং উভয়কেই চিদ্‌বস্তুর সহায়তা বা আশ্রয় লাভ করিয়াই নিয়মিত হইতে হয়। পরমাত্মার অধিষ্ঠানবশতঃ দেহ যেমন বিধৃত ও বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদি বিবিধ নিয়মে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ অন্তর্যামী পুরুষের অধিষ্ঠানবশতঃই মহাশূন্যে বিধৃত ও পূর্ব্বাহ্ণ,

মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নাদি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষাদি বিবিধ নিয়মে অনুবর্ত্তিত হইতেছে।

জীবাত্মার আত্মা যিনি, সেই পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্তই যেমন তাহাতে রস-রক্তাদি সঞ্চালিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণ-ক্রিয়া চলিতে থাকে, কেশ, লোম, অশ্রু, নখাদির উদ্গম ও ক্ষুৎ-পিপাসা, জাগরণ, নিদ্রা, আশা, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবান্তর সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল বিশ্বাত্মা যিনি,—সেই পরমেশ্বর—পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেই পর্য্যন্তই অনন্ত সৌরজগৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সীমায় ভ্রাম্যমান হইয়া থাকে,—সেই পর্য্যন্তই অপার জলধিজলে তরঙ্গোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় ও নদ নদী-সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে; বিশ্বাত্মারূপে বিশ্বপতি যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ও শুষ্কতার পর বর্ষার বারিধারায় জগৎ সিঞ্চিত হয়, হিম-ঋতুর জড়তা ও অবসাদের অবসানে বসন্তের নবীনতায় ও নবোৎসাহে ধরিত্রী নূতন হইয়া উঠে,—সেই পর্য্যন্তই দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, সংবৎসরাদি কালাবয়ব সকল ও বিদ্যুৎ, বায়ু, বর্ষা, কুয়াসা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; পরমেশ্বর—পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত বিশ্বের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্তই ধূসর ধরণীপৃষ্ঠে শ্যামল শস্য ও সুন্দর তরুলতাদির উদ্গম হয়,—সেই পর্য্যন্তই বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে, বৈচিত্র্যময় বিবিধ পত্র, পুষ্প ও ফলের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই পর্য্যন্তই স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক দণ্ডে দশবার নিজ সন্তানকে সাজাইবার প্রয়াসের মতই যেন কাহার ইচ্ছায় বসুন্ধরাকেও ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে—নূতন বর্ণে—নবীন সজ্জায় সজ্জিত হইতে দেখা যায়। জড়বিশ্বের এই সমস্ত সজীবতা, ইহা জড়ের আত্ম-

:বিশ্বাত্মরূপে পরমাত্মার অধিষ্ঠান হেতু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াশীলতা ও সজীবতা।

মহিমা নহে,—ইহা সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারই অধিষ্ঠান মহিমা। পরমাত্মা, জীবের সহিত স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে, যেমন দেহভাব বিনষ্ট হইয়া তৎকারণীভূত ক্ষিত্যাদি ভৌতিক ভাবের সহিত উহা বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত যিনি,—সেই পরমাত্মা যখন একযোগে ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টিজীবের সহিত উৎক্রান্ত হয়েন, তখনই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রলয়পয়োধিজলে—কারণার্ণব-সলিলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তিলে তৈলের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই সমস্ত বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহারই অধিষ্ঠানে—তাঁহারই নিয়মে—তাঁহারই অনুশাসনে জীব ও জগৎ নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে; জড়বাদপ্রমত্ত—অজ্ঞানান্ধ জীবগণকে জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিবার জন্য, তাই জলদগম্ভীর স্বরে জননী শ্রুতি বলিতেছেন,—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মূহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক উ ৩।৮।৯)

অর্থাৎ (যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন) হে গার্গি! ঐ অক্ষর পুরুষের শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উহারই শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মিত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উহারই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকল বিধৃত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উহারই প্রশাসনে হিমালয়াদি পর্ব্বত সকল হইতে উৎপন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নদী সকল দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে;—ইত্যাদি।

জীবদেহ যেমন ব্যষ্টি-জীবের শরীর বা অধিষ্ঠান, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি সমষ্টি-জীবের শরীর বা অধিষ্ঠান। এক এক ব্রহ্মাণ্ডগত জীব-সমষ্টির নাম 'হিরণ্যগর্ভ'; ইনিই 'ব্রহ্মা' নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা সমষ্টি-জীবের অধিষ্ঠাতৃ রূপ বা সমূর্ত্তভাব। দ্রবময়ী গঙ্গা ও যাহা গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী রূপ—সেই মূর্ত্তিমতী গঙ্গায় যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জীব-সমষ্টি বা 'হিরণ্যগর্ভ' ও তদধিষ্ঠাতৃ রূপ বা 'ব্রহ্মা' এক ও অভিন্ন স্বরূপ; অতএব ব্যষ্টি-জীবের সহিত দেহান্তর্যামী পরমাত্মা উৎক্রান্ত হইলে যেমন ব্যষ্টি দেহের বিনাশ ঘটে, সেইরূপ দ্বিপরার্দ্ধকালাবসানে জীবসমষ্টি বা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী পরমাত্মা যখন উৎক্রমণ করেন, তখন চতুর্দ্দশ-ভুবনাখ্য সমষ্টিজীবদেহ প্রলয়-ভাব প্রাপ্ত হইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষে লীন হইয়া থাকে। যুগপৎ সমষ্টী-জীবের প্রারব্ধক্ষয়ে ও সমষ্টি জীবের ভোগ সাধন করিতে করিতে প্রকৃতিশক্তির জীর্ণতা উপস্থিত হইলে, অনন্ত জীবশক্তির সহিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যখন এইরূপে পরমেশ্বরে প্রলয়লীন হইয়া যায়, তখন নাম-রূপ বিশিষ্ট সংসার বিদ্যমান না থাকায়, স্বরূপ-বৈভবের সহিত একমাত্র পরমেশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন; ('একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ'—মহোপনিষদ্)। লীলাময় পরমেশ্বরের পুনরায় সিসৃক্ষা বা বিশ্বসৃজনেচ্ছার উদয় হইলে, (সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'।—তৈত্তিরীয় উ ২।৬।২) তদীয় ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা প্রলয়লীন জীব ও জড়জগৎ কারণ ভাব হইতে পুনরায় কার্য্যভাবে ব্যক্ত হয়। এইরূপ অনন্ত জীবের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে।

ব্রহ্মা, জীবসমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠাত্রী রূপ বা সমূর্ত্তভাব।

জীবদেহের ন্যায় জগদ্দেহেরও প্রলয় ও সৃষ্টি প্রণালীর অভিন্নতা।

একই পরমেশ্বর, বিবিধ প্রকার বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত নিজ অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা বিবিধ মূর্ত্তিতে ও বিবিধ নামে নিত্যই প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি যুগপৎ অনন্ত মূর্ত্ত হইয়াও এক, এবং এক হইয়াও অনন্ত মূর্ত্ত; সেই একই পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বর যখন স্বাংশ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে, প্রকৃতির অন্তর্যামিরূপে, তাহার সত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই প্রথম পুরুষাবতার বা 'কারণার্ণব-শায়ী" মহাবিষ্ণু আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রলয়লীন বিশ্বকে পুনরায় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তিনিই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন; প্রথম পুরুষের সৃষ্টি-সংকল্পই তাঁহার প্রকৃতীক্ষণ। পুরুষের ঈক্ষণে সমা প্রকৃতি বিষমা হয়; তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই প্রথম পুরুষাবতারই আবার এক হইয়াও যখন অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে তাহার সত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার বা 'গর্ভোদকশায়ী' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারই নাভিকমল হইতে সমৃণাল-কমলাকার চতুর্দ্দশ ভুবনের সহিত সমষ্টি-জীব বা হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন। সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতারই আবার এক হইয়াও যখন অনন্তপ্রকাশে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড-গত ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামিরূপে পৃথক্ পৃথক্ জীবসত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই তৃতীয় পুরুষাবতার বা 'ক্ষীরাব্ধিশায়ী' নামে শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতারই সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। সেই একই পরমেশ্বর সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতির অন্তর্যামী থাকিয়া প্রকৃতিকে শক্তিশালিনী

অচিন্ত্য ও সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানের বহু মূর্ত্তি ভেদেও একাত্মতা।

প্রথম পুরুষাবতার।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

তৃতীয় পুরুষাবতার।

করিতেছেন ; তিনিই বিশ্বাধার ও বিশ্বাত্মরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা ধারণ করিতেছেন ;—তিনিই পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের সত্তা সংরক্ষণ করিতেছেন। সেই পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা,—সেই পরমাত্মাই বিশ্বাত্মারূপে বিশ্বের আশ্রয়। উক্ত পুরুষাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ম্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ (সাত্বততন্ত্রে)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম প্রথম পুরুষ ; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামী, তাঁহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ, এবং যিনি সর্ব্বভূতের বা ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী তাঁহার নাম তৃতীয় পুরুষ।

দীপরশ্মির স্বরূপ বিদিত হইতে হইলে যেমন দীপশিখার সমীপে উপনীত হইতে হয়, তেমনি জীবাত্মার স্বরূপ অন্বেষণ করিতে যাইয়া স্বতঃই পরমাত্ম-স্বরূপের পরিচয় আসিয়া পড়ে। দীপশিখাই রশ্মির আশ্রয় বা কারণ-স্বরূপ হইলেও, নিখিল তেজোপদার্থের সূর্য্যই যেমন পরম কারণ, সেইরূপ পরমাত্মা যাঁহার স্বাংশপ্রকাশ, সেই সর্ব্বাংশী—পরমেশ্বরই সমস্তের পরম কারণ। নিখিল-কারণের কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া যে তত্ত্বের চরণতলে সকল অন্বেষণের অবসান হয়, তাঁহাকেই পরমেশ্বর—পরমতত্ত্ব—পরম দেবতা বলিয়া জানা আবশ্যক। শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই পরম দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এবো পরো দেবঃ"—(শ্রীগোপাল উ ; পূর্ব্ব ৪৯) অর্থাৎ সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। কেবল পুরুষাবতার নহেন,

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের পরম কারণ—পরম দেবতা।

নিখিল অবতার—নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ যাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণই সেই অবতারী বা 'স্বয়ংরূপতত্ত্ব'।

স্বয়ংরূপ।

পরমেশ্বরের যে স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া তদীয় অপরাপর স্বরূপ সকল প্রকাশমান রহিয়াছেন, কিন্তু অপর কোনও স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরের যে স্বরূপটি স্বয়ংসিদ্ধ,—তাঁহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলে।

অনন্যাপেক্ষী যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে ॥

(লঘুভাগবতামৃতে। ১।১২)

অর্থাৎ যে রূপটি স্বয়ংসিদ্ধ, তাহাকেই 'স্বয়ংরূপ' কহে।

তদেকাত্মরূপ।

নিখিল অবতার ও বিলাসমূর্ত্তি সকল অবতারী বা স্বয়ংরূপ হইতে আকারাদি-ভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও সেই সকল মূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ বা তদেকাত্মই জানিতে হইবে; শাস্ত্রে তদেকাত্মরূপের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যথা—

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে। ১।১৪)

অর্থাৎ যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদিতে অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহাকেই 'তদেকাত্মরূপ' কহে।

স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ অভেদ হইলেও শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপটি অনন্যাপেক্ষী, কিন্তু তদেকাত্মরূপ স্বয়ংরূপাপেক্ষী; অর্থাৎ যাহা স্বয়ংরূপ তাহাবিলাস ও স্বাংশাখ্য তদেকাত্মরূপের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু বিলাস ও স্বাংশাখ্য তদেকাত্ম-মূর্ত্তি সকল স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়াই বিরাজিত; এইজন্য শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপটিই তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব্ব-কারণস্বরূপ অন্যান্য অবতার সকলেরও পরম কারণ।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপকে শাস্ত্র 'স্বয়ং-ভগবান্' কহেন; শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই 'স্বয়ং-ভগবান্' বলিয়া শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—(ভাঃ ১।৩।২৮) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অনন্যাপেক্ষী, কিন্তু তদীয় শ্রীনারায়ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি বিলাসমূর্ত্তি সকল এবং শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ও পুরুষাবতারাদি স্বাংশ মূর্ত্তি সকল তাঁহা হইতে অভিন্ন বা তদেকাত্ম হইলেও অনন্যাপেক্ষী নহেন,—নিখিল ভগবৎস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষী; অতএব প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী—পরমাত্মরূপে যিনি জীবাত্মার সত্তা ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, তিনি জীবের আশ্রয়স্বরূপ হইলেও, তাঁহারও কারণ—তাঁহারও অংশী যিনি, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের পরম কারণ—শ্রীকৃষ্ণই জীবের পরমাশ্রয়। পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণাংশ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন; যথা—

অন্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

(শ্রীভাগবতে। ১০।১৪।৫৫)

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের হিতার্থ স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা দেহধারী জীবের মতই প্রকাশমান হইতেছেন।

স্বয়ং শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেও ইহা জানা যায়; যথা,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(গীতা। ১০।৪২)

অর্থাৎ—অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন

কি ? আমি একাংশ দ্বারা, অর্থাৎ একাংশ—পরমাত্মা রূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

অতএব পূর্ব্বে যে পরমাত্মাকে জীবের পরমাশ্রয় বলা হইয়াছে, তদর্থে স্বাংশ-পরমাত্মার পরাবস্থা বা পরিপূর্ণতা যেখানে, সেই পূর্ণ-পরমাত্মা অর্থাৎ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই জীবের পরমাশ্রয় ও সমস্তের পরম-কারণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর ; তিনি অনাদির আদি, সুরভি সকলের পরিপালক এবং সমস্ত কারণেরও পরম কারণ-স্বরূপ।

আত্মাই প্রিয়বস্তু ; অতএব পরমাত্মা প্রিয়তর ও পরমাত্মার পরাবস্থ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম হইতেছেন। আত্মবস্তুর পরিপূর্ণতার শেষ সীমা যাহা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। সুতরাং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের স্বধর্ম্ম ও তাহাতেই জীবের পূর্ণ সার্থকতা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ"॥ (শ্রীগোপাল উ, পূর্ব্ব ৪৯) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে, তাঁহার প্রেমের আস্বাদন করিবে, তাঁহার ভজন করিবে, তাঁহার পূজা করিবে।

জীবের আশ্রয়-স্বরূপ পরমাত্মার পরমাবস্থা যাহা তাহাই সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই চিৎকণ-জীবাত্মার পরম আত্মীয় বিষয় ও পরমাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জীবও সচ্চিদানন্দময় ও নিত্যবস্তু বলিয়া উভয়েই আত্মবস্তু ; আবার শ্রীকৃষ্ণ বিভু ও জীব অণু বলিয়া উভয়ে আশ্রয় ও আশ্রিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত জীবের শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয়।

চিৎকণ-জীব স্বরূপতঃ নিত্য-কৃষ্ণদাস।

আশ্রয়তত্ত্ব সেব্য ও আশ্রিততত্ত্ব সেবক ভাবাপন্ন ; তাই নিত্যসেব্য শ্রীকৃষ্ণের, জীব নিত্য সেবক—নিত্যদাস। চিৎকণ-জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। চৈতন্যাদিধর্ম্মে

অভেদ হইয়াও যুগপৎ বিভু ও অণু, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক ইত্যাদি প্রকারে উভয়ে ভিন্ন। তাই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (শ্রীচৈঃ ২।২০।১০)

জীব স্বরূপতঃ নিত্য-কৃষ্ণদাস হইয়াও যে নিত্য-মায়াদাস সাজিয়া রহিয়াছে—জীবকে নিত্য-কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পরিবর্ত্তে যে নিত্য বিষয়-কামনানলে সন্তপ্ত হইতে হইতেছে—সেই 'মূলে ভুল'ই তাহার একমাত্র কারণ। অনাদি বহির্মুখ ও অবিদ্যায় আত্মবিস্মৃত জীব, স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও জড়দেহ-পিণ্ডে আত্মভাব আরোপ করায়, তাহার জীবনাঙ্কের আগাগোড়া সমস্তই ভ্রমময় হইয়া যাইতেছে।

জীবের তটস্থভাব।

তটস্থ-জীবের আত্মভাব দ্বিবিধ ; চিদাত্মভাব ও জড়াত্মভাব। প্রথমটির গতি ঊর্দ্ধপ্রবাহিণী ও দ্বিতীয়টির গতি অধঃপ্রবাহিণী ; অন্তর্মুখতা ও বহির্মুখতা যাহাদের অপর নাম। এই দ্বিবিধ গতির কোনও একটিকে প্রাপ্ত না হইয়া, কোনও জীব অবস্থান করিতে পারে না। জীবের আত্মভাব অর্থাৎ 'আমি' বোধ চিদাত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার স্বরূপ ও দেহেন্দ্রিয়াদি জড়ীয় পদার্থে আরোপিত হওয়াই তাহার বিরূপভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়বিধ গতিপথে ধাবিত হইবার সামর্থ আছে বলিয়া জীবকে 'তটস্থাশক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। অন্য প্রকারেও জীবের এই তটস্থতা দ্বিবিধ।

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব দ্বিবিধ প্রকার।

অনাদিকাল হইতে অনন্ত জীবাখ্য তটস্থাশক্তি স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য ও তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ পরিকরগণের আনুগত্যে তৎসদৃশ সেবানন্দে পূর্ণ রহিয়াছেন। ইঁহারাই নিত্যমুক্ত জীব। অপরপক্ষ—অনাদি বহির্মুখ অনন্ত জীব,

মায়া বা জড়শক্তির সহিত তাদাত্ম্য (অর্থাৎ দেহাত্মবোধ) ও তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, মায়ারই আনুগত্যে মায়িক ও জড়ধর্ম্মরূপ নিত্য সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই সকল নিত্যবদ্ধ জীবই কোনও দিন সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলে, তখন শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন দ্বারা নিত্যমুক্ত জীবের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। উক্ত উভয় প্রকার জীবের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ, কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥" (২।২২।৮—১৩)

চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় ভাবাপন্ন। পূর্ণ-স্বজাতীয় ভাবকে প্রাপ্ত হওয়াই অপূর্ণ-স্বজাতীয় পদার্থমাত্রের স্বাভাবিক প্রয়াস। তাই ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিত হইতে চায়, ক্ষুদ্র বায়ু মহাবায়ুর দিকে ছুটিয়া যায়, অগ্নিকণা মহা-অনলের অন্তরে আপনাকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়, জলবিন্দু মহাজলের অন্বেষণে ধাবিত হয় ও পার্থিব যাহা, পৃথিবীর অসীম ক্রোড়ে স্থান পাইতে চায়। স্বজাতীয় জড়রাশির সহিত সম্মিলিত হইবার প্রয়াস যেমন জড়-কণার স্বাভাবিক

ধর্ম্ম, বিভু-চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস তেমনি চিৎকণ জীবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব যে তৎস্বজাতীয় বিভু-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে বিজাতীয়জড়-বিষয়-সঙ্গ অভিলাষ করে,—এই অস্বাভাবিকতাকে জড়ীয় দেহাত্মবোধরূপ বিরূপতাপ্রাপ্ত জীবের বিধর্ম্ম বলিয়াই জানা আবশ্যক। চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই বিভু-চৈতন্যের পূর্ণতম-স্বরূপ; অতএব পূর্ণতম-স্বরূপ-ভাবপ্রাপ্ত জীবমাত্রকেই কৃষ্ণাশ্রিত বলিয়াই জানিতে হইবে শ্রীগোবিন্দপদাব্জ-মকরন্দের মধুপ যাঁহারা, কেবল সেই সকল জীবের জীবত্ব পূর্ণতম সার্থকতা বা পরম লভ্যকে বরণ করিতে সমর্থ হয়।

একই বৈদূর্য্যমণি হইতে বিকীর্ণ নীল, পীত ও লোহিতাদি বর্ণ-বিন্যাসের ন্যায়, এক সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানের আশ্রিতা ও তদীয় স্বরূপভূতা স্বাভাবিকী বিবিধ শক্তির মধ্যে, ('য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্—' শ্বেতাশ্ব° ৪।১) প্রধানতঃ ত্রিবিধা শক্তিই ('বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা—' বিষ্ণুপু° ৬।৭।৬১।) যথাক্রমে (১) অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থা বা জীবশক্তি এবং (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে একমাত্র জীবশক্তিই তটস্থা অর্থাৎ উভয় ভাবাপন্ন বলিয়া, জীবশক্তিকেই হয় বহিরঙ্গা—মায়াশক্তির সহিত, না-হয় অন্তরঙ্গা—স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করিতে হয়। এইজন্য অনাদিকাল হইতে নিত্য অন্তর্মুখ অনন্ত জীব, স্বরূপশক্তির সহিত ও বহির্মুখ অনন্ত জীব মায়া বা জড়শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে,—এ-কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই উভয় ভাবের যে কোন এক পক্ষকে অবলম্বন না করিয়া, জীবশক্তি কেবল নিজভাবে অবস্থিত হইতে অসমর্থ বলিয়াই জীবকে 'তটস্থাশক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। তদ্ব্যতীত স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তি—এই শক্তিদ্বয় নিত্যই নিজভাবে

জীবশক্তিই কেবল উভয় ভাবাপন্না বলিয়া ইহার নাম তটস্থাশক্তি।

অবস্থিতি ভিন্ন অপর কোন শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না,—জীবশক্তির সহিত অপর শক্তিদ্বয়ের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। লৌহ যেমন অগ্নিসংযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া অগ্নির ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেও, নিজ লৌহত্ব পরিত্যাগ করিয়া অনলে পরিণত হইয়া যায় না, সেইরূপ জীবাখ্য তটস্থাশক্তিও মায়া বা জড়শক্তির কিম্বা স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেও, তৎসহ কোনপ্রকারেই একাত্ম্য অর্থাৎ একীভূত বা তৎশক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায় না। কারণ শক্তিত্রয়ের বৈশিষ্ট্য—ইহাও নিত্য। অতএব চিদ্ধর্ম্মে স্বরূপশক্তির সহিত জীবশক্তির কথঞ্চিৎ সমতা থাকিলেও সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী নামক বৃত্তিত্রয়,—স্বরূপশক্তিরই স্বধর্ম্ম; উহা জীবাখ্য তটস্থাশক্তির কিম্বা জড়শক্তির ধর্ম্ম নহে।

অপর শক্তিদ্বয়ের সহিত জীবশক্তি তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেও একাত্মা বা একীভূত হইয়া যায় না।

শ্রীভগবৎ বশীকারের একমাত্র হেতুভূতা শুদ্ধা বা নির্গুণা ভগবদ্ভক্তির অপর নাম 'ভাগবতী-বৃত্তি'। 'ভক্তি' বা 'ভাগবতী-বৃত্তি'—ইহা হইতেছে সর্ব্বোত্তমা স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্বিদ্ ও হ্লাদিনীশক্তির সমবেত সাররূপা; ('হ্লাদিনী-সারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি।'—সিদ্ধান্তরত্ন, ১।৮), সুতরাং ইহা মধ্যমা তটস্থা বা জীব-শক্তির নিজ বৃত্তি নহে; কিম্বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপা কনিষ্ঠা বা অপকৃষ্টা জড়শক্তিরও বৃত্তি নহে; মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় ভক্তি-তরঙ্গিণী স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ ও তদন্তর্গত নিত্য ভগবৎ-পরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, শুদ্ধভক্তপরম্পরারূপ প্রণালীর ভিতর দিয়া মায়িক প্রপঞ্চের মধ্যেও প্রবাহিতা হইতেছেন।

হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির সাররূপা 'ভক্তি' বা ভাগবতীবৃত্তি'— স্বরূপশক্তির ধর্ম্ম; জীব বা জড়শক্তির ধর্ম্ম নহে। গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় স্বরূপ-বৈভব হইতে ভক্ত-পরম্পরা ক্রমে মায়া বৈভবেও প্রবাহিতা।

সেই অহৈতুক মহৎসঙ্গরূপ প্রণালীর সহিত প্রকৃষ্ট সংযোগ হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকেন। মহৎসঙ্গ ও তদুত্থিত শ্রীহরিকথা—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ হইতেই জীবহৃদয়ে স্বপ্রকাশ শুদ্ধাভক্তি সমুদিত হয়েন। তদ্ভিন্ন ইহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। যথা,—

মহৎসঙ্গ ও তদুত্থিত হরিকথা—এই উভয় কারণ সংযোগে জীবে শুদ্ধাভক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (শ্রীভা° ৩।২৫।২৪)

অর্থাৎ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন,) সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গদ্বারা হৃদয়-কর্ণের তৃপ্তিদায়ক আমার বীর্যপ্রকাশক কথা, (অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কথা) আবির্ভূতা হয়েন। সাধুসঙ্গের সহিত সেই কথার আস্বাদন হইতে অপবর্গ-বর্ত্ম স্বরূপ আমাতে শীঘ্র শ্রদ্ধা (অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা সাধন-ভক্তি) রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) যথাক্রমে উদিত হইয়া থাকেন।

সেই শ্রীভাগবতে অন্যত্রও এই কথাই স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; যথা;—

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥
(শ্রীভা° ১১।১১।৪৬)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, প্রায়শঃ সৎসঙ্গ ও তল্লভ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি-যোগ—(এই উভয় কারণের সংযোগ) ভিন্ন প্রেমভক্তি লাভের উপায় নাই। যে-হেতু সাধুদিগের আমিই হইতেছি প্রধান আশ্রয়। শ্রীভাগবতের অন্যত্রও এই কথাই বলা হইয়াছে,—'সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা—'(১১।১১।২৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

'সাধু কৃপা, নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।' (শ্রীচৈ°৩।৩।২৫৩)

যুগপৎ উক্ত উভয় কারণের সংযোগ হইতেই জীবে শুদ্ধাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে—'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল'।

অতএব স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা 'ভক্তি' তটস্থ জীবশক্তির নিজ বৃত্তি না হইলেও, 'কৃষ্ণদাস্য' বা ভগবদ্দাসভাব—ইহা জীবের স্বরূপগত নিত্যধর্ম্মরূপে জীবে নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছে; যে-হেতু সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবান্ ও তদীয় শক্তিসকলের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিত সুতরাং সেব্য ও সেবক বা প্রভু ও দাস সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া, উহা নিত্যই অবস্থিত জানিতে হইবে। তটস্থ জীবের জড়তা-দাত্ম্যাবস্থায় এই স্বরূপগত 'কৃষ্ণদাস্য' ধর্ম্মটি অদৃশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইজন্য জীব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইয়াও, অনাদিবহির্ম্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের স্বতঃ কৃষ্ণস্মৃতি (অর্থাৎ কৃষ্ণদাসবোধরূপ কৃষ্ণোন্মুখতা) সম্ভব হয় না। মহৎসঙ্গ ও কৃপার স্পর্শমাত্র,—"সোনার কাটি স্পর্শে পাতাল পুরীর অচেতন রাজকুমারীর জাগরণের ন্যায়"—সেই কৃষ্ণস্মৃতি—কৃষ্ণদাস্যবোধ জাগিয়া উঠে। জীব তখন 'কৃষ্ণদাস'—ভগবৎসেবকরূপ স্বরূপভাবে জাগ্রৎ হইয়া, 'আমি প্রভু' 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা'—ইত্যাদি প্রকার মোহনিদ্রার প্রলাপোক্তির পরিবর্ত্তে, 'আমি কৃষ্ণদাস' 'কৃষ্ণই প্রভু ও সেব্য, আমি তাঁহার দাস বা সেবক'—এইরূপ প্রকৃষ্ট ও শুদ্ধ সম্বন্ধ বোধের উদয় হয়। ইহারই নাম জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা মহৎ সঙ্গাদি স্পর্শে কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশমাত্র, তৎসহ যুগপৎ ভক্তি-সেবোন্মুখতাও প্রকাশ পাইলে, স্বপ্রকাশ ভক্তি তৎসেবোন্মুখ জিহ্বাদি

কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপগত নিত্যধর্ম্ম। বহির্ম্মুখ জীবে দারুনিহিত অগ্নির ন্যায় উহা অপ্রকাশ থাকে। মহৎ সঙ্গের সংযোগেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়েও স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন ; নচেৎ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সামর্থ্যে গ্রাহ্য বিষয় নহেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভক্তিরসামৃত সিঁ ১।২।২৩৪)

যে ভক্তির সাধন বা অনুশীলন দ্বারা জড়তাদাত্ম্য পরিহারপূর্ব্বক তটস্থ জীব ক্রমশঃ সর্ব্বোত্তমা স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া, পরম লাভবান্ হয়েন ও জীবত্বের পূর্ণতম সার্থকতাকে বরণ করিয়া থাকেন। দারুমাত্রেই অগ্নি নিহিত থাকিলেও, কোনও প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সংযোগ ভিন্ন উহা যেমন চিরদিন অপ্রকাশ বা অদৃশ্যই থাকে, সেইরূপ 'কৃষ্ণদাস্য' জীবমাত্রের স্বরূপগত ভাব হইলেও, উহা অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্যভাবেই জীবস্বরূপে নিহিত রহিয়াছে। প্রজ্জ্বলিত ভক্তি-অনল-স্বরূপ ভক্ত-সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপার সংযোগ হইতেই বদ্ধজীবে উহার বিকাশ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং জীবের সেই স্বরূপগত—বিস্মৃত-কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণোন্মুখতা বিকাশের প্রথম কারণই হইতেছে—একমাত্র প্রকৃষ্ট মহৎসঙ্গ ও সেবাদি। তাই শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন,'—মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া' (ভা ১১।১১।৪৫) অর্থাৎ সাধুগণের সঙ্গ বা প্রকৃষ্ট সেবা হইতেই মদ্বিষয়ক লুপ্তস্মৃতির পুনর্বিকাশ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। 'ভক্তি' হইতেছেন—সর্ব্বোত্তমা অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ সুতরাং মধ্যমা জীবশক্তির স্বরূপগত ধর্ম নহে ; কিম্বা কনিষ্ঠা বা অপকৃষ্টা জড়শক্তিরও ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধাভক্তি সুরধুনী প্রবাহের ন্যায় স্বরূপ বৈভবস্থিত স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ শ্রীভগবানের নিত্য-পরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক শুদ্ধভক্ত পরম্পরারূপ প্রণালীর ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চে প্রবাহিতা হইতেছেন। সেই যাদৃচ্ছিক মহৎ সঙ্গ হইতেই

প্রথমতঃ জীবের স্বরূপভূত লুপ্ত কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষমাত্র, তৎসহ ভক্তিসেবোন্মুখতারও বিকাশ হয়; যাহার ফলে 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি প্রকার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ অনাদি অবিদ্যার যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া, তৎস্থলে 'আমি কৃষ্ণদাস' 'কৃষ্ণই সেব্য ও প্রভু,—আমি তাঁহার সেবক'—এই যথার্থস্বরূপ ও সম্বন্ধ বোধের উদয় হইলেই, জীব তখন শুদ্ধজীবে পরিণত হয়েন। তদবস্থায় মহৎসঙ্গোত্থিত শ্রীহরিকথারূপা স্বপ্রকাশ শুদ্ধাভক্তি, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনাকারে সেই কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে কৃষ্ণোন্মুখতাপ্রাপ্ত শুদ্ধজীবে সঞ্চারিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাধন ভক্তিই 'শুদ্ধাভক্তি' নামে কীর্ত্তিত হইয়া, শ্রদ্ধাদিক্রমে জীবের অন্তরে প্রেমভক্তিরূপে উদিত হইয়া থাকেন।

মহৎসঙ্গরূপ কারণ হইতে জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশ এবং মহৎসঙ্গোত্থিত হরিকথারূপ কারণ হইতে সেই শুদ্ধজীব হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগে, এইরূপে তটস্থা জীবশক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তমা স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা শুদ্ধাভক্তি লাভ করা সম্ভব হয়।

অতএব কৃষ্ণোন্মুখতাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম এবং ভক্তি—সঞ্চারিত ধর্ম বলিয়া, তাই জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে, 'নিত্য কৃষ্ণভক্ত' না বলিয়া জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণোন্মুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল কৃষ্ণভক্তত্ব, বা কৃষ্ণভক্তিলাভ। কৃষ্ণোন্মুখ জীবের অন্তরে কেবল কৃষ্ণ সেবা অর্থাৎ কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ভিন্ন আত্মসুখ বাঞ্ছারূপ অপর কোনও কামনা-বাসনাদি থাকে না বলিয়াই—

কৃষ্ণদাস্যরূপ কৃষ্ণোন্মুখতাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং ভক্তি, সঞ্চারিত ধর্ম্ম কৃষ্ণোন্মুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল কৃষ্ণভক্তি লাভ।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলে অশান্ত ॥ (শ্রীচৈ° ২।১৯।১৩২)

সেই ভক্তির অপর একটি ধারা, গঙ্গাধারার ন্যায় সাধু পরম্পরারূপ প্রণালীর মাধ্যমে না আসিয়া, কল্পতরুর ন্যায় মুক্তভাবেই বিশ্বপ্রপঞ্চে বিরাজমানা রহিয়াছেন—বাসনা-মলিন অশুদ্ধ জীবের নানা বাসনা পূরণের সহায়তার জন্য। ভক্তির সহায়তা বা সংযোগ ব্যতীত সকাম জীবের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধির কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না বলিয়া ('ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল'। শ্রীচৈ' ২।২৪) সেই সকল সাধনার অঙ্গরূপে ভক্তির সম্বন্ধ বা সংযোগের আবশ্যক হয়। এইজন্য অতি সহজলভ্য হইয়া, সেই সকল সাধকের ইচ্ছামাত্রই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনাদিরূপা স্বপ্রকাশ ভক্তি, তাঁহাদিগেরও বাগাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকেন। মহৎসঙ্গের অব্যর্থ ফলেই জীবহৃদয়ে বিস্মৃত কৃষ্ণস্মৃতির বিকাশ হয়। কেবল কৃষ্ণোন্মুখ জীবেই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য ভিন্ন স্বসুখ-তাৎপর্য্যের লেশাভাসমাত্রও থাকে না। তদ্ভিন্ন মহৎসঙ্গ-বিরহিত জীবমাত্রেই কৃষ্ণোন্মুখতার অভাবে, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্ত সেই সকল জীব কৃষ্ণসেবাভিলাষ না করিয়া, স্বসুখতাৎপর্য্যময় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকেই পুরুষার্থবোধে, তৎফল—ভুক্তি ও মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া, উহারই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সেই সকল সাধনার অঙ্গরূপে ভক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তি স্বতঃই বিশুদ্ধা হইলেও আধারের অশুদ্ধতাবশতঃ সাধুসঙ্গ-বিহীন ক্ষেত্রে আবির্ভূতা উক্ত প্রকার ভক্তিই 'সগুণাভক্তি' নামে কথিতা হয়েন। এইরূপ স্থলেই নিজ মুখ্য ফল প্রেমভক্তির উদয় না করাইয়া, কল্পতরুর ন্যায় এই সগুণাভক্তি, জীবের বাঞ্ছানুরূপ ভুক্তি, মুক্তি, ও সিদ্ধি প্রভৃতি নিজ গৌণফল মাত্রই প্রদান করিয়া থাকেন।

কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানী সকাম জীবের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধির সাধনা সকলের সফলতা প্রদানের নিমিত্ত কল্পতরুর ন্যায় সগুণাভক্তির প্রপঞ্চে অবস্থিতি।

অতএব মহৎসঙ্গ এবং তদুত্থিত শ্রীহরিনামাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির সঞ্চার—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ ভিন্ন 'শুদ্ধাভক্তি' লাভ করা সম্ভব হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন কুম্ভকার ও মৃত্তিকা—এই উভয়বিধ কারণের যুগপৎ সংযোগেই ঘটাদি কার্য্যের প্রকাশ হয়, সেইরূপ শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাবেরও, সাধুসঙ্গ ও তদুত্থিত হরিকথাদির যুগপৎ, সংযোগকেই কারণ জানিতে হইবে; আবার কুম্ভকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি কোন কার্য্যই হয় না; কিন্তু ভক্তি, মহৎসঙ্গাদি কারণ ভিন্নও অশুদ্ধ জীবে তাহার ইচ্ছামাত্রই স্বয়ং স্ফূরিত হইয়া সগুণারূপেও সেই ভক্তি, নিজ গৌণ ফলেই নিখিল পাপাদি হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিয়া, জীবের বাঞ্ছানুরূপ ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাবধি চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন,—ভক্তি এতাদৃশী অচিন্ত্য প্রভাবময়ী।

এখন ইহাই বিবেচ্য হইতেছে যে,—জীব যাহা পাইবার যোগ্য তাহাকে 'প্রাপ্য' বলা হয়। প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে লাভ বা ক্ষতি কিছুই নাই। প্রাপ্য হইতেও অধিক প্রাপ্তির নাম 'লাভ'। প্রাপ্য অপেক্ষা অল্প প্রাপ্তি হইতেছে—'ক্ষতি' বা 'হানি'।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মধ্যম স্থানীয়া তটস্থা জীবশক্তির পক্ষে ভুক্তি কামনায়, কনিষ্ঠা বা নিকৃষ্টা জড়শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি, বিনাশ ও দুঃখাদি জড়ের ধর্ম্ম বা সংসারগতিতে ভ্রাম্যমাণ হওয়া—ইহাকে 'ক্ষতি' বা হানিই বলিতে হইবে। চিৎকণ ও নিত্যবস্তু—জীবের পক্ষে এই গতির অবস্থায় পতিত হওয়াকে 'দুর্গতি' বলিবার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

জড়-তাদাত্ম্য হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া, যাহা হইতে জীবশক্তির উদ্ভব, ('যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—' তৈত্তি'।৩।১। জন্মাদস্য যতঃ।' ব্রহ্মসূ"।১।১।২)—সেই ব্রহ্ম-স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতির

নাম মুক্তি'। জীব যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত তাঁহাতেই প্রত্যাগমন—ইহা জীবের প্রাপ্য বিষয়; প্রাপ্য বিষয়ের প্রাপ্তিতে ক্ষতি বা লাভ কিছুই মনে করা যায় না। সুতরাং মুক্তিতে দুঃখও নাই, সুখও নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বোত্তমা স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির সঞ্চারই হইতেছে মধ্যমা জীবশক্তির পক্ষে প্রাপ্য বিষয় হইতেও অধিক প্রাপ্তি; সুতরাং ভক্তিই জীবের যথার্থ লভ্য বস্তু। প্রাপ্য হইতে অধিক প্রাপ্ত না হইলে কেহ সুখী হইতে পারে না। কেবল ভক্তিলাভেই স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীবের জীবত্ব পরিপূর্ণ সার্থকতাকে বরণ করিতে পারিয়া স্বরূপশক্তির মতই জীব পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। অতএব ভক্তি লাভকেই জীবের যথার্থ লাভ জানিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন —'লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।' (ভা°।১১।১৯।৪০)। অর্থাৎ আমার ভক্তিই জীবের পক্ষে উত্তম লাভ। ভগবদ্বিষয়া 'ভক্তি' উত্তম লাভ হইলে, স্বয়ংভগবৎ বা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া ভক্তি যে সর্ব্বোত্তম লাভ বা 'পরম লাভ' এ কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক এই কলিযুগে প্রবর্ত্তিত শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনেরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানের পক্ষে পরমোপযোগিতার কথা বর্ণন করিতে গিয়া, সেই স্বয়ংভগবৎ প্রদত্ত স্বয়ং ভগবদ্বিষয়া ভক্তিকেই জীবের 'পরমলাভ' বলিয়াই শ্রীভাগবতে উক্ত হইতে দেখা যায়; যথা,—

ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তির মধ্যে একমাত্র ভক্তিই জীবের পক্ষে যথার্থ লভ্যবস্তু।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

(শ্রীভা° ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান দেহী বা জীব সকলের পক্ষে ইহা হইতে

'পরমলাভ' আর কিছুই নাই,—যে সঙ্কীর্ত্তন হইতে পরমশান্তি লাভ ও সংসার গতিরোধ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বুঝিলাম, জীবের স্বরূপগত বিস্মৃত কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণদাস্যরূপ কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশ জন্য মহৎ-সঙ্গেরই একান্ত আবশ্যক। যে কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশ ভিন্ন স্বপ্রকাশ ভক্তি স্বকৃপায় জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলেও, উহা শুদ্ধাভক্তিরূপে উদয় না হইয়া সগুণারূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব দুর্লভ অগম্য ও অমোঘ মহৎসঙ্গ ('মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ' নারদভক্তি সূ।৫।৩৯) যাদৃচ্ছিক বা অহৈতুক হইলেও, তল্লাভের নিমিত্ত শ্রেয়োকামী জীবমাত্রেরই চেষ্টাশীল হওয়া আবশ্যক,—এ-কথা সেই সাধুগণেরই নির্দ্দেশ ;—শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—'অতো মনীষিণা যত্নঃ কার্য্যো মহদনুগ্রহে'। (ভা° ৭।১।১ টীকার প্রারম্ভ শ্লোকে।) অর্থাৎ এই হেতু বুদ্ধিমানগণ মহদনুগ্রহলাভে যত্নবান্ হইবেন। শ্রীভাগবতীয় 'নৈষাং মতি—, ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। (ভা° ৭।৫।৩২)।

জীবে বিলীন কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশ জন্য মহৎ সঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারও লিখিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (শ্রীচৈ° ২।২২।৩৩)

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—'মহদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেমেত্যাদি।,—(টীকা। ভা ৭।৭।১৭)।

অর্থাৎ মহতের সঙ্গ ও কৃপা হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেম ইত্যাদি ক্রমে বিকাশ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে,—স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা স্বপ্রকাশ ভক্তি, মহৎসঙ্গ ও কৃপা সহযোগে কৃষ্ণোন্মুখতাপ্রাপ্ত শুদ্ধজীবে সঞ্চারিত ধর্ম্ম হইলেও, শুদ্ধাভক্তির সহিত সেই শুদ্ধজীব

তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং ভক্তি ও জীব—উভয়েই নিত্যবস্তু হওয়ায়, ভক্তি হইতে সেই জীব কখনও বিযুক্ত হয়েন না। এইহেতু তৎকাল হইতে ভক্তত্বই সেই জীবের স্বরূপ এবং ভক্তিই স্বধর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কোনও অতিভাগ্য সাপেক্ষ এই অভিব্যক্তিকে জীবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি বা পরম সার্থকতা জানিতে হইবে। জড় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—অনাদি বহির্ম্মুখ—সংসারদশাগ্রস্ত তটস্থ জীবের পক্ষে, সর্ব্বোত্তমা স্বরূপশক্তির তাদাত্ম্য ও তৎসম অধিকার প্রাপ্তি—ইহা হইতে জীবত্বের পূর্ণ সার্থকতা বা 'পরম লাভ' আর কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। অতঃপর যে যে স্থলে ভক্তত্বকেই জীবের স্বরূপ কিংবা ভক্তিকেই জীবের স্বধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইবে, উহাকে কৃষ্ণোন্মুখতাপ্রাপ্ত ও শুদ্ধাভক্তি-সঞ্চারিত শুদ্ধজীব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ভক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হওয়ায়, তৎকাল হইতে সেই শুদ্ধ জীবের ভক্তত্বই স্বরূপ এবং ভক্তিই স্বধর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই জীবত্বের পরমলাভ ও পূর্ণসার্থকতা।

আত্ম সম্পর্কীয় বিষয় যাহা, তাহাকেই 'আত্মীয়' কহে। 'আত্ম' বলিতে অহন্তা বা 'আমি' এবং 'আত্মীয়' অর্থে মমতা বা 'আমার' বোধ। আত্মীয় ব্যতীত আত্মার একাকী অবস্থিতি অসহনীয়। চিন্ময় বিষয় যাহা, তাহাই জীবের স্বরূপতঃ আত্মীয়। আত্মীয়বোধে চিন্ময়-বিষয়ের নিত্য সেবনই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, বদ্ধ-জীবমাত্রকেই যে বিজাতীয় জড় বিষয় সেবনে উন্মুখ দেখা যায়, তাহার কারণ, অনাদি অবিদ্যার কূহক-মন্ত্রে স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের আত্মভাব জড়ীয় দেহাদিতে আবদ্ধ হওয়ায়, তৎস্বজাতীয় গেহাদি বিষয়ে আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে। জড়াত্মবোধরূপ ভ্রান্তির জড়াত্মীয়তাই অবশ্যম্ভাবী ও বিষময় ফল। ক্ষুদ্র জড়ের সম্পূরণবৃত্তি রাশি-জড়সঙ্গের দিকে ধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক;

চিদাত্মাবোধের স্থলে জড়াত্মবোধের বিষময় ফল—জড়াত্মীয়তা বা জড়ীয় বিষয়-সঙ্গ ও সেবনেচ্ছা।

তাই অনাত্ম দেহে অবিদ্যাবশতঃ 'আমি' জ্ঞান বা জড়াত্মবোধ হইলেই, জড়রাশিতে আত্মীয়বোধ জন্মিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদির পূরণ বা প্রীতির নিমিত্ত তৎস্বজাতীয় রাশি রাশি জড়ীয় বিষয়-সম্ভোগের বাসনা হইয়া থাকে। এই প্রকার অবিদ্যাকৃত জড়াত্মবোধের ফলেই 'নিত্য-কৃষ্ণদাস' জীবকে, 'মায়া-দাস' সাজিয়া থাকিতে হইয়াছে; দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আত্ম' জ্ঞানের ফলে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার পরিবর্ত্তে, অবিদ্যা-কলুষিতজীব-হৃদয়ে জড়াত্মতা বা দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নিরন্তর প্রকাশ হইতেছে। নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের প্রেম-ভাবের পরিবর্ত্তে এই যে কামভাব,—অন্তর্মুখতার পরিবর্ত্তে এই যে বহির্মুখতা,—ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী-গতির পরিবর্ত্তে এই যে অধোগতি,—অবিদ্যা কর্ত্তৃক সৃষ্ট দেহাত্মবোধই ইহার প্রধান কারণ।

মায়াধীন তটস্থ-জীব চিদ্-জড়াত্মক।

দেহাত্মবোধে সংবদ্ধ তটস্থ জীব, চিৎ-জড়াত্মক। চিৎকণের চেতনা-বৃত্তি ও দেহাদির জড়বৃত্তি,—বদ্ধজীব এই উভয় ধর্ম্মের সম্মিলিত ভাব। অনল শিখা রক্তবর্ণের স্ফটিক-আবরণী দ্বারা আবৃত হইলে তাহা হইতে লোহিত আলোকের স্ফুরণ হইয়া থাকে; 'রক্তিমা' স্ফটিকের ধর্ম্ম ও 'আলোক' অগ্নির ধর্ম্ম; উভয় ধর্ম্মীর সংযোগ বশতঃ যেমন 'লোহিত' ও 'আলোক' এই পৃথক ধর্ম্মদ্বয়ের মিলনে 'লোহিতালোক' রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি চিৎকণ জীব ও জড়দেহেন্দ্রিয়াদির সহযোগ বশতঃ দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম তৎস্বজাতীয় 'জড়-বিষয়' ও চিৎকণ জীবের চেতনাবৃত্তিজাত 'বাসনা এই দুইটি পৃথক-ধর্ম্মের সম্মিলনে, জীবের 'বিষয়বাসনা' জন্মিয়া থাকে।

অল্পতা ও বিজাতীয়তাই বিষয়-সুখভোগের অপূর্ণতার কারণ।

অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন দেহাদির সম্পূরণ ও প্রীতির বাসনায়, মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেই অহর্নিশ চেষ্টাশীল হইলেও, সে বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই; তাহার দুইটি প্রধান হেতু এই যে, জড় বা অনাত্মবস্তুর (১) অল্পতা ও (২) বিজাতীয়তা।

এই অনাত্মবস্তুই হইতেছে—আত্মার বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় জড়বস্তু ; তাই জড় বিষয়ের ভোগে বা জড়বস্তুর সেবন দ্বারা আত্মার অপূর্ণতা এবং চিন্ময় আত্মার স্বজাতীয় চিদ্‌বস্তুর সেবন দ্বারা আত্মার পূর্ণতা বা প্রসন্নতা সাধিত হইয়া থাকে। যাহা 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' নামে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ; যথা;—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥
(কাঠকে ।১।২।২)

অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানীব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বিচার দ্বারা ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া অবগত হয়েন। জ্ঞানিগণ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই বরণ করেন ; আর মন্দমতিগণ যোগক্ষেম (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বিষয়সুখ-সম্পদের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়-সুখের রক্ষণাবেক্ষণ) কামনায় প্রেয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অনাত্ম বা জড়বস্তুর পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ উহা অপূর্ণ ও ক্ষণভঙ্গুর ; ইহা চিদ্‌বস্তুর ন্যায় পূর্ণ ও নিত্য নহে। অল্পতাই অপূর্ণতার বা পরিচ্ছিন্নতার নামান্তর। জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়, তৎস্বজাতীয় রাশি রাশি বিষয়সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও তাহার সম্পূরণ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না, যে-হেতু অপূর্ণ ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের দ্বারা তৎস্বজাতীয় অপর বস্তুর অনিত্যতা ও অপূর্ণতা পূর্ণ করা একান্তই অসম্ভব। জড়সঙ্গে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পূরণ সাধিত হইতে না হইতেই পরক্ষণে আবার সেই অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা জাগিয়া উঠে ; সুতরাং এইরূপ ভ্রমময় প্রয়াসের দ্বারা জীবনের পর অনন্ত জীবন

অতিবাহিত করিলেও জীবের পক্ষে যে, পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চিদানন্দ ব্যতীত—'ভূমা' ব্যতীত 'অল্প' ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখে জীবের অনন্ত সুখ-পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা না থাকায়, শ্রুতিও জীবকে 'ভূমা' ও 'অল্প' এই উভয়বিধ আনন্দের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অল্পতে অনাসক্ত হইয়া, 'ভূমার' সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন ; যথা,—

'ভূমা' ও অল্পের' পার্থক্য।

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্॥ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।) যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥' (ছান্দোগ্য উ ৭।২৩।২৪)।

অর্থাৎ যাহা 'ভূমা' তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, 'ভূমা'ই সুখ। ('ভূমা' কি ? তাহাই বলিতেছেন,) যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, তাহাই 'ভূমা' ; আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে তাহাই 'অল্প'। যাহা 'ভূমা' তাহাই অমৃত। আর 'অল্প' যাহা —তাহাই ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখ,—সংসার-মরীচিকা।

জড় দেহাদিতে মোহবশতঃ জীবাত্মার যতই কেন আত্মবুদ্ধি হউক না,—তৈল ও জল একত্র রাখিলেও তাহা যেমন নিত্যই পৃথক থাকিয়া যায়, তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ—চিদ্ ও জড়, একত্র অবস্থান করিলেও কখন একীভূত হইয়া যাইবার নহে। রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ সর্পজ্ঞান জন্মিয়া তাহা হইতে ভয় উদ্বেগাদি উৎপন্ন হইলেও যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তেমনি চিদাত্মায় জড়াত্মারূপ

জড়াত্মের আরোপেও জীব স্বরূপতঃ নিত্যই চিন্ময় বস্তু।

অধ্যাস বশতঃ দুঃখাদি জড়ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হইলেও, আত্মবস্তু নিত্য চিন্ময়ই থাকেন ; ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি,—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ (গীতা। ১৩।৩২)

অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও যেমন সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অপর কোনও বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে উপলিপ্ত হয়েন না।

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দময় জীব, জড়দেহাদি হইতে নিত্যই মুক্ত ও পৃথক। ধূলি ও ধূমসংলিপ্ত বোধ হইলেও আকাশ যেমন্ স্বরূপতঃ নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত থাকে, সেইরূপ মোহবশতঃ নিজ বিরুদ্ধ ভাব বা বিজাতীয় জড়ে আত্মবোধ করিলেও, জীব স্বরূপতঃ নিত্যই শুদ্ধ ও মুক্ত। পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত থাকিলেও বিমুগ্ধ বিহঙ্গ যেমন উহাতে সংবদ্ধ মনে করিয়া নিজেই বদ্ধের ন্যায় তন্মধ্যে বসিয়া থাকে, তেমনি নিত্যমুক্ত হইয়াও মোহাচ্ছন্ন জীব দেহাত্মবোধে দেহপিঞ্জরে নিজেই সংবদ্ধ রহিয়াছে ; অতএব ভ্রান্তি বশতঃ নিজেকে জড় বলিয়া মনে করিলেও, জীবকে চিৎকণ—চিদ্বস্তুই জানিতে হইবে।

সচ্চিদানন্দ-জীব কেবল তৎস্বজাতীয় সচ্চিদানন্দ বিষয়ের সেবনেই পূর্ণকাম হইতে পারে! বিজাতীয় জড়দেহকে 'আমি' বলিয়া মনে করিলেও, অসত্য কখন সত্য হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ দ্বারাই স্বর্ণ-কুণ্ডলের এবং মৃত্তিকা দ্বারা মৃৎকুম্ভের পূরণ সম্ভব হয়, কিন্তু সুবর্ণে মৃৎ-কুম্ভের ও মৃত্তিকায় স্বর্ণকুণ্ডলের সম্পূরণ সাধিত হয় না, তেমনি চৈতন্যের দ্বারাই চিদ্বস্তুর ও জড়ের দ্বারাই জড়বস্তুর পূরণ হইতে পারে ; কিন্তু জড়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর ও চৈতন্যের দ্বারা জড়বস্তুর সম্পূরণ কখনও সম্ভব নহে। সেইজন্য আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে, জড়ীয়দেহ ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর জড়ীয় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ-বিষয়

তৎস্বজাতীয় চিদ্বস্তু ভিন্ন চিৎকণ জীবের সুখাভাবের পূরণ অসম্ভব।

স্তূপের পর স্তূপ আহরণপূর্ব্বক যতই কেন না আহুতি প্রদান করা হউক, তাহাতে দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পূরণ সাধিত হইলেও, অতৃপ্ত আত্মার যে পিপাসা সেই পিপাসাই থাকিয়া যাইবে; বরং বিজাতীয় বিষয়ের আবরণ জন্য তাহাতে আত্মার অস্থিরতা সমধিক বিবর্দ্ধিতই হইবার কথা। অজ্ঞান শিশুর গ্রীষ্মাদি নিবন্ধন অন্তর্দাহ উপস্থিত হইলে, তাহার সেই অস্থিরতার কারণ না বুঝিয়া ভ্রমবশতঃ যদি অধিকতর উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে আবৃত করা হয়, তাহাতে তাহার সেই অব্যক্ত অন্তর্দাহ যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পূর্ণানন্দের পরিসেবন প্রার্থী জীব, তন্নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ স্বীয় অস্থিরতার কারণ বুঝিতে না পারিলেও জড়-দেহেন্দ্রিয় যখন তৎস্বজাতীয় জড়ের বোঝা সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপর চাপাইয়া দেয়, তখন চিদাত্মার সেই অব্যক্ত অশান্তির বিরাম না হইয়া, তাহা যে অধিকতররূপে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জীবাত্মার স্বভাবের উপর পরভাবের বা জড়ের আবরণ-জন্য তাহার অন্তরে যে অপূর্ণতার অব্যক্ত অভিযোগ জাগিয়া উঠে, তাহাই 'কামনা' রূপে নিরন্তর জীবের অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। জীবের সেই কামনানল, জড়ীয় বিষয়ের ইন্ধন দ্বারা নির্ব্বাপিত না হইয়া যে, উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধিত হইবারই কারণ হয়, শাস্ত্রও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন,—

জড়সঙ্গই জীবের স্বাভাবিক সুখধর্ম্মের আবরক।

কামনার স্বরূপ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (শ্রীভা' ৯।১৯।১৪)

অর্থাৎ বিষয় কামনা, কামোপভোগের দ্বারা কদাচ প্রশমিত হয় না; বরং ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয়াহুতির দ্বারা কামনানল উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

ঔষধে প্রতিকার না হইলে বুঝিতে হইবে রোগনির্ণয় হয় নাই।

জীবের ভবরোগ ও তাহার কারণ নির্ণয়।

নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে জীবের ভবরোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে সকল দিকেই ভ্রম পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

(১) একের রোগে অপরের চিকিৎসা করিলে,

(২) এক রোগের অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিলে,

(৩) যাহা রোগের কারণ পুনর্ব্বার তাহাই প্রযুক্ত হইলে, যেমন কোনও কালে সে রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে না, জীবের বিষয়-বাসনারূপ 'ভবরোগ' সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ভ্রমাত্মক প্রতিকার সাধিত হইতেছে ; যথা,—

(১) জীবাত্মার রোগে আমরা দেহেন্দ্রিয়াদিকে ঔষধ সেবন করাইতেছি।

(২) জীবাত্মার পূর্ণানন্দের পিপাসা, আমরা বিষয়-বিষ-প্রয়োগে নিবারণ করিতে চাহিতেছি।

(৩) জীবাত্মার স্বজাতীয়-বিষয়-সঙ্গের অভাবজনিত পীড়ায় আমরা বিজাতীয়-বিষয়-সঙ্গের ব্যবস্থা করিতেছি।

অবিদ্যায় আত্মবিস্মৃত জীবের নিরন্তর জড়-বিষয়-বাসনার অপর নাম 'ভবরোগ'। ইহারই ফলে আনন্দের নিত্যসেবক জীবকে 'সংসার'-আতুরালয়ে চিরশায়িত থাকিতে হইয়াছে ; চিকিৎসাও যে ভাবে চলিয়াছে, ফলও সেইরূপ হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত 'বাসনা'-ব্যাধি সন্তপ্ত বিকারগ্রস্ত আত্মার অতৃপ্ত-পিপাসা নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অগ্নির উষ্ণতা, মৃগমদের সুবাস ও মকরন্দের মিষ্টতা যেমন স্বভাব-গত ধর্ম্ম, তেমনই 'সুখ' বা 'আনন্দ' চিদ্বস্তুর নিত্যস্বভাব বা স্বধর্ম্ম। উষ্ণতা

হীন অগ্নির, সৌরভহীন কস্তুরীর ও মিষ্টতাহীন মকরন্দের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব হয়, সেই প্রকার চিদ্বস্তুর স্বভাবতঃ কখন সুখাভাব বা নিরানন্দ হইতে পারে না। মধু থাকিলে তাহাকে যেমন মিষ্টতা লইয়াই থাকিতে হয়, তেমনি চিদ্বস্তুকে আনন্দের সহিত নিত্যযুক্তই জানিতে হইবে। অগ্নি আছে—দাহিকাশক্তি নাই, কস্তুরী আছে—সৌরভ নাই, মধু আছে—মিষ্টতা নাই, ইহা যেমন অলীক ও অর্থহীন,—চৈতন্যের সুখহীনতাও সেইরূপ অসম্ভব; অতএব চিন্মাত্রকেই আনন্দময় ও আনন্দমাত্রকেই চিন্ময় বলিয়া জানিতে হইবে। আনন্দ ব্যতীত চৈতন্যের ও চৈতন্য ব্যতীত আনন্দের অস্তিত্বই অসম্ভব। 'চিন্ময়' শব্দের অর্থ সর্ব্বত্রই 'চিদানন্দময়'; এবং উহাই 'সৎ' বা নিত্য বস্তু।

আনন্দই চিদ্বস্তুর স্বধর্ম্ম।

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, জীব যখন চিৎকণ—চিদ্বস্তু, তখন জীবমাত্রেই স্বরূপভূত আনন্দের বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনলের উষ্ণতা ও মরকন্দের মিষ্টতা যথাক্রমে অনলে ও মধুতে সমবায় সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত থাকায়, তাহা যেমন আর অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবার আবশ্যক হয় না, তেমনি চিন্ময় জীব যখন স্বতঃই আনন্দময়—আত্মানন্দে পূর্ণ তখন জীবের সুখাভাবেরই বা হেতু কি? এবং কি জন্যই বা সংসারাবদ্ধ জীবকে সেই সুখাভাব-সম্পূরণ নিমিত্ত প্রাকৃত বা জড়ীয় বিষয় হইতে সুখ-সংগ্রহের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট হইতে হয়? সুখস্বরূপ জীবের সুখাভাব ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর অর্থাভাবের মতই নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও, যখন জীবজগতে কেবল দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির প্রয়াসমাত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন এই অঘটন সংঘটিত হইবার যাহা কারণ, তাহা অবশ্য সুনির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

জীব চিদ্বস্তু হইয়াও জীবে সুখাভাবের হেতু নির্ণয়।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা কর্তৃক জীবের স্বরূপভ্রান্তিই ইহার মূল কারণ। কনক-পর্য্যঙ্কশায়ী কোটীশ্বর যেমন সুন্দর, সুস্থ ও সুখী হইয়াও নিদ্রাবস্থার নিজ স্বপ্নময় দেহের মলিনতা, রুগ্নতাদি চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া বিষাদিত ও দুঃখিত হয়েন, সেইরূপ চিৎকণ জীব স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ হইলেও, অঘট-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রতারণায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, জড়ীয় দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥

(শ্রীভা° ১১।১১।২)

অর্থাৎ স্বপ্ন যেমন বুদ্ধিরই ভাবান্তর, সেইরূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহাপত্তি মায়ার অধ্যাস দ্বারা আত্মাতে প্রতীত হইয়া থাকে; অতএব শোকমোহাদি-লক্ষণ সংসার বাস্তব নহে।

জীবের দেহ-গেহাদি সর্ব্বাংশে স্বপ্নদৃষ্ট দেহ-গেহাদিবৎ মিথ্যা না হইলেও, অনাত্ম বা জড়ীয় দেহে 'আমি' বোধ ও তৎসম্বন্ধীয় গেহাদি বিষয়ে 'আমার' বোধ ইহাকেই স্বপ্নসদৃশ অলীক বা মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে। ('দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান'—চরিতামৃতে) জীবাত্মা চিদ্বস্তু ও দেহ-গেহাদি জড়বস্তু উভয়েই ভগবানের শক্তিবিশেষ হইয়াও উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। রজ্জু ও সর্প উভয় পদার্থ সত্য হইলেও রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ইহাই যেমন মিথ্যা, সেইরূপ দেহাদি ও আত্মা উভয়ই বস্তুবিশেষ হইলেও, 'দেহে আত্মবুদ্ধি' পূর্ব্বক সেই দেহাদির ভাবান্তরে নিজের দুঃখাদিবোধ—ইহাই স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা।

দেহ-গেহাদি জড়বস্তু নশ্বর হইলেও মিথ্যা নহে; চিৎকণ আত্মার সহিত জড় সম্বন্ধই অলীক ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

সুখময়তা ও সুখশূন্যতা যথাক্রমে আত্ম ও অনাত্ম বা চিদ্ ও জড়ের স্বভাব। চিদাত্ম-জীবের জড়াত্মতা, অর্থাৎ জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি বা

দেহাত্মবোধই তাহার স্বরূপভূত সুখের অভাব ঘটিবার কারণ। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্বরূপতঃ প্রভাময় হইয়াও ধূমরাশি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন নিষ্প্রভ বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীবের স্বরূপানন্দ ধূম-স্থানীয় জড়শক্তির বা গুণত্রয়ের আবরণে যতই অধিকরূপে আবৃত হয়, ততই স্বরূপানন্দ ম্লানতর হইতে থাকে। জ্বলন্ত অঙ্গার পাংশুরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম হওয়ায়,তন্নিবৃত্তির ও স্বাভাবিকতা বা স্বরূপভাব প্রাপ্তির জন্য যেমন সেখানে নিরন্তর একটা অপূর্ণতা—একটা কি যেন অভাবের অস্বচ্ছন্দতা জাগিয়া উঠে, সেইরূপ অনাত্মভাবের দ্বারা স্বরূপভাব আবৃত হওয়ায় তন্নিবৃত্তি ও স্বরূপতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের অন্তরে অহর্নিশ যে অভাব ও অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে, তাহাই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির বাসনাকারে জীবজগতে নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে। জড়ভাবের দ্বারা স্বরূপভাবের আবরণই জীবের সুখাভাবের হেতু। জড়তার আবরণে চিৎকণ জীবের সুখ 'স্বভাব' আবৃত হওয়াই তাহার সকল 'অভাবের' কারণ।

জড়ভাবের দ্বারা স্বরূপ-ভাবের আবরণই জীবের সুখাভাবের কারণ।

সুখস্বরূপ জীবের স্বাভাবিক সুখময়তার বিকার ও বিনাশ না থাকায়, উহা জীবের মতই নিত্যবস্তু। জড়াত্মবোধে—জড়ভাবদ্বারা যতই তাহা আবৃত হউক না কেন, উহার বিকার বা বিনাশ অসম্ভব। সিতাখণ্ডের মিষ্টতা অধিকতর জলসংযোগে অধিকতররূপে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে যেমন বিনষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, অনাত্মভাবের আধিক্য নিবন্ধন আত্মারও সেইরূপ স্বাভাবিক সুখের হ্রাসতা ও অত্যাধিক্যে বিনাশরূপেই অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ উহা বিনষ্ট বা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উত্তাপ দ্বারা জলীয় অংশের অপক্ষয়ের

চিৎকণ জীবাত্মার পক্ষে কোনও অবস্থায় সুখহীন হওয়া অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে শর্করার বিনষ্টপ্রায় মিষ্টতার পুনরাবির্ভাবে, তাহার অস্তিত্বের বিলোপ বা বিকার হয় নাই,—কেবল আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে মাত্র, ইহা যেমন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ জড়তা বা সত্ত্বাদিগুণ-সম্বন্ধের অপক্ষয়ে ক্রমশঃ জীবের স্বরূপানন্দের প্রকাশ হইয়া পরিশেষে যখন সম্পূর্ণ বিমুক্তভাব জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে পারা যায় জীবের আত্মানন্দের হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ নাই, কেবল আবরণের বিকার বশতঃ তাহাকেও বিকৃতপ্রায় বোধ করাইয়াছিল। জীব নিত্যবস্তু—নিত্যানন্দময়। বিকার ও বিনাশ জীবের ধর্ম্ম নহে, উহা জড়ের ধর্ম্ম; এইজন্য জড়বস্তুমাত্রই উৎপত্তি, জন্মান্তরস্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্ভাব-বিকারময়। গমনশীল নৌকার গতিধর্ম্ম, তটস্থিত বৃক্ষাদি স্থিরবস্তুতে অধ্যাসিত হইয়া যেমন উহাদিগকেই গতিশীলের ন্যায় বোধ করাইয়া থাকে, সেইরূপ ষড়্ভাব-বিকারাদি জড়ধর্ম্ম সকলও সুখময় আত্মায় অধ্যাসিত হইয়া জীবের স্বরূপানন্দের বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশাদি বিকারের মতই অনুভব করাইয়া দেয়; বস্তুতঃ উহা আত্মার নহে—জড়েরই ধর্ম্ম। পূর্ণচন্দ্র সচল মেঘমালায় আবৃত হইলে জলদরাশির তরলতা ও নিবিড়তা অনুরূপ জ্যোৎস্নালোকের বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি বিকার পরিলক্ষিত হইলেও, যেমন চন্দ্র ও তাহার কিরণাবলীকে আমরা অবিকৃত বলিয়াই জানিয়া থাকি, সেইরূপ চিৎকণ-জীবের সহিত জীবের সুখধর্ম্ম নিত্য ও অবিকৃত হইলেও, বিকারশীল জড়ভাবের বিকারানুরূপ উহাকেও বিকৃতপ্রায় বোধ করাইয়া থাকে, ইহাই জানিতে হইবে। জল হইতে সমুৎপন্ন মীনগণ যেমন জল ব্যতীত ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না, তেমনি বিভু-চিদানন্দ হইতে সম্ভূত নিত্যানন্দময় জীব, আনন্দশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তকালও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (তৈত্তিরী উ° ৩।৬।১)

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই লীন হইয়া থাকে।

জীবের সুখধর্ম্ম যদি জীবেরই মত নিত্য পদার্থ না হইত, তবে বিরুদ্ধ-ভাবের আতিশয্যে উহা কোনও না কোন অবস্থায় অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইত; কিন্তু জীব নিত্য সুখস্বরূপ বলিয়া, অনাত্মভাবের বা গুণত্রয়ের আবরণে তাহার স্বরূপানন্দ যতই আবৃত হউক না কেন, কোন অবস্থায় জীবের সম্পূর্ণ সুখ-শূন্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। জীব যতই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হউক না কেন,—জীবের সুখাভাব যতদূর সম্ভব আধিক্য বিস্তার করুক না কেন তাহার অন্তরালেও আনন্দের সংবাদ নিহিত থাকিবেই। গুণত্রয়ে সংবদ্ধ জীব নিজ কর্ম্মবশে যখন অত্যন্ত সুখাভাবে—নিরতিশয় রোগ, শোক, তাপাদিতে সন্তপ্ত হয়,—যখন জীব অন্তরের অন্তরতম স্থলে সুখের লেশা-ভাসও আর খুঁজিয়া পায় না,—দুঃখের জ্বালাময় বিষাক্ত বাষ্পের পরিবর্ত্তে যখন হৃদয়ের কোনও কোণে এক কণও সুখ-সমীরণের আর সন্ধান মিলে না,—এরূপ অবস্থার অভ্যন্তরেও আনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতল জলধি-জলের অভ্যন্তরেও যেমন বাড়বানলের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়, আবার প্রচণ্ড অনলের উপাদানের ভিতরেও যেমন জলীয় অংশের বিদ্যমানতা সম্ভব হয়, সেইরূপ অবিদ্যা ও গুণত্রয়ের আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন হইয়া জীবের নিত্য-সুখধর্ম যতই অধিকতর সুখাভাব বা দুঃখাকারে পরিলক্ষিত হউক না কেন,—তাহার অভ্যন্তরেও জীবাত্মার নিত্যসুখালিঙ্গিত-স্বরূপ অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

বিরুদ্ধভাবের আতিশয্যেও জীবের সুখধর্ম্মের অবিনশ্বরতা।

সদ্য-পুত্রহারা জননীর হৃদয়, জাগতিক দুঃখজ্বালার একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনস্থল। যখন পুত্রবিয়োগ সন্তপ্তা জননীর মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনে

অপরের হৃদয়কেও সন্তপ্ত করিয়া তুলে, যখন বাতাহত তরুর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা ও বক্ষে করাঘাত সংরতা মাতার শোকানলে দিক্‌সকল যেন পরিদগ্ধ হইতে থাকে, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারিলে, ঠিক সেই অবস্থার ভিতরেও—দুঃখের সেই প্রতপ্ত মরু মাঝেও মরুদ্যানের মত সুখকণার সন্ধান অবশ্যই মিলিবে। সদ্য পুত্রহারার প্রচণ্ড দুঃখের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার সেই ভূমিলুণ্ঠনে, ক্রন্দনে ও করাঘাতের মধ্যেও যে সুখাভাস লুকান রহিয়াছে তাহা তখনই বুঝিতে পারা যায়, যখন তাঁহার ভূমিলুণ্ঠনাদি-শোকাবেগ প্রকাশ বিষয়ে বলপূর্ব্বক কোনও বাধা প্রদান করা হয়; এরূপ বাধা প্রদানে তখন সেই শোকানল—সেই দুঃখজ্বালা যেন আরও অধিকতর বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী অবস্থা হইতে পূর্ব্বাবস্থায় যে কিঞ্চিৎ অধিকতর সুখাভাস অবলম্বিত হইয়াছিল,—অধিকতর দুঃখপ্রকাশের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত শোকাদি অবস্থায়—তমোগুণের সেই নিবিড় আবরণের ভিতরও জীব যে আত্মানন্দকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সদ্য পুত্রহারা জননী-হৃদয়েও সুখলক্ষণ।

যে দুঃখের প্রাবল্যে লোকে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকে, আবার সেই মৃত্যুর সম্ভাবনা সমুপস্থিত দেখিলে,—কোনও এক নিরতিশয় দুঃখক্লিষ্টা পরিশ্রান্তা বৃদ্ধার মরণ কামনায় যমকে আহ্বান পূর্ব্বক, যমের উপস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাহার সংগৃহীত কাষ্ঠবোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিবার অভিপ্রায়মাত্র যমরাজকে জ্ঞাপন করিবার ন্যায়—তখন সেইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত চেষ্টাশীল হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যে গুরুতর দুঃখে মৃত্যুকেও বরণ করিবার ইচ্ছা হয়'

মরণাভিলাষীর অন্তরেও সুখলক্ষণ।

তাহার ভিতরেও জীব সুখাভাস অবলম্বিত; সেই দুঃখের অবস্থাটি অন্ততঃ মরণ দুঃখ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখকর বলিয়া বোধ না হইলে, মৃত্যুর কারণ সমুপস্থিত দেখিয়া তখন তাহা হইতে নিবৃত্তিলাভের প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইবে কেন? অতএব সেই ঘোরতর জড়তার আবরণের মধ্যেও আনন্দ অবলম্বিত জীবের অস্তিত্ব স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে।

আত্মহত্যার অন্তরালেও আত্মায় সুখধর্ম্মের প্রকাশ।

আবার যে প্রবলতম জড়ভাবের আবরণ উপস্থিত হইলে দুঃখের অত্যাধিক্য নিবন্ধন লোকে বিষপানাদি দ্বারা সত্যই দেহত্যাগ করিয়া থাকে,—সেই 'আত্মহত্যার' অন্তরালেও 'আত্মা' ও 'আনন্দের নিত্যত্ব-সংবাদ নিহিত রহিয়াছে। অবিদ্যা বশতঃ জীব, দেহাদিকে আত্ম বলিয়া মনে করিলেও বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত আত্মাই মুখ্য আত্মা, আর দেহাদিতে যে আত্মবোধ উহা গৌণ আত্মা। মুখ্য আত্মার সম্বন্ধেই দেহাদি অনাত্মবস্তুতেও আত্মবোধ জন্মিয়া থাকে। আত্মসুখের প্রতিকূল বলিয়া যাহা বোধ হয়, সেই বিষয় বা সেই বস্তুকে লোকে দুঃখের কারণরূপে পরিত্যাগ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট অঙ্গকে ছেদন করিয়াও, যে দেহের সুখসাধনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, আবার যাহার সুখ পোষণের অনুরোধে লোকে স্বেচ্ছায় সেই দেহকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—তাহাই মুখ্য আত্মা—তাহাই নিত্যানন্দময় চিৎকণ জীব। যাহার দুঃখবোধে দুঃখের হেতুভূত বিষয় পরিত্যাগ করা হয়, তাহাকে 'ত্যক্তা' (ত্যাগকর্ত্তা) এবং যাহা ত্যাগ করা হয় তাহাকে 'ত্যাজ্য' (ত্যাগের বিষয়) বলা হইয়া থাকে। ত্যক্তার সুখের নিমিত্তই দুঃখকর বিষয় ত্যাজ্য হয়, কিন্তু ত্যক্তা নিজে কখনও ত্যাজ্য হইতে পারে না। দেহ যদি যথার্থ আত্মবস্তুই হইত, তবে সেই দেহ কোন অবস্থাতেই ত্যাজ্য হইতে পারিত না; অতএব প্রজ্জ্বলিত গাত্রবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিদাহ হইতে দেহকে রক্ষার ন্যায়, দুঃখবহুল দেহকেও পরিত্যাগ

করিতে দেখিয়া, দেহাতিরিক্ত ত্যক্তার অস্তিত্বে, জীবাত্মার নিত্যসুখধর্ম্মই অনুমিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌মুনীশ্বর ভারতিতীর্থপাদ তদীয় সুপ্রসিদ্ধ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে উক্ত বিষয়টি সুন্দররূপে সমাধান করিয়াছেন ; যথা,—

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ।
ততো দ্বেষাদ্ভবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি॥
ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যক্তুরেব সা।
ন ত্যক্তুর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥(১২।২৮-২৯)

অর্থাৎ যদিও কখনও রোগ ও ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ায়, আত্মার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কাহারও মৃত্যুর ইচ্ছা দেখা যায়, (অর্থাৎ এবম্ভূত আত্মার ত্যাগেচ্ছা হয়) বাস্তবিক পক্ষে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যে-হেতু রোগ-ক্রোধাভিভূত দেহই পরিত্যাগের যোগ্য হয়, কিন্তু দেহী বা আত্মা কখনও পরিত্যাগের বিষয় হয়েন না ; কারণ দেহী বা আত্মাই ত্যক্তা (ত্যাগকর্ত্তা) হওয়ায়, ত্যক্তার নিজের প্রতি কখন দ্বেষ হয় না, ত্যাজ্য অর্থাৎ ত্যাগের বিষয় যে দুঃখাদি বহুল দেহাদি, তৎপ্রতিই দ্বেষ হওয়ায়, ইহাতে কোনও প্রকার হানি হইতেছে না।

সকল দিক দিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আত্মার সুখময়ত্ব ও নিত্যত্ব কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। তবে জীবাত্মার যে সুখহ্রাস ও সুখবৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আত্মার আবরণ-স্বরূপ অনাত্ম বা জড়ভাবের তারতম্য বশতঃই জানিতে হইবে ;—উহা বস্তুতঃ আত্মানন্দের হ্রাস ও বৃদ্ধি নহে। জীবের ন্যায় জীবের আত্মানন্দও তদনুরূপ পূর্ণ এবং নিত্য ; সুতরাং উহার উৎপত্তি, বিনাশ, হ্রাস ও বৃদ্ধি অসম্ভব।

চিদ্বস্তুর অপর নাম আত্মবস্তু। জীব চিৎকণ বলিয়া জীবাত্মাও আত্মবস্তু। জীবশক্তিরূপ আত্মবস্তুর অন্তর্যামী ও আশ্রয় যিনি—সেই শক্তিমৎ পরমেশ্বর পরমাত্মবস্তু। আবার পরমাত্মবস্তুর পরভাব বা পূর্ণতম স্বরূপ যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম ভগবান্ ; তিনিই সমস্ত

আত্মভাবের ও সকলের মূল কারণ। আনন্দই আত্মবস্তুর স্বধর্ম্ম; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই পূর্ণতম আনন্দময়। তদেকাত্ম-তত্ত্ব সকল ও পরমাত্মা—পূর্ণতর আনন্দময় এবং জীবাত্মা পূর্ণানন্দময়। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই অপূর্ণ; চিন্ময় বা আত্ম-বস্তু অপরিচ্ছিন্ন অতএব পূর্ণ। চিন্ময় বস্তুর পরিমাণ সকল বিষয়েই পূর্ণতা হইতে আরম্ভ ও পূর্ণতমভাবে পর্য্যবসান। চিন্ময়রাজ্যে পূর্ণতার নিম্নস্তরের কোনও পরিমাণ নাই।

সুখলক্ষণান্বিত চিদ্বস্তুর পরমভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমানন্দস্বরূপ।

জীব চিৎকণ হইলেও কণ-পরিমিত শুদ্ধানন্দে তাহা পূর্ণ। জীবের আনন্দ ও ঈশ্বরের আনন্দ উভয়ই পূর্ণ হইলেও, পূর্ণঘট ও পূর্ণসমুদ্রে যে ব্যবধান, জীব ও ঈশ্বরের পূর্ণতার মধ্যে অনেকাংশে সেই প্রকার পার্থক্য। আত্মারাম-গণ (অর্থাৎ আত্মাই সুখের বিষয় হইয়াছে যাঁহাদের) আত্মানন্দে বা নিজ স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সুখে নিমগ্ন থাকেন; তাঁহাদের আত্মা, অনাত্মভাবের আবরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া স্বরূপানন্দেই পূর্ণ; সুতরাং তাঁহারা আত্মারাম। আত্মারাম-জীবের সুখাভাব না থাকায়, বদ্ধ-জীবের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের অপর কোনও বাহ্যবিষয়ের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের চিৎকণ আত্মা, কণ-পরিমিত স্বরূপানন্দেই পূর্ণ হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীব হইতে মায়ামুক্ত জীবে এই পার্থক্য।

সুখস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরের সুখ-পার্থক্য।

আত্মভাবে অবস্থিত জীবকে 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিলেও ইহাই জীব-স্বরূপের পূর্ণতমভাব নহে; ভক্তভাব—কৃষ্ণদাসভাব জীবভাবের পূর্ণতম পরিণতি। জীব যতক্ষণ একান্তভাবে নিজ পরম-কারণ-স্বরূপের আশ্রয় লাভ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার পরমানন্দ ও পরম-কল্যাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

জীবের মুক্তভাব হইতে ভক্তভাবে আনন্দাতিশয্য ও তাহার কারণ।

ধূমপুঞ্জ-বিমুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বভাবতঃ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইলেও, যেমন তাহার সেই ধূমমুক্ত ও স্বতন্ত্র অবস্থা হইতে নিজ কারণস্থানীয় অগ্নিরাশির আশ্রয়লাভ করিয়া, তদধীনে অবস্থিতিই অধিকতর উজ্জ্বল ও মঙ্গলকর হইয়া থাকে, সেইরূপ জড়ভাববিমুক্ত জীব-স্বরূপের স্বাধীনতাও তেমন নিরাপদ নহে এবং সুখও সেরূপ অনন্ত নহে,—নিজ ও সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ সেই শ্রীগোবিন্দপদ কল্পতরুর আশ্রয়ে ও অধীনতায় যেরূপ আনন্দ ও অভয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বিদেশে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধা কোনও নারী, তদবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ পতিদেবতার অধীনতা পাশে আবার স্বেচ্ছায় সংবদ্ধা হইতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেমন প্রাপ্ত-স্বাধীনতার আনন্দের মধ্যেও নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করেন না, সেইরূপ সংসারপাশ বিমুক্ত জীব, স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও নিজেকে নির্ব্বিঘ্ন ও পরিতৃপ্ত মনে করেন না, যে পর্য্যন্ত সেই প্রাণের প্রাণ—জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণে —নিজেকে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারেন। আবার সেই রমণী, পতির আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া, তখন পতির অধীনতাকে যেমন শত স্বাধীনতা হইতেও শ্রেয়ঃ ও পতির সেবাসুখকে যেমন শত শৃঙ্খলমুক্তির সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণাধীনতার নিকট কোটি স্বতন্ত্রতার গৌরব বিলজ্জিত ও শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখের নিকট কোটি ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ বিমলিন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাই সনকাদি আত্মারামগণ আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও, পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের আকর্ষণ তাঁহাদের সে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপদ-কমলের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহের আকর্ষণ প্রভাব—সে ত বহু দূরের কথা, তদীয় পদ-কমলসংলিপ্ত তুলসীর সৌরভ কণার আঘ্রাণমাত্রেই, স্বরূপানন্দে বিভোর আত্মারামগণের মানস-মধুপ

পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামগণাকর্ষীত্ব।

প্রমোদিত হইয়া তৎসমীপে ধাবিত হয়,—তাঁহার এমনই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(শ্রীভাগবতে ৩।১৫।৪৩)

অর্থাৎ (সনকাদি আত্মারাম মুনিগণ শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে প্রণত হইলে) সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন তুলসীর সুগন্ধবাহী সমীরণ মুনিবৃন্দের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায়, যদিও তাঁহারা আত্মানন্দে নিমগ্ন, তথাপি সেই গন্ধে তাঁহাদিগের চিত্ত অতিশয় হর্ষান্বিত ও গাত্র রোমাঞ্চিত হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ—যাঁহার প্রতিছত্র শ্রীভাগবত গ্রন্থেরই ঘনতম নির্য্যাস দ্বারা বিরচিত,—সেই শ্রীচরিতামৃতেও তাই লিখিত হইয়াছে,—

'ইহ সব রহু কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥' (মধ্য ১৭।১৩৩)

শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ।

শ্রীকৃষ্ণই পরমানন্দের পূর্ণতম অবস্থা। নিখিল আনন্দধারার তিনিই মূল উৎস। তিনি পূর্ণতম আনন্দময় হইয়াও আবার সকল আনন্দের কারণ বলিয়া, তিনি পূর্ণতম রসময় বা 'রসরাজ'। 'রস' অবলম্বনেই আনন্দের বিকাশ হয়। সুতরাং 'রস' আনন্দের কারণ এবং 'আনন্দ' রসের কার্য্য। 'রস' সবিশেষ ও 'আনন্দ' নির্ব্বিশেষ পদার্থ। সুগন্ধী ধূপ হইতে যেমন সুবাসিত ধূম উত্থিত হয়, সেইরূপ রসকে অবলম্বন করিয়া আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে রসই আনন্দের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সকল আনন্দ ও সকল

রস আনন্দের আশ্রয়।

রসের মূল কারণ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ-তত্ত্ব; সুতরাং তিনিই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। তাই শ্রীভগবান স্বয়ং গীতাতেও বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (১৪।২৭) অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। সমূর্ত্ত ও সবিশেষ সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন নির্বিশেষ প্রভার বিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ 'আনন্দব্রহ্ম' বলিয়া শ্রুতি যে তত্ত্বকে বর্ণনা করিয়া থাকেন, —'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'। (তৈতিরী উ০—৩।৬) অর্থাৎ আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন,—সেই নির্ব্বিশেষ—অখণ্ড-আনন্দতত্ত্ব, ঘনীভূত সবিশেষ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভারূপেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন।

আনন্দব্রহ্ম-তত্ত্ব রসরাজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্ম সংহিতা।৫।৪০)

অর্থাৎ যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি-বিভূতিভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি,—আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

প্রভা যেমন সূর্য্যেরই মহিমা, ধূম যেমন ধূপেরই মহিমা, তেমনি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম,—রসব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ। 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্' (ভা০ ৮।২৪।৩৮) অর্থাৎ 'আমার মহিমাই পরব্রহ্ম নামে কীর্ত্তিত হয়েন'; অতএব 'আনন্দ-ব্রহ্ম' যে 'রস-ব্রহ্মের' মহিমা বা সামর্থ্যবিশেষ,—ইহা শ্রীভাগবতে ভগবদুক্তি হইতেই জানা যায়।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, রসই সকল আনন্দের মূল বা কারণ। রসকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। অতএব যিনি পরমানন্দের

পূর্ণতম অবস্থা বা কারণস্বরূপ, তাঁহাকে সকল রসের পূর্ণতমমূর্ত্তি বা 'রসরাজতত্ত্ব' বলিয়াই জানিতে হইবে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মানন্দের কারণ,—জীবানন্দের কারণ,—বিশ্বানন্দের কারণ,—নিখিল আনন্দের তিনিই পরমাশ্রয়স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের উৎস হইতেই সকল আনন্দ ধারা উৎসারিত হইতেছে।

শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—

'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
(তৈত্তিরী উ° ২।৭।১)

অর্থাৎ যিনি সেই স্বয়ংকর্ত্তা (=স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্) তিনিই রস-স্বরূপ। এই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দিত হয়েন।

যে রস-সুধাকরের আকর্ষণে তদীয়মহিমা স্বরূপ ব্রহ্মানন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া, তাহারই একবিন্দুর প্রভাবে সমস্তবিশ্বকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই নিখিল আনন্দ ও মাধুর্য্যামৃতের উৎস—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া, তিনি যে কেবল বিমুক্ত বা আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষক তাহাই নহেন,—নিখিল চরাচর—নিখিল নরনারীর সহিত নিজেও নিজের মহা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন;—

'কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল'॥
শ্রীচরিতামৃতে। আদি ৪।১২৪)

চিদানন্দ-কণ জীবের পক্ষে, নিজ পরমাশ্রয় ও পরমকারণ সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয় চরণাশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সম্যক্ প্রসন্নতা বা পরিতৃপ্তির ও পরমানন্দ প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই।

সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি—এই প্রয়োজন

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জীব মায়াবিমুক্ত হইলে, গুণসম্বন্ধ বা অনাত্ম-ভাবের আবরণ অপসারিত হওয়ায়, তাহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তিরূপ গৌণ প্রয়োজন সম্যক প্রকারে সিদ্ধ হইলেও, সুখপ্রাপ্তিরূপ মুখ্য প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয় না, যে পর্য্যন্ত জীব, নিজ-স্বরূপভূত আনন্দ বা আত্মসুখ সেবনের পরিবর্ত্তে নিজ পরমকারণ ও পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবন-তৎপর হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত না হয়। বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিতে আর স্বতন্ত্ররূপে জলসেচনের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ আত্মভাবের পরমকারণ যিনি,—সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ প্রাপ্তিতে আর পৃথকরূপে আত্মসেবা-সুখের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিতেই দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ আনুষঙ্গিক ফলের সহিত পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ পরিপূর্ণ ও মুখ্যফল লাভ যুগপৎ সংঘটিত হইয়া যায়। অমলা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভা ১১।১৪।২০) অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আমি গ্রাহ্য হইয়া থাকি,—ইহা ভগবানের নিজোক্তি; অতএব জীবত্বই জীবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি নহে, ভক্তত্বই জীবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। জীবের সংসারাবদ্ধভাব বা স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্ব হইতে সংসারমুক্তভাব বা জীবত্ব শ্রেষ্ঠ হইলেও জীবত্বই জীবভাবের পূর্ণ বিকাশ নহে,—ভক্তত্বই জীবভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ। ভক্তত্বই শুদ্ধ জীবের স্বরূপ এবং নিজ পরম-কারণ ও পরমাশ্রয় যিনি,—সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তিই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণসেবনই জীবের প্রকৃষ্ট সুখ প্রাপ্তির উপায়।

ভক্তত্বই শুদ্ধ জীবের পরিপূর্ণ স্বরূপ; শুদ্ধাভক্তিই শুদ্ধ জীবের প্রকৃষ্ট স্বধর্ম্ম।

স্বরূপভ্রান্ত জীব, অনাদিকাল হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করায়, তাহার স্বধর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণসেবনবৃত্তি, দেহাদি অনাত্মবস্তুর আবরণে

আচ্ছাদিত হইয়া বহির্মুখতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য উহা অশুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণসেবনের স্থলে মায়িক বিষয়-সেবনাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহাত্মবোধ বশতঃই নিত্য-কৃষ্ণদাসকে মায়ার দাস সাজিতে হইয়াছে। তাই পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥"

(মধ্য ২।৪।১৩০)

প্রয়োজন-প্রকরণ

—ঃ০ঃ—

ভক্তির সহজার্থ 'ভালবাসা'। 'সুখ' বা আনন্দই ভালবাসা—জীবমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুখের বিষয় যাহা,—যাহাতে আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহাই আমরা ভাসবাসি তাহাই আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। যাহা সুখের বিষয় নহে, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় 'যাহা ভাল লাগে না' তাহা আমরা 'ভালবাসি' না; যাহা সুখের বিষয়, 'যাহা ভাল লাগে' তাহাই আমরা 'ভালবাসি'। জীবমাত্রে সুখ বা আনন্দকেই ভালবাসে বলিয়া সুখের বিষয়মাত্রেই জীবের প্রিয় হয়; সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয়ের প্রতিও ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। জীব একমাত্র আনন্দ ব্যতীত আর কাহাকেও বা কিছুই ভালবাসে না; অতএব যেখানেই ভালবাসা বা প্রিয়তা-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারই অভ্যন্তরে সুখ-সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান জানিতে হইবে।

সুখ ও ভালবাসা বা আনন্দ ও প্রিয়তা উভয়ে নিত্যযুক্ত।

সংসারে যাহাকে আমরা প্রিয় মনে করি—যাহা কিছু আমরা ভালবাসিয়া থাকি—সেই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ, ধন, রত্ন, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয়-সকল, বস্তুতঃ কেহই বা কিছুই প্রিয় নহে; ইহাদের কাহাকেও কেহ ভালবাসে না। আমরা ভালবাসি কেবল আনন্দকেই,—একমাত্র আনন্দই আমাদের প্রিয় বস্তু। তবে যে উক্ত বিষয় সকল আমাদের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, আমরা যে ঐ সকল বিষয়কে ভালবাসি বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সে ভালবাসা বিষয়ের প্রতি নহে,—তাহা আনন্দ বা সুখকেই ভালবাসা। স্ত্রী-পুত্রাদিকে যে ভালবাসি, সে

সুখের নিমিত্তই সুখের সাধন বা বিষয় সকল প্রিয় হয়।

ভালবাসা তাহাদের প্রতি নহে,—স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে আমরা যে সুখ পাইয়া থাকি, সেই সুখ—সেই আনন্দকে ভালবাসি বলিয়াই সুখের বিষয়-স্বরূপ স্ত্রী, পুত্রাদি আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ্, ধন, রত্নাদি যে আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে, সেই প্রিয়তা—সেই ভালবাসাও বিষয়ের জন্য নহে; সেই সকল বিষয় হইতে আমরা যে আনন্দ পাইয়া থাকি, সেই আনন্দ বা সুখকেই ভালবাসি বলিয়া—সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয়-সকলও আমাদের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। যেমন দুগ্ধের প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়া ধেনুগণ লোকের প্রিয় হয়, যেমন ইক্ষুরসের প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়া ইক্ষুসকল লোকের প্রিয় হয়, সেইরূপ সুখের সম্বন্ধেই সুখের বিষয় সকল লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও ইক্ষুরসের সম্বন্ধেই ধেনু ও ইক্ষু লোকের প্রিয় হইলেও, সুখ আছে বলিয়াই আবার দুগ্ধ ও ইক্ষুরস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আনন্দই প্রিয়বস্তু; আনন্দ পাই বলিয়া দুগ্ধ প্রিয় হয়; আনন্দের সম্বন্ধ বশতঃ দুগ্ধ প্রিয় বলিয়াই ধেনুও প্রিয় হইয়া থাকে; আনন্দের সম্বন্ধবশতঃ ধেনুগণ প্রিয় বলিয়া গোষ্ঠও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আবার দুগ্ধ যাহার 'ভাল লাগে না'—দুগ্ধে যাহার প্রিয়তা নাই, তাহার নিকট দুগ্ধ সুখের বিষয় হয় না। ধেনু ও গোষ্ঠ কিছুই তাহার প্রিয় নহে; অতএব একমাত্র সুখ বা আনন্দই মুখ্যপ্রয়োজন বা সাধ্যবস্তু। আর দুগ্ধ, ধেনু, গোষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয় সকল সুখের সাধন মাত্র—তাহা সুখবস্তু নহে। উহারা কেবল সুখের সম্বন্ধ পরম্পরায় প্রিয় হইয়া থাকে।

সুখ ও সুখের বিষয় বিভিন্ন পদার্থ।

যেমন দুগ্ধ ও গাভী একবস্তু নহে, তেমনি 'সুখ' ও 'সুখের বিষয়' সুখ নহে—পৃথক বস্তু। 'গাভীদুগ্ধ' বলিলে যেমন 'গাভীই দুগ্ধ' এরূপ অর্থের প্রতীতি না হইয়া, 'গাভীর দুগ্ধ' অর্থাৎ গাভী হইতে প্রাপ্ত দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ

করা হয়, সেইরূপ 'বিষয়সুখ' বলিতে 'বিষয়ই সুখ' এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না ; কিন্তু 'বিষয়ের সুখ' অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রাপ্ত সুখকেই নির্দেশ করা হয়। সুখের বিষয় হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই 'সুখ' বা 'আনন্দ' এবং সুখ বা আনন্দ যাহাতে অবস্থিত, তাহাকেই 'সুখের বিষয়' জানিতে হইবে। সুখকে 'সুখ' ও যাহা সুখের বিষয়—যাহা সুখ প্রদান করে, তাহাকে 'সুখকর' বলা হইয়া থাকে ; সুতরাং 'সুখ' ও 'সুখের বিষয়' যখন পৃথক বস্তু, তখন 'সুখ' ও 'সুখকর' এই শব্দ দুইটির পৃথক অর্থ জানিতে হইবে। আবার সুখই যখন জীবের প্রিয়বস্তু এবং সেই সুখের সম্বন্ধ বশতঃই সুখের বিষয়মাত্রেই জীবের প্রিয় হইয়া থাকে, তখন কেবল সুখ বা আনন্দকেই 'প্রিয়' এবং সুখের বিষয়কে 'প্রীতিকর' বলিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক। 'সুখ' ও 'সুখকর' যেমন পৃথক বস্তু, তেমনি 'প্রিয়' ও 'প্রীতিকর' শব্দার্থ পৃথক বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ যাহা 'সুখ' কেবল তাহাই 'প্রিয়' এবং যাহা 'সুখকর' তাহা 'প্রিয়' হইতে পারে না,—তাহা 'প্রীতিকর' বা সুখের সাধন মাত্র।

সুখের স্বরূপ অবগত নহি বলিয়া, আমরা সুখের বিষয় বা সুখের সাধনকেই ভ্রমবশতঃ 'সুখ' বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সুতরাং তাহাদের 'প্রিয়' বলিয়াও মনে করি; বস্তুতঃ উহারা আপাততঃ 'সুখকর' ও 'প্রিয়ঙ্কর' মনে হইতে পারে, কিন্তু 'সুখ' ও 'প্রিয়' নহে। যাহা কেবল সুখ-পদার্থ একমাত্র তাহাই জীবের 'প্রিয়'—একমাত্র তাহাই জীবের ভালবাসার বস্তু।

একমাত্র 'সুখ' পদার্থই জীবের প্রিয় বস্তু।

যাহা চিন্ময় বা আত্মবস্তু, তাহাই আনন্দ সুখময়। চিদ্‌বস্তুর নিত্যত্ব, চৈতন্য ও আনন্দই স্বধর্ম্ম বা স্বরূপগত ভাব। অচিদ্ বা অনাত্মবস্তু, চৈতন্য ও আনন্দ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও অনিত্য। চিদ্বস্তু বা

চৈতন্যই আনন্দ এবং আনন্দই চৈতন্য বা চিদ্বস্তু; অতএব চিন্ময় বা আত্মবস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত কুত্রাপি আনন্দ বা সুখ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেই পারে না। যেখানে সুখ-লক্ষণ বিদ্যমান, সেখানেই আত্মবস্তুর সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মবস্তু ভিন্ন আনন্দ নাই, এবং আনন্দ ভিন্ন প্রিয়তা বা ভালবাসাও নাই,—এই কথাটি আমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা চৈতন্য, তাহাই আনন্দ ও সেইখানেই প্রিয়তা। যাহা আনন্দ, তাহাই চৈতন্য ও সেইখানেই প্রিয়তা; এবং যেখানে প্রিয়তা তাহাই চৈতন্য ও আনন্দ। চৈতন্য, আনন্দ ও ভালবাসা — এই তিনে নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

আত্মবস্তু চিন্ময় বা যাহা তাহাই আনন্দময়—যাহা আনন্দময় তাহাই চিন্ময় বা আত্মবস্তু— এবং তাহাই প্রিয়।

চিদ্ বা জ্ঞানবস্তু আবার নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা যেমন নিজেই জ্ঞাতা ও নিজেই জ্ঞেয় হয়েন, তেমনি আনন্দও আবার নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় বা আনন্দনীয় হইয়া, নিজ আনন্দে নিজেও আনন্দিত হয়েন এবং আনন্দই প্রিয়বস্তু বলিয়া, আনন্দ নিজানন্দকে বা নিজেকেই নিজে ভালবাসিয়া থাকেন; অর্থাৎ সুখবস্তু নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজসুখে নিজেই সুখী হইয়া, নিজসুখকে নিজেই ভালবাসিয়া থাকেন;—সুখ বা আনন্দের ইহাই স্বভাব। এইজন্য সকল চৈতন্য ও আনন্দের মূল বা কারণ যিনি, সেই শক্তিমৎ শ্রীভগবান্ নিজে পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াও নিজ স্বরূপগত বৃত্তিবিশেষ বা 'হ্লাদিনী' দ্বারাই আনন্দিত হয়েন, এবং সেই বৃত্তিবিশেষ দ্বারা আনন্দস্বরূপ নিজেই ভালবাসার বিষয় হইয়া নিজেকেই ভালবাসিয়া থাকেন; অর্থাৎ পরমানন্দ নিজেই পরমানন্দনীয় হইয়া যে শক্তি দ্বারা

জ্ঞান যেমন নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সেইরূপ আনন্দও নিজ বৃত্তি-বিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দী ও আনন্দনীয়।

পরমানন্দী হয়েন, শাস্ত্র তাহাকেই 'হ্লাদিনী-শক্তি' নামে বর্ণন করিয়াছেন ; যথা—

'হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ স হ্লাদিনীতি'।

(সিদ্ধান্তরত্নঃ ১।৪৩)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আবার আনন্দিত হয়েন (ও ভক্ত-জীবসকলকে স্বসাম্মুখ্য প্রদান দ্বারা আনন্দিত করেন), তাহার সেই নিজ স্বরূপগত শক্তিবিশেষকে 'হ্লাদিনী' কহে।

'সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।"
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ'॥ (শ্রীচরিতামৃতে ।২।৮)

একমাত্র আনন্দই ভালবাসার বস্তু বলিয়া, আনন্দময় শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দিনী শক্তিদ্বারা নিজেকেই ভালবাসিয়া নিজে আনন্দীত হয়েন। ভক্তি সেই হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা সাররূপা। আবার প্রিয়-

ভক্তি বা ভালবাসা আনন্দেরই বৃত্তিবিশেষ।

তাতেই আনন্দ বলিয়া, একমাত্র হ্লাদিনী-বৃত্তি বা আনন্দ-সার 'ভক্তিতেই' ভগবানের আনন্দ। ভক্তি-সম্বন্ধে ভক্তগণ তদনুরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাই ভক্তগণও শ্রীভগবানের আনন্দের বস্তু—অতএব প্রিয় হয়েন। শ্রীভগবানের ভক্ত-প্রিয়তা, ভক্তি-প্রিয়তা, হ্লাদিনী-প্রিয়তা,—আনন্দ-প্রিয়তার বা আত্মপ্রিয়তারই ভাবান্তর মাত্র। অতএব আনন্দই ভালবাসার সামগ্রী,—আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই প্রিয় নহে।

সর্ব্বাংশী ও সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবান্ আত্মবস্তুর পরমভাব বা পরমাত্ম-বস্তু। তিনিই নিখিল আনন্দের পরমকারণ ও পরমাশ্রয়-স্বরূপ ; শ্রীভগবান্ বিভু-চিদানন্দময়; তচ্ছক্তিরূপা জীব অণু-চিদানন্দময়। অংশীর স্বভাব অংশে, বিভুর স্বভাব অণুতে অল্পাকারেও প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাই অংশী পরমেশ্বরের ধর্ম্ম তদংশ জীবেও অণুপরিমাণে ব্যক্ত হইতেছে; সেই জন্যই পরমানন্দময় শ্রীভগবানের ন্যায় আনন্দময় জীবও আত্মবস্তু

বলিয়া, জীবও নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় হইয়া, নিজ আনন্দে আনন্দী হয় এবং আত্মানন্দকেই ভালবাসিয়া থাকে।

চিৎকণ জীবও আনন্দময় বলিয়া আত্মানন্দকেই ভালবাসে।

সুখময় আত্মায় প্রিয়তা ব্যতীত জীব অপর কোনও আত্মেতর বা অনাত্মবস্তুকে ভালবাসে না, বা ভালবাসিতেই পারে না। অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে, আত্মবস্তু ব্যতীত অনাত্ম বা জড়ীয় দেহ, গেহ, দারা, পুত্রাদি বিষয় সকল বাস্তবিকপক্ষে সুখকর হইতে পারে না, সুতরাং সেই সকল অনাত্মবস্তুকে প্রীতিকর বলাও সঙ্গত হয় না।

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, অনাত্ম বা জড় বিষয় সকল যাহা হইতে আমরা সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা 'সুখ' ও 'প্রিয়' না হইতে পারে, কিন্তু সুখের অতএব প্রীতির বিষয় বলিয়া তাহা 'সুখকর' ও 'প্রীতিকর' না হইবে কেন? অহিফেন নিজেই 'নিদ্রা' না হইলেও তাহা হইতে যখন 'নিদ্রা' প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অহিফেনকে 'নিদ্রাকর' বলিয়া উল্লেখ করা যেমন অসঙ্গত হয় না, তেমনি জড়বিষয় নিজেই 'সুখবস্তু' না হইলেও তাহা হইতে যখন সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বিষয়কে 'সুখকর' অতএব 'প্রীতিকর' বলিয়া মনে করা যে অসঙ্গত,—তাহারই বা হেতু কি হইতে পারে?

সুখ ও সুখকর, প্রিয় ও প্রীতিকর নির্ণয়।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অহিফেন নিজেই নিদ্রা না হইলেও নিদ্রাকারিতা যেমন অহিফেনেরই নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম বলিয়া অহিফেনকে 'নিদ্রাকর' বলা অসঙ্গত নহে; বৃক্ষই ফল না হইলেও, ফল যেমন বৃক্ষেরই নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম বলিয়া বৃক্ষকে 'ফলকর' বলা অসঙ্গত হয় না —অনাত্ম বিষয় হইতে আমরা যে সুখ—যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা জড়ের নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম নহে বলিয়া, এই জন্যই অনাত্ম-বিষয়মাত্রকে 'সুখকর' ও

জড়ীয় বিষয়-সুখের সুখধর্ম্ম জড়ের নিজস্ব নহে।

'প্রীতিকর' বলিয়া উল্লেখ করাও সুসঙ্গত হয় না ; যদি বৃক্ষফলের ন্যায় বিষয়সুখ অনাত্ম-বিষয়ের স্বধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সুখের বিষয় সকলকে অবশ্যই 'সুখকর' ও 'প্রীতিকর' বলিয়া বুঝায় দোষ ছিল না ; কিন্তু সুখ বা আনন্দ, অনাত্ম বা জড়ীয় বস্তুর নিজধর্ম্ম না হওয়ায়, উহা সুখকরও নহে—সুতরাং প্রীতিকরও নহে। সুখ বা আনন্দ, আত্মবস্তুরই স্বভাব।

আত্মবস্তুই যুগপৎ সুখ ও সুখকর প্রিয় ও প্রীতিকর।

যাহা আত্মবস্তু, একমাত্র তাহাই সুখস্বরূপ হইয়াও সুখকর এবং তাহাই প্রিয় ও প্রিয় হইয়াও প্রীতিকর ; অর্থাৎ যে বস্তু একাধারে যুগপৎ সুখ ও সুখকর প্রিয় ও প্রীতিকর তাহাই আত্মবস্তু। অনাত্ম-বিষয়ের যে সুখ-ধর্ম্ম, উহা জড়ের স্বধর্ম্ম না হওয়ায়, তাহা যে প্রিয় বা প্রীতিকর এই উভয়ের কিছুই হইতে পারে না, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে এ-কথা আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

জীব চিৎকণ সুতরাং জীব আত্মবস্তু বলিয়া তাহাকে জীবাত্মা কহে। উহা দেহাদির ন্যায় জড়বস্তু নহে। জড়বস্তুতে আত্মবস্তুর ন্যায় স্বধর্ম্ম ও প্রিয়তা না থাকায়, উহার অপর নাম অনাত্মবস্তু। আমরা, অবিদ্যা বশতঃ দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মার সন্ধান অবগত নহি বলিয়া, সেই চিদাত্মার পরিবর্ত্তে যেমন নিজ নিজ অনাত্ম দেহকে 'আমি' বা 'আত্ম' স্বরূপ মনে করি, তেমনি আবার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যাদির দেহাতিরিক্ত চিদাত্মার সহিত পরিচয় না থাকায়, তাহাদিগের জড়ীয়-দেহকেই 'আমার' বা 'আত্মীয়' জ্ঞানে, সেই অনাত্ম জড়পিণ্ড সকলকে সুখের বা প্রীতির বিষয় মনে করিয়া থাকি,—ইহা স্বরূপভ্রান্ত জীবের প্রতি মায়ার নিষ্ঠুর পরিহাস ! বস্তুতঃ চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত কোনও অনাত্ম-বিষয়ে সুখধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেই পারে না,—অতএব তাহা প্রিয় বা প্রীতিকরও হইতে পারে না। সুখ বা আনন্দ একমাত্র আত্ম-বস্তুরই নিজধর্ম্ম ; সুতরাং আত্মবস্তুই একাধারে যেমন সুখ ও সুখকর,

তেমনি সুখই প্রিয় বলিয়া, সুখময় আত্মবস্তুই আবার যুগপৎ প্রিয় ও প্রীতিকর।

জীব আত্মবস্তু—তাই জীবাত্মা সুখময়। জীবাত্মার সুখধর্ম্মের এতই প্রভাব যে, যদি কোন অনাত্ম বা জড়বস্তুতে আত্মসম্বন্ধযুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ হয়, তথাপি সেই সুখহীন অনাত্ম বিষয়ে আত্মার আভাস পতিত হওয়ায়, তাহাকেও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম বা যে লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাতে মিথ্যাবশতঃ সেই ধর্ম্মের যোজনা করাকেই 'আরোপ' কহে,—যেমন 'দোষারোপ'; অর্থাৎ যে দোষ যাহাতে নাই, তাহাতে মিথ্যা করিয়া সেই দোষের অপবাদ করার নাম 'দোষারোপ'। সেইরূপ অনাত্ম বিষয় সকলে অর্থাৎ যাহাতে সুখধর্ম্ম নাই সেই সকল জড়ীয় বিষয়ে অবিদ্যা বশতঃ 'অস্মিতা' বা অহং-মমাদি জ্ঞান, অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার আত্মসম্বন্ধ 'আরোপ' করিয়া আত্মার সুখধর্ম্মে তাহাদিগকে সুখকর ও প্রীতিকর মনে করাকেই অনাত্ম বিষয়ে আত্মবুদ্ধির আরোপ কহে। আত্মবস্তুর আনন্দ ও প্রিয়তার এতই প্রভাব যে, আত্মভাব আরোপিত অনাত্মবিষয়ও, সুখময় আত্মার সুখ-সম্বন্ধে সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে।

সুখময় আত্মার সুখাভাস সংস্পর্শে অনাত্মবস্তুও সুখকর ও প্রীতিকর বোধ হয়।

জলস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব উচ্ছলিত হইয়া কোনও জ্যোতিহীন পদার্থে নিপতিত হইলে, তাহাও যেমন জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহে প্রতিবিম্বিত আত্মভাব উচ্ছলিত হইয়া অপর কোনও অনাত্ম-বিষয়ের উপর পতিত হইলেও সেই সুখহীন বিষয়কে সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সুখ ও প্রিয়তা-ধর্ম্ম জড়বস্তুতে থাকে না; চিন্ময় মুখ্য আত্মার সম্বন্ধ বশতঃ জড়ীয় দেহে আত্মবোধ হইয়া আবার সেই দেহরূপ গৌণ-আত্মার সম্বন্ধ বা আত্মাভাস, অপর

অনাত্ম-বিষয়ে আরোপ করা হইলে, দেহের ন্যায় তাহাও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। সারমেয় যেমন রস-রক্তহীন শুষ্ক অস্থিখণ্ডকে বারম্বার চর্ব্বণ পূর্ব্বক উহাকে স্বীয় দশননিঃসৃত রুধিররাগে রঞ্জিত ও স্বীয় রসনা-নিঃসৃত লালাদ্বারা সিক্ত দেখিয়া, স্বীয় রস-রক্তাদিকেই যেমন শুষ্ক অস্থিখণ্ড হইতে প্রাপ্তবিষয় বলিয়া মনে করে, তেমনি অনাত্ম-বিষয় স্বরূপতঃ সুখহীন ও অপ্রিয় হইয়াও আত্মভাবের আরোপ হেতু—আত্মারই সুখধর্ম্ম ও প্রিয়তা দ্বারা পরিসিক্ত হওয়ায়, উহাকে সুখকর ও প্রীতিকর বোধ করাইয়া থাকে।

আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত বা আত্ম-ভাবের আরোপ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় সুখকর ও প্রীতিকর হয় না।

আত্মভাবের আরোপ বা আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় যে সুখকর ও প্রীতিকর হয় না—সুতরাং সুখ ও প্রিয়তা যে জড়ের নিজধর্ম্ম নহে, এ-কথা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মুখ্য আত্মা দেহে আরোপ করা হইলে, তখন দেহকেই 'আত্ম' বা 'আমি' বলিয়া বোধ হয়; আবার সেই দেহরূপ 'আমি' বা গৌণ আত্মার সম্বন্ধ, যে বস্তু বা যে বিষয়ে আভাসিত হইয়া থাকে—আত্মার সম্বন্ধ নিবন্ধন তাহাও 'আত্মীয়' বা আত্ম-সম্বন্ধীয় রূপে অনুভূত হওয়ায় আত্মপ্রায় সুখের ও প্রীতির বিষয় হইয়া উঠে; আত্মভাবকে 'আমি' ও আত্মীয়ভাব বা আত্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়কে আমরা 'আমার' বলিয়া থাকি। কোনও বস্তুতে 'আমার' বলিয়া বোধ না জন্মিলে, তাহা হইতে সুখলাভ করা কখনই সম্ভব হয় না, অতএব তাহা প্রীতির বিষয়ও হয় না; আবার যে বস্তুতে যে পরিমাণে 'আমার' বোধ সংযুক্ত হয়, তাহা সেই পরিমাণে প্রিয় হইয়া থাকে। মিষ্টহীন বস্তু মধুর দ্বারা সংলিপ্ত করিয়া সেবন করিলে তাহাও যেমন মিষ্ট লাগে, তেমনি অনাত্ম বিষয়ে 'আমার' বুদ্ধি বা আত্মীয়ভাব সংলিপ্ত হওয়াই তাহার মধুরতা ও প্রিয়তার কারণ।

আত্মসম্বন্ধ সংযোগ ব্যতীত, কোনও অনাত্ম বিষয় কাহারও নিকট মিষ্ট বা সুখকর ও প্রীতিকর হয় না ; এই জন্যই আমাদের নিকট যাহা কিছু 'আমার' তাহাই প্রিয় তাহাই মিষ্ট ; যাহা 'আমার' নহে,—তাহা মিষ্টও লাগে না ; সুতরাং প্রিয়ও হয় না। স্বামী, স্ত্রী, স্বদেশ, স্বজন, আহার, বিহারাদি কোনও বিষয় কাহারও প্রিয় হয় না, যে পর্য্যন্ত সেই সকল অনাত্ম বিষয়ের সহিত 'আমার' বা আত্মীয়বুদ্ধির আরোপ না হয়।

মকরন্দের মিষ্টতার মত, সুখ ও প্রিয়তা যদি স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্যাদি বস্তুর বা আহার বিহারাদি বিষয়ের নিজধর্ম্ম হইত, তবে ঐ সকল বিষয় সর্ব্বভাবে, সকল সময়ে ও সকলের নিকট প্রিয় হইতে পারিত ; কিন্তু যাহা কর্ত্তৃক উক্ত যে কোন বিষয়ে—যে কাল পর্য্যন্ত 'আমার' বা মমতা বুদ্ধির সংযোগ হইয়া থাকে, কেবলতাহার নিকট—সেই বিষয়—সেই কাল পর্য্যন্ত যখন প্রীতিকর হইতে দেখা যায়, তখন প্রিয়তা যে অনাত্ম বা জড়ীয় বিষয়ের স্বভাব নহে, এ-কথা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সকল জননীই নিজ নিজ পুত্রকে যে ভালবাসেন, নিজ নিজ পুত্রে মাতৃগণের 'আত্মীয়' ভাব বা মমতা সংবদ্ধ থাকাই তাহার কারণ ; এইরূপ পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি সকলের ও সকল বিষয়ের প্রতি ভালবাসার—আত্মীয়ভাবই একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। পুত্রাদিই যদি প্রিয়বস্তু হইত, তবে যে কোনও জননীর নিকট যে কোন পুত্র প্রিয় হইতে পারিত ; কিন্তু যে পুত্রে যে জননীর 'আমার পুত্র' এই প্রকার আত্মীয় ভাব বা মমতা সংবদ্ধ কেবল সেই পুত্র ব্যতীত সেই জননীর নিকট অপর কোনও পুত্র প্রিয় হয় না। আবার নিজসন্তানের প্রতি মাতার যে

অনাত্ম বিষয়ের প্রতি মমতা বা আত্মীয় ভাবের উদয় ও অনুদয়েই যখন উহা সুখকর ও অসুখকর বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে সুখ ও প্রিয়তা জড়ের ধর্ম্ম নহে—উহা আত্মারই স্বধর্ম্ম।

ভালবাসা দেখা যায়, সেই প্রিয়তা নিজ সন্তানের স্বভাবগত ধর্ম্ম হইলে সকল সময়ে ও সর্ব্বভাবে সেই প্রিয়তা পরিলক্ষিত হইত। সৌরভ মৃগমদের স্বভাব বলিয়া, উহা আঁধারে বা আলোকে যে কোন অবস্থায় আঘ্রাত হউক, তাহার সুবাসের ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু অন্ধকার গৃহমধ্যে জননী কর্ত্তৃক আপন সন্তানকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইবার পরক্ষণেই যদি উহাকে সপত্নী পুত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে, তবে নিজ সন্তান হইলেও তৎপ্রতি আত্মীয়ভাবের সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সেই নিজ সন্তানই আবার দূরে পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, এবং তদনুরূপ অবস্থায় বিপরীত ভ্রমবশতঃ আবার যখন বিমাতা কর্ত্তৃক 'আমার' বোধ প্রযুক্ত হওয়ায় সপত্নীপুত্রকেও স্নেহপরবশে বক্ষে তুলিয়া লইতে দেখা যায়, তখন সুখ ও প্রিয়তা বা ভালবাসাকে সুখময় আত্মার স্বধর্ম্ম না বুঝিয়া, উহা স্ত্রী পুত্রাদিরই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা যে কতদূর অবিদ্যার প্রতারণা, তাহা সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। যে-স্থলে স্বেচ্ছাপূর্বক বিমাতা কর্ত্তৃক সপত্নীর সন্তানকে যে পরিমাণ সস্নেহে পালন করিতে দেখা যায়—অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, সেই সন্তানের প্রতি বিমাতার তৎপরিমিত আত্মীয়ভাব বা 'আমার' বোধ অবশ্যই জাগ্রত আছে। এইরূপ ধন, ধান্য, গৃহাদি বিষয় সেই পর্য্যন্ত কাহারও নিকট সুখকর ও প্রীতিকর হয় না যে পর্য্যন্ত সেই সকল অনাত্ম বিষয়ের সহিত 'আমার' বোধ বা আত্মীয়ভাবের সম্বন্ধ না ঘটে। সুখ ও প্রিয়তা. ধন-ধান্যাদি বিষয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে যাহা নিজ অধিকৃত নহে, এমন অন্যের অধিকৃত ধন ধান্যাদিও সকলের পক্ষেই সমান সুখকর ও প্রিয় হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিজ অধিকৃত অবস্থায় যে অর্থাদি বিষয়কে আমরা সুখকর বোধ করিয়া যাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া থাকি; দান ও ব্যয় করিবার পর—অন্যের অধিকৃত অবস্থায় সেই অর্থাদির বৃদ্ধি বা বিনাশ-সংবাদে, আমরা তখন আর তাহার জন্য কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ অনুভব করি না। নিজ অধিকৃত

অবস্থায় যাহাকে কতই প্রিয় বোধ হইয়াছে—'মমতা বোধ ছিন্ন হওয়ায়, সেই একই অর্থ তখন আর তাহার নিকট প্রিয় নহে; যাহার শুভ চিন্তায় সারা রাত্রি নিদ্রা হইত না, পরায়ত্ত হইবার পর তাহার বৃদ্ধি বা বিনাশে এখন সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আবার একের ব্যয়িত অর্থাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে যাহার আত্মীয়ভাবের আরোপ অর্থাৎ 'মমতা' বা 'আমার' বোধ জন্মিয়াছে, এখন আত্মাভিষিক্ত বিষয়ের পাশে রাত্রি জাগিয়া সে-ই বসিয়া আছে,—উহা তাহারই নিকট এখন সুখ ও প্রীতির বিষয় হইয়াছে, সুখ ও প্রিয়তা যদি অর্থাদি বিষয়ের স্বধর্ম্ম হইত, তবে তাহা সকলের নিকট সকল অবস্থায় একই ভাবে প্রকাশিত হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া অনাত্ম বিষয়মাত্রকেই যখন আত্মীয়ভাবের সংযোগে প্রিয় ও বিয়োগে অপ্রিয় হইতে দেখা যায়, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র সুখময় আত্মাই সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া, সেই আত্ম সম্বন্ধ বা তৎসম্বন্ধাভাসও যাহার উপর প্রযুক্ত হয়, আত্মার সুখধর্ম্মেই তাহাকে সুখকর ও আত্মার প্রিয়তায় তাহাকে প্রীতিকর বোধ করাইয়া থাকে।

যাহা ধন, ধান্য' পুত্র, কলত্রাদির ন্যায় নিজস্ব অর্থাৎ স্বকীয় অধিকৃত বিষয় নহে,—এমন অনুকূল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি সাধারণ বিষয় সকলও যে, প্রাণী মাত্রের নিকট সুখকর ও প্রীতিকর হইতে দেখা যায় তাহারও মূলে প্রকারান্তরে আত্ম সম্বন্ধ বা 'মমতা' বুদ্ধি সংবদ্ধ আছে, ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে। সাধারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিশেষের প্রতি প্রাণী-বিশেষের ব্যক্তিগত মমতা-বৃত্তি অর্থাৎ 'অমুক যে আমি,—ইহা সেই আমার বস্তু'—এই প্রকার আত্মীয়ভাব না থাকিলেও, 'ইহা আমার শ্রবণীয় বিষয়'—'ইহা

যে বিষয়ে ব্যক্তিগত মমতা-বৃত্তি নাই, স্বভাবজা বা জাতিগত মমতা-বৃত্তি বশতঃই তাহা সুখের ও প্রীতির বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

আমার স্পর্শনীয় বিষয়'—'ইহা আমার দর্শনীয় বিষয়'—'ইহা আমার আস্বাদ্য বিষয়' অথবা 'ইহা আমার আঘ্রেয় বিষয়'—এই প্রকার একটি স্বভাবগত বা জাতিগত মমতা বৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ সেই সেই শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়, সেই সেই প্রাণী বিশেষের নিকট অনুকূল বোধ নিবন্ধন প্রিয় হইয়া থাকে; আবার শব্দ স্পর্শাদি যে যে বিষয়ে যে যে প্রাণী বিশেষের উক্ত প্রকার মমতা বৃত্তির বিকাশ নাই, সেই সেই বিষয়ে, সেই সেই প্রাণী বিশেষের নিকট প্রতিকূল বলিয়া বোধ হওয়ায় অপ্রিয় হয়। মনুষ্যের নিকট মনুষ্যোচিত আহার বিহারাদি বিষয়ে—'মনুষ্য যে আমি,—ইহা সেই আমার ভোগ্য বিষয়' এইরূপ জাতিগত মমতা-বৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃই উহা সুখকর ও প্রীতিকর বোধ হয়, তদ্রূপ মমতা-বৃত্তির অভাব নিবন্ধন সেই সকল বিষয়ই আবার মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট কোনও সুখের বা প্রীতির কারণ হয় না; আবার যে স্বভাবজ ও জাতিগত মমতা-বৃত্তির বিকাশে মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট শব্দ, স্পর্শাদি যে সকল বিষয় উপাদেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তৎ-স্বজাতীয় মমতা-বৃত্তির অভাব বশতঃ তাহাই আবার মনুষ্য জাতির নিকট হেয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। এই মমতা-বৃত্তির উদয় ও অনুদয় জন্যই বংশীধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে কুরঙ্গ ও ভুজঙ্গ তৎপ্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু বৃক ও শিবাদি পশুসকল পলায়ন করিয়া থাকে,—এই জন্যই অরুণালোক দর্শনে বিহঙ্গসকল পুলকিত হইলেও পেচক লুক্কায়িত হয়,—এই জন্যই ধূপের গন্ধে মনুষ্য সকল প্রফুল্লিত হইলেও মশককুল ব্যথিতই হইয়া থাকে। এইরূপ আত্ম-সম্বন্ধ বা মমতা-বৃত্তির উদয় ও অনুদয় জন্যই শব্দ, স্পর্শাদি যে কোনও বিষয় যে কোন প্রাণী বিশেষের নিকট যথাক্রমে প্রিয় ও অপ্রিয় হইবার কারণ হয়; অতএব একমাত্র আত্মবস্তু ভিন্ন আর কিছুই সুখের নহে, এবং আর কেহই প্রিয় নহে।

জলাশয়ের তরঙ্গ ও নিস্তরঙ্গ বশতঃ যেমন তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের

চঞ্চলতা ও স্থিরতা সাধিত হয়, সেইরূপ বিকারশীল দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবান্তর প্রাপ্তিতে, দেহনিবদ্ধ আত্মভাবে সুখ ও দুঃখ অনুভূত হয় বলিয়াই আমরা দেহের আরোগ্যাদি অনুকূলতা প্রাপ্তির ও পীড়াদি প্রতিকূলতা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়া থাকি; বস্তুতঃ এই প্রয়াস দেহের প্রীতিসাধন জন্য নহে,—আত্মাকে ভালবাসি বলিয়া আত্মার সুখাভাব নিবৃত্তির জন্যই আমরা দেহের প্রীতি সাধন করিয়া থাকি। আবার সেই আত্মভাব-সংবদ্ধ দেহের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে আত্মীয়ভাব বা 'আমার' বোধ জন্মে,—সেই স্ত্রী পুত্র ধন ধান্যাদি বিষয়কে সুখকর মনে করিয়া, সে সকল বিষয় যে ভালবাসিয়া থাকি, সেই ভালবাসা তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত হয় না,—আত্মাকে ভালবাসি বলিয়া উহা সেই প্রিয় আত্মার প্রীতির জন্যই জানিতে হইবে। আত্মা যদি সুখময় ও প্রিয় বস্তু না হইতেন, তবে কাহারও নিকট অপর কোনও বস্তুই সুখের ও প্রীতির বিষয় হইত না। আত্মসম্বন্ধ বশতঃ আত্মপ্রীতি সাধন কামনায় সমস্তই প্রিয় হইয়া থাকে। মায়াবিড়ম্বিত বহির্মুখ জীব আমরা,—আমাদিগকে সুখের ও ভালবাসার মূল কোথায় দেখাইয়া দিবার জন্য, জননী শ্রুতিদেবী আমাদের অন্তরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না; কেবল আত্মবস্তুই প্রিয় বলিয়া আত্মার প্রীতি সাধনের জন্যই সমস্ত প্রিয় হইয়া থাকে।

"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে ক্ষত্রস্য

কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ; আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥" (বৃহদারণ্যক উঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, অয়ে মৈত্রেয়ি ? জায়া পতির প্রীতি-সাধনের জন্য পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু কেবল আত্মার প্রীতিসাধনের জন্য পতিকে ভালবাসিয়া থাকে ; আবার পতি যে জায়াকে ভালবাসেন, তাহাও জায়ার প্রীতির জন্য নহে, কেবল আত্মার প্রীতি-সাধন নিমিত্ত। পুত্র সকলের প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়। বিত্ত সকলের প্রীতির জন্য বিত্ত সকল প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্ত সকল প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই ব্রাহ্মণ প্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রীতির নিমিত্তই ক্ষত্রিয় প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ক্ষত্রিয় প্রিয় হইয়া থাকে। জনগণের প্রীতির নিমিত্ত জনগণ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই জনসকল প্রিয় হয়। দেবতা সকলের প্রীতির নিমিত্ত দেবগণ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই দেবতা সকল প্রিয়। ভূত সকলের প্রীতির নিমিত্ত ভূত সকল প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই ভূতগণ প্রিয় হইয়া থাকে। কাহারও প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না ; আত্মাই প্রিয় বস্তু বলিয়া, কেবল আত্মার

প্রীতি-সাধনের জন্য সকলেই প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব সেই আত্ম-বস্তুকে সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে সাধু, গুরু ও শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিবে, পরে অনুকূল যুক্তিদ্বারা শ্রুত-বিষয় মনন করিবে, ও পরিশেষে সেই বিচারিত বিষয় নিরন্তর ধ্যান করিবে। উক্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়।

কস্তুরী-বাসিত বনভূমির সৌরভে উদ্‌ভ্রান্ত কস্তুরী-মৃগ, যেমন বৃক্ষ-লতা সকল আঘ্রাণপূর্ব্বক আকুল ও বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কিন্তু বুঝিতে পারে না, যাহার সম্বন্ধের আভাসমাত্র লাগিয়া বনের বিটপী-লতাও সুবাসিত হইয়াছে সেই সৌরভ তরু-লতাদির নিজধর্ম্ম নহে, উহা তাহার অন্তর-সঞ্চারিত মৃগমদেরই সুবাস; তেমনি সুখময় আত্মবস্তুর সুখ ও প্রীতি-সৌরভের সম্বন্ধাভাস মাত্রের স্পর্শ লাগিয়া, দেহ, গেহ, স্বদেশ, স্বজন, স্ত্রী, পুত্রাদি অনাত্মবস্তুও সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে,—যে সুখ-সৌরভের আঘ্রাণে জীবমাত্রেই বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল,—সেই সুখ ও প্রিয়তা যে অনাত্মবস্তুর নিজ ধর্ম নহে,—উহা যে জীব-দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মবস্তু বা অন্তরাত্মারই স্বভাব,—সে-কথা মায়া-বিমুগ্ধ জীব বুঝিতে পারে না।

যাহা সুখ—তাহাই প্রিয়—তাহাই ভালবাসার বস্তু, যাহা প্রিয় বা ভালবাসার বিষয়,—তাহাই সুখ। সুখ ও প্রিয়তা যুগপৎ পরস্পর-সাপেক্ষ বিষয়। 'সুখ' বলিতে সুখের সহিত প্রিয়তাকে ও 'প্রিয়' বলিতে প্রিয়তার সহিত সুখকে বুঝাইয়া থাকে, অতএব সুখময় আত্ম-বস্তু বা আত্মা ব্যতীত আর অন্য প্রিয় বিষয় যে কিছুই নাই, ইহা আমরা বুঝিলাম।

জীবাত্মা আত্মবস্তু হইলেও তদাশ্রয় ও তৎশক্তিমান্ পরমাত্মাই মূল আত্মবস্তু। মূল ব্যতীত শাখা পল্লবাদির যেমন পৃথক অস্তিত্ব নাই,

তেমনি পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মার অস্তিত্বই অসম্ভব। যেমন অগ্নিরই প্রভায় আলোকরশ্মি প্রভাম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রিয়তা ও সুখধর্মে জীবাত্মার প্রিয়তা ও সুখধর্ম প্রকাশ পাইয়া, তাহারই প্রতিবিম্বে ও প্রতিবিম্বাভাসে, অনাত্মবস্তুকেও সুখের ও প্রীতির বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। অনন্যাপেক্ষিরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান; অতএব তিনিই পরমাত্মবস্তুর পরমাবস্থা। যে জীবাত্মার সম্বন্ধে বা তদাভাসে দেহ গেহাদি অনাত্মবিষয় সকলও প্রিয় হইয়া উঠে, সেই জীবাত্মা আবার যাঁহার প্রিয়তায় প্রিয় হইয়া থাকেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই পরমাত্মবস্তুর পূর্ণতমভাব; অতএব আত্মানাত্ম সকল বিষয়ের—সকল প্রিয়তার জীবাত্মাই মূল কারণ নহেন,—সর্ব্বকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রিয়তার মূল উৎস। সকল প্রিয়তা সকল ভালবাসা যাঁহা হইতে উৎসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে প্রিয় ও মধুময় করিয়া তুলিতেছে,—সেই পরম রসময়—পরম মাধুর্য্যময়—পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন প্রিয়তম আর কিছুই নাই। নিখিল প্রিয়তার সেই পরম কারণকেই নির্দ্দেশ করিয়া, তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণই মূল-পরমাত্মবস্তু। তদীয় সম্বন্ধেই সমস্ত প্রিয় হয় বলিয়া তিনিই প্রিয়তম।

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা—' (বৃহদারণ্যক উ ১।৪।৮)

অর্থাৎ এই পরমাত্মা, সকল বস্তু হইতে অন্তরতর; অতএব ইনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, এবং অপর সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর। অতএব তিনিই প্রিয়তম। স্মৃতিও বলেন,—

প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্যঃ পরঃ প্রিয়ঃ।

(শ্রীভা ১০।২৩।২৭)

অর্থাৎ যাঁহার প্রিয়তার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র

ও ধনাদি বিষয় সকল প্রিয় হইয়া থাকে, তাঁহা হইতে আর অন্য কে প্রিয় আছে ?

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত জড় বা অনাত্ম-বিষয়ে যখন প্রিয়তা ও সুখধর্ম্ম নাই, তখন ভগবত্তার পূর্ণতম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের পরম কারণ ও আত্মবস্তুর পরম আশ্রয় ও পরাবস্থ বলিয়া,—তিনিই পরমানন্দ ও পরমপ্রিয় হইতেছেন। সমস্ত সাতিশয় সুখ ও প্রিয়তা, যাঁহার পাদাব্জপ্রান্তে বিশ্রামলাভ করিয় নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সমান বা অধিক প্রিয় আর কেহই নাই। তিনি ধন-রত্নাদি হইতে প্রিয়,—তিনি পুত্র-কলত্রাদি হইতে প্রিয়, তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে প্রিয়,—তিনি প্রাণ হইতে প্রিয়,--তিনি আত্মা হইতেও প্রিয় পরমাত্মার পরমাবস্থা তিনি ; অতএব তাঁহা হইতে প্রিয়তম আর কে থাকিতে পারে ? যেখানে যাহা কিছু প্রিয় সমস্তই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বা তৎসম্বন্ধ-পরম্পরায় প্রিয় হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত-রূপে জানিতে হইবে। কার্য্য অপেক্ষা কারণের প্রিয়তাধিক্যই সেই সকল প্রিয়তার পরম কারণ—কৃষ্ণ-প্রিয়তমকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কমল-বিকীর্ণ সুঘ্রাণ যেমন কমলের সন্নিধান ও ব্যবধান অনুরূপ ক্রমশঃ স্ফুটতর বা ক্ষীণতর হইতে দেখা যায়, সেইরূপ প্রিয়তম গোবিন্দ-তামরসের প্রীতি সৌরভে সমস্তই প্রিয় হইলেও, তদীয় প্রীতি-সম্বন্ধের সন্নিধান ও ব্যবধান অনুরূপ বিষয় সকলে যথাক্রমে প্রিয়তার আধিক্য অথবা তাহা ন্যূনতা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যবহার-জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ যে, লোকের আত্মাতে যে প্রীতি হইয়া থাকে, সেরূপ প্রীতি আত্মা অধ্যুসিত দেহে হইতে দেখা যায় না। আত্মবুদ্ধির আরোপ সত্ত্বেও, যখন আত্মার সুখের প্রতিকূল ভাবাপন্ন দেহকে প্রয়োজনবোধে ত্যাগ করিয়াও, সেই ত্যক্তা আত্মার সুখ-পোষণ

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের নৈকট্য ও দূরত্বই বিষয় সকলের মধ্যে প্রিয়তার ন্যূনাধিক্যের কারণ।

প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তখন দেহ হইতেও যে আত্মা অধিক প্রিয়, ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না। আবার সেই অহঙ্কারাস্পদ দেহে যে প্রীতি দেখা যায়, সেরূপ প্রীতি মমতাস্পদ পুত্র-কলত্রাদিতে দেখা যায় না; কারণ যাহা স্বভাবতঃ প্রিয়বস্তু—সেই আত্মার সহিত স্ত্রী-পুত্রাদির যত ব্যবধান, দেহ তদপেক্ষাও নিকট-সম্বন্ধীয় বিষয়। আবার সাধারণতঃ পুত্র-কলত্রাদিতে লোকের যে প্রীতি দেখা যায়, তেমন প্রীতি ধন-রত্নাদিতেও দৃষ্ট হয় না; যে-হেতু আত্ম-সম্বন্ধ বা আত্মীয়-ভাব, পুত্রাদি হইতেও বিত্তে অধিকতর ব্যবধানপ্রাপ্ত; আবার বিত্তে যে প্রীতি দেখা যায়, সেরূপ প্রীতি যান-বাহনাদি বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয় না। আত্ম-সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্বই বিষয় সকলে প্রিয়তা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও ক্ষীণতর অনুভূত হইবার কারণ। যদি তাহাই হইল, তবে এতাদৃশ প্রিয় জীবাত্মারও যিনি আশ্রয় ও কারণ—সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতেও প্রিয়তর এবং সেই পরমাত্ম-স্বরূপের পরিপূর্ণভাব যিনি, সেই সকল আনন্দ ও প্রীতির পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র প্রিয়তম বস্তু হইতেছেন,—ইহাও উপলব্ধি করিবার বিষয়।

ব্যবহার জগতে যে তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, পারমার্থিক জগতে তাহাই পরিস্ফুটরূপে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। গুণাতীত—চিদানন্দময় ধামে ব্রজবাসিগণ নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং পূর্ণানন্দে নিমগ্ন। সেখানে অনাত্মভাবের গন্ধমাত্রও নাই,—সেখানে সকলই সুখস্বরূপ—সমস্তই আত্মভাব বা চিদ্বিলাসময়। চিন্ময় জগতের সকল বিষয়ই এক চিদানন্দরস বলিয়া, তথায় দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি সমস্তই পরমানন্দরূপে অনুভূত হইলেও, আবার সেই স্বরূপ বা চিচ্ছক্তিরও পরমাশ্রয় ও পরমকারণ যিনি—সেই রসঘন শ্রীনন্দনন্দন-কৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের সর্ব্বদাই কোনও এক প্রগাঢ়তম প্রীতি-বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যাহা দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি অপর কোন বিষয়েও দেখা যায় না;

—স্বরূপ-বৈভব হইতে স্বরূপ-শক্তিমানের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে জানা যায়, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রজের বৎস ও বালকগণ অপহৃত হইলে, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই বৎস ও বালকরূপে প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাকে বিমোহিত করেন। এই প্রকারে বৎসর-কালাবধি সেই সেই বৎস ও বালকরূপধারী—সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, নিজেই আপনা কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৎস ও বালকরূপ আপনাকে পালন পূর্ব্বক বনে ও গোষ্ঠে ব্রহ্মাদি মোহনকারী পরমাশ্চর্য্য লীলা করেন। পূর্ব্বে ব্রজবাসী গো ও গোপীদিগের নিজ নিজ বৎস ও বালক অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যে সর্ব্বাধিক স্নেহ ছিল, ব্রহ্মমোহনকালে স্বপুত্রে ও স্ববৎসে কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহাধিক্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া, ইহার কারণ জীব-জগতকে সুবিদিত করাইবার জন্য, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীশুকদেবকে সংশয়চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মণ! (১০ম স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে) আপনি যে নিজ নিজ পুত্র হইতেও পরোদ্ভব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের স্নেহাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন, সেই বাক্যে আমার আশঙ্কা হইতেছে এই যে, সংসারে অতি গুণবান পরপুত্র হইতে গুণহীন নিজ পুত্রে প্রীতির আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রজবাসিগণের স্ব স্ব পুত্রের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, সেই ব্রজবাসিদিগের তাদৃশ প্রেম, ব্রহ্মমোহন-কালে বৎস ও বালকরূপধারী পরোদ্ভব কৃষ্ণে কেন পরিলক্ষিত হইল, ইহাই বর্ণন করুন।

শ্রীভাগবতীয় বিচারে ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়।

ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব, আত্মারই প্রিয়ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণেরই পরমাত্মত্ব সম্বন্ধে যে পরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এ-বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বোক্তি সকলের শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ-স্বরূপ জীবের চির-স্মরণীয় সেই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ৫০ হইতে ৫৭ শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে নৃপ! প্রাণিমাত্রের স্বীয় আত্মাই একান্ত প্রিয়। আত্মা হইতে অপর যে পুত্র-বিত্তাদি বিষয় সকল,—তাহারা সেই আত্মার প্রিয়তাহেতুই প্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতঃ প্রিয় নহে—ইহা স্থির।

তদ্‌রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥

হে রাজেন্দ্র! এইহেতু প্রাণিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যে স্নেহ দেখা যায়, মমতাস্পদ পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতেও তেমন স্নেহ দেখা যায় না।

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥

(চিদাত্মার স্বরূপ অবগত না হইয়া দেহকেই আত্মা মনে করিয়া থাকে, এরূপ অবিবেকী যাহারা) এতাদৃশ দেহাত্মবাদী ব্যক্তিরও নিকট সেই অহঙ্কারাস্পদ দেহটিই যেমন প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, দেহসম্বন্ধীয় পুত্র-বিত্তাদি মমতাস্পদ বিষয় সকল নিশ্চয়ই তেমন প্রিয় হয় না।

[উক্ত শ্লোকে 'রাজন্যসত্তম'—রাজাকে 'সত্তম' বলিয়া সম্বোধন করিবার হেতু এই যে, যে সকল রাজা দেহ-গেহাদি অনাত্মবিষয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে তাহারা 'অসন্ত' অর্থাৎ অসৎ; যাঁহারা তদধিক জীবাত্মার স্বরূপমাত্রই অবগত, তাঁহারা 'সন্ত' বা সৎ; যাঁহারা অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ পর্য্যন্তই বিদিত, তাঁহারা 'সত্তর'; আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরিজ্ঞাত তাঁহারাই 'সত্তম'। হে রাজন্! তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ-কারণত্ব পরিজ্ঞাত; অতএব তুমিও সত্তম।]

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥

(দেহাত্মবাদীর পক্ষে দেহই 'আমি' বলিয়া উহাই প্রিয়তম হইলেও) যদি কদাচিৎ ঈষৎ বিবেকোদয় বশতঃ উহা মমতাস্পদ অর্থাৎ 'আমার' বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তখন সেই দেহ আর আত্মতুল্য প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্ম-সম্পর্কেই প্রিয় হইয়া থাকে ; যে-হেতু সেই দেহ রোগাদি-কর্ত্তৃক জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, মরণযন্ত্রণারূপ অধিকতর ক্লেশভোগ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায়, সেই ত্যাগোপযোগী জীর্ণ দেহেও অবস্থানেচ্ছা বলবতীই হইয়া থাকে ; অথবা দেহের জীর্ণতা নিমিত্ত আত্মাকে নিরন্তর তৎসঙ্গ-বশতঃ ক্লিষ্ট হইতে দেখিয়া, দেহ হইতেও প্রিয়তর আত্মার ক্লেশনিবারণার্থ, সেই দেহধারণেচ্ছা 'অবলীয়সী'—অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অবলবতীই হইয়া থাকে,—ইহাই তাৎপর্য্য ।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥

অতএব নিখিল প্রাণিগণের আত্মাই প্রিয়তম ; যে-হেতু দেহ, অপত্য, বিত্ত, ঘট, পটাদি চরাচর সমস্ত জগৎ, আত্মার প্রীতির কারণেই প্রিয় হইয়া থাকে ।

[হে রাজন্ ! এখন যদি বল, দেহাতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইতেছেন—বুঝিলাম বটে, কিন্তু ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সেইরূপ প্রিয়তম হইলেন ?—ইহাই আশঙ্কা করিয়া শ্রীশুকদেব নিজেই বলিতেছেন—]

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

তুমি এই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে নিখিল প্রাণিদিগের আত্মারও পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও । তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গল নিমিত্ত নিজ অবিচিন্ত্য ইচ্ছা ও কৃপাশক্তি দ্বারা এই জগতে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন । বস্তুতঃ তাঁহার এই প্রকাশ, কর্ম্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহে ।

[শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে নিখিল জীবাত্মারই পরমাশ্রয় তাহা নহে, অন্তে সমস্ত জড়বস্তুর এবং আদিতে শ্রীনারায়ণাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপ সকলেরও পরমস্বরূপ, তাহাই বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরম কারণত্ব বলিতেছেন ;—]

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥

এই জগতে তত্ত্বতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহানুভবদিগের পক্ষে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত শ্রীনারায়ণাদি ভগবদ্রূপ সকল শ্রীকৃষ্ণরূপের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অধিক কি তাঁহাতে যে বস্তু নাই—সংসারে এমন কোনও বস্তুর সত্তাই নাই।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥

হে রাজন্! স্থাবর জঙ্গম অথবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদান-কারণেই অবস্থিত। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎ-সর্ব্বশক্তিমান্—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে তাহা নিরূপণ কর,—অর্থাৎ কিছুই নাই জানিও।

যিনি স্বতঃই পরমানন্দ-স্বরূপ ও পরম প্রিয়,—অখিল আনন্দ ও ভালবাসার যিনি পরমকারণ, সকল সুখধারা—সকল প্রীতিধারা—যে উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া চরাচর নিখিল বিশ্বকে সুরসিত ও সঞ্জীবিত করিতেছে,—সেই রসঘন শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দের পরিবর্ত্তে আমরা যে বিষয়ানন্দ অনুসেবন করিতেছি—পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমকে ভাল না বাসিয়া আমরা যে অনাত্মবিষয় সকলকে ভালবাসিতেছি, ইহারই নাম 'বহির্মুখতা'। আত্মবিস্মৃত জীব যখন অনাত্ম বা জড়ীয় ভাবের সান্মুখ্য প্রাপ্ত হয়,

তখন জড়দেহকেই 'আত্মা' বা 'আমি' মনে করায়, সেই জড়দেহ-সম্পর্কীয় জড়ীয় বিষয় সকলে 'আমার' বা 'আত্মীয়' বুদ্ধি জাগিয়া উঠে।

জীবের বৈমুখ্য ও সাম্মুখ্য লক্ষণ।

চিদাত্ম-জীবের এই যে জড়াত্মতা—স্বরূপ-ভাবের বিপরীত এই যে বিরূপতা—ইহাই জীবের জড়-সাম্মুখ্য; এবং এই জড়-সাম্মুখ্যও আবার সংসারী জীবের অনাদিসিদ্ধ। বহির্মুখতার অর্থ চিদ্-বৈমুখ্য। জড়-সাম্মুখ্য ঘটিলেই চিদ্-বৈমুখ্য অনিবার্য্য, যে-হেতু উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাশ্রয়। যেখানে যে পরিমাণ জড়-সাম্মুখ্য, সেখানে সেই পরিমাণ চিদ্-বৈমুখ্য এবং যেখানে যে পরিমাণ চিদ্-বৈমুখ্য, সেখানে সেই পরিমাণ জড়-সাম্মুখ্য বশ্যই বিদ্যমান থাকিবে; আবার চিদ্-সাম্মুখ্য বা চিদ্ভাবের সম্মুখতা ঘটিলেই সেই পরিমাণে জড়-বৈমুখ্য বা জড়ে বিমুখতাও অবশ্যম্ভাবী। উত্তর ও দক্ষিণদিক্ পরস্পর বিপরীত-স্থিত হওয়ায়, যেমন কাহারও উত্তরসাম্মুখ্য বা উত্তরদিক্ সম্মুখবর্ত্তী হইলেই দক্ষিণদিক্ পশ্চাদ্বর্ত্তী বা দক্ষিণবৈমুখ্য—এই উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হয়, তেমনি জীবের চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্য, অথবা জড়-বৈমুখ্য ও চিদ্-সাম্মুখ্য উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে।

চিদ্-বৈমুখ্যের নামান্তর 'ঈশ-বহির্মুখতা' বা প্রকৃষ্টরূপে 'কৃষ্ণ-বহির্মুখতা'। কৃষ্ণ-বহির্মুখতা ঘটিলেই, জীবের পক্ষে জড়-সাম্মুখ্য অনিবার্য্য। জড়শক্তি বা মায়া রচিত অবিদ্যাদির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দুঃখ বহুল সংসারাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হওয়াই জড়-সাম্মুখ্যের অলঙ্ঘনীয় ফল; কৃষ্ণ-বৈমুখ্য ও মায়া-সাম্মুখ্য যুগপৎ সংঘটিত বলিয়াই, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে তাই উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ (মধ্য ২০।১০৪)

কৃষ্ণ-বহির্মুখতা নিবন্ধন জীবের জড় বা মায়া-সাম্মুখ্য উপস্থিত হইলে তখন মায়িক বা জড়বিষয় ব্যতীত, চিন্ময়-বিষয়ের কোন অনুভূতি থাকে

না ; অতএব তৎকালে স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়পটে চিৎসত্তার পরিবর্ত্তে দিগন্ত বিস্তৃত উষর-ভূমির মত,—এক বিরাট্ জড়সত্তা জাগিয়া উঠে। এই জড়তার করাল ব্যাদনগ্রস্ত জীবের স্বরূপ বা চিদাত্মভাব বিলীন হইয়া, তৎস্থলে জড়াত্মভাবের এক বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রই অবশেষ থাকে,—যাহাকে 'জীবের জড়ত্ব' ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। নিত্য ও চিন্ময় জীব—কোন কালে কোন অবস্থায় তাহার একান্ত বিনাশ সম্ভব নহে বলিয়াই, অনাদিকালের জড়তার প্রবল সংঘর্ষণ মধ্যেও বিলোপ না হইয়া, জড়াবরণের অন্তরালে বিলীন থাকায়, উহাতে জড়ের-ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ইহারই নাম জীবের 'কর্ম্ম-জড়ত্ব' অথবা স্বধর্ম্মচ্যুত জীবের বিরূপতা।

জীবের জড়াবস্থা বা জড়াত্মবোধের লক্ষণ।

জীব জড়তাদাত্ম্যরূপ বিরূপভাব প্রাপ্ত হইলেই তৎসহ যুগপৎ জড়াত্ম ও জড়াত্মীয়-বুদ্ধির সংযোগ ঘটে এবং চিতাত্ম ও চিদাত্মীয় বোধ বিলীন হইয়া যায়। তৎকালেও চিদ্ বা আত্মবস্তুর সুখ ও প্রিয়তা-ধর্ম্মের ম্লান আভাস, দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি জড়স্তূপের অভ্যন্তর হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। বিরূপতাপ্রাপ্ত-জীবের তদবস্থায় চিদ্ভাবের কোনও সন্ধান থাকে না বলিয়া, চিদাত্মার সেই সুখাভাসকে জড়ীয় দেহ গেহাদি বিষয়েরই স্বধর্ম্মরূপে আরোপ করিয়া, জীব তৎসেবনে অভিনিবিষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সেই জীবের পক্ষে তৎকালে দেহাতিরিক্ত চিদানন্দের অনুভব-সামর্থ্য না থাকায়, দেহকেই 'প্রিয়তম' এবং দেহের নিকটতর ও নিকট-সম্বন্ধীয় পুত্র-কলত্রাদিকে 'প্রিয়তর' ও ধন-ধান্যাদি বিষয়কে 'প্রিয়' বলিয়া বোধ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহাই জীবের বিরূপভাব বা জড়াবস্থা। সম্পূর্ণ চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্যই ইহার কারণ।

আবার যখন সেই একান্ত জড়ভাবাপন্ন জীবের সাময়িক বিবেকাদি-বশতঃ অহঙ্কারাস্পদ দেহ, মমতাস্পদ হইয়া দেহাতিরিক্ত আত্মবস্তুর

জীবের চিদ্-জড়াবস্থা।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই জীবের তটস্থভাব বা চিদ্-জড়াবস্থা বলা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ পরিমিত চিদ্-সাম্মুখ্য ও জড়-বৈমুখ্য ঘটিলেই এই অবস্থার উদয় হইয়া থাকে।

জীবের চিদবস্থা, পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে ত্রিবিধ।

মহৎকৃপাদি অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে যখন জীব ক্রমশঃ চিদ্-সাম্মুখ্য ও জড়-বৈমুখ্য প্রাপ্ত হয়, তখন 'জড়ানন্দের' পরিবর্ত্তে 'চিদানন্দ' গ্রাহ্য হইয়া থাকে; ইহাই জীবের স্বরূপ-ভাব বা চিদবস্থা। জীবের এই চিদবস্থা বা স্বরূপতা, আবার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমভাব প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে পরমাত্ম, ভগবৎ ও স্বয়ং ভগবৎ বা শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য ঘটিয়া থাকে।

প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, পরম ত্মা প ত্রিবিধ প্রকাশ।

এক অখণ্ড চিদ্বস্তু বা জ্ঞানতত্ত্বই চিদ্-সাম্মুখ্য প্রাপ্ত জীবের ভাব-তারতম্যানুসারে যথাক্রমে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবদ্রূপে' প্রকাশমান হইয়া থাকেন। যাঁহার ভাব যাদৃশ, তদনুরূপ প্রকাশই তৎ-সমীপে সর্ব্বোত্তম বলিয়া অনুভূত হইলেও, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যেও আবার তারতম্য লক্ষিত হইতে পারে।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

(শ্রীভাগবতে ১।২।১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্গণ এক অখণ্ড-চৈতন্যবস্তু বা অদ্বয়জ্ঞানকে 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। অদ্বয়জ্ঞানরূপ তত্ত্ব যখন নির্ব্বিশেষরূপে প্রকাশ পান, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গযোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইলে ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন।

একই অখণ্ড-চিদ্বস্তু বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের প্রকাশভেদ যে, কেবল চিদ্-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীবের অধিকার তারতম্য ক্রমেই সংঘটিত হইয়া থাকে,—কাব্য বর্ণিত, সুদূর আকাশ-পথ হইতে দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় অবতরণ, এই বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ;—

চন্মাত্বিষামিত্যবধারিত
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ। (শিশুপালবধ-কাব্য ১/৩)

অর্থাৎ দ্বারকাবাসিগণ প্রথমে দেখিতেছেন, একটি তেজঃপুঞ্জ মাত্র ; আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, আকৃতি দর্শনে তখন কোনও শরীরী বা দেহধারী জীব বলিয়া নির্ণয় করিলেন ; তদনন্তর আরও নিকটবর্ত্তী হইলে করচরণাদি অবয়ব দর্শনে, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইল ; এবং সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী হইলে অবশেষে তাঁহাকেই নারদ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

একই নারদ যেমন দর্শকের দর্শন করিবার অধিকারানুরূপ যথাক্রমে 'জ্যোতিঃ' 'শরীরী' 'পুরুষ' ও 'নারদ',—প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধপ্রকাশ-ভেদে পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সম্মুখবর্ত্তী হইলেও, দর্শকের দর্শনের যোগ্যতানুসারে উহা যথাক্রমে 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' 'ভগবান্' ও সেই ভগবদ্ভাবের পূর্ণতম-স্বরূপ 'স্বয়ংভগবান্' —প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ প্রকাশভেদে পরিদৃষ্ট হয়েন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', (ভা° ১।৩।২৮) কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও শ্রীনারায়ণাদি নিখিল ভগবন্মূর্ত্তি সকল শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশভেদ মাত্র।

শক্তিমৎ শ্রীভগবানের চিন্মহিমা বা চিজ্জ্যোতিরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ 'ব্রহ্ম' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ('মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি

শব্দিতমিতি'—ভা° ৮।২৪।৩৮)। জীব চিচ্ছক্তি-কণ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে চিদংশে অভিন্ন-বিধায়, অদ্বৈতজ্ঞানিগণের চিদ্-সাম্মুখ্য লাভ হইলে, নির্ব্বিশেষ অখণ্ড-ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছুই উপলব্ধি না হওয়ায়, তৎকালে তাঁহাদের জীবাত্মার পৃথক সত্তাও আর গ্রাহ্য হয় না। এক অখণ্ড ও বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত, তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ব্রহ্মদর্শীর নিকট অন্য কোনও বিশিষ্টতা প্রতিভাত না হইয়া, সকল বৈশিষ্ট্য উহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অনুভূতি বৈশিষ্ট্য।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের ভগবদ্রূপ যে সবিশেষ প্রকাশ,—উহা নির্ব্বিশেষ প্রকাশ বা ব্রহ্মের ন্যায় চিদ্-সত্তামাত্র না হইয়া, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-স্বরূপ হওয়ায়, ('ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—গীতা ১৪।২৭) ঘনীভূত শক্তিমৎতত্ত্বই হইতেছেন। শক্তিতত্ত্ব জীব হইতে শক্তিমৎ তত্ত্বের বিশিষ্টতা বশতঃ বিভিন্নাংশ জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব নিত্যই বিদ্যমান থাকে এবং আশ্রয় ও আশ্রিত,—সেব্য ও সেবকরূপ মধুর সম্বন্ধ-বন্ধনে ঈশ্বর ও জীব চিরবদ্ধ হইয়া থাকেন। তেজোমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ হইলেও, তৎ-প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সূর্য্যমণ্ডল যেমন সবিশেষ ও সবিগ্রহ, সেইরূপ 'ব্রহ্ম' নির্ব্বিশেষ প্রকাশ হইলেও, তদাশ্রয় ভগবৎ-প্রকাশকে সবিশেষ ও সবিগ্রহই জানিতে হইবে। অন্তর্যামী পরমাত্মাও শ্রীভগবানের আংশিক সবিশেষ প্রকাশ ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব বলিয়া, পরমাত্ম-সাম্মুখ্যেও শক্তিস্থানীয় জীবের পৃথক সত্তার বিদ্যমানতা অনিবার্য্যই হইতেছে।

ভগবৎ-সাম্মুখ্যের পূর্ণতম অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য; ('কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।) চিদ্-সাম্মুখ্যের গতি এইখানেই বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শক্তিমৎতত্ত্বের পরাবস্থ বা পূর্ণতম স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। নিখিল শক্তিমৎ-তত্ত্বের পরাবস্থ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের চিদ্-জ্যোতিঃ

ঈশ-সাম্মুখ্যের পরমাবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য।

বা চিদ্-বিভূতিই নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম' আখ্যায় উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরিতামৃতকার তাই লিখিয়াছেন,—

'তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে যাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥' (আদি ২।৮)

জীবের জড়-বৈমুখ্য ও চিদ্-সাম্মুখ্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, তখন অনাত্ম বা জড়বিষয়ে আরোপিত প্রিয়তা, জড়াবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধ ও স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণতম স্বরূপতা-প্রাপ্ত জীবের নিকট, শ্রীকৃষ্ণই 'প্রিয়তম', তদেকাত্ম অন্তর্যামীত্যাদি স্বরূপ সকল 'প্রিয়তর' ও জীবাত্মা 'প্রিয়' বলিয়াই অনুভূত হয়েন।

জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত-ভেদে পরতত্ত্বের অনুভূতি পার্থক্য।

নির্ব্বিশেষ চিদ্-জ্যোতির অভ্যন্তরস্থিত—চিদ্বিলাস পরিমণ্ডিত—চিদানন্দঘন সবিশেষ প্রকাশ—জ্ঞানাধিকার সীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত; সুতরাং 'প্রিয়' স্থানীয় যে নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতি মাত্র,—তাহাই অদ্বৈতজ্ঞানিগণের নিকট 'প্রিয়তম' বা পরমানন্দ-তত্ত্ব। আবার নির্ব্বিশেষ চিদ্-জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া, তদন্তর্গত সবিশেষ শক্তিমৎ-তত্ত্বের সাম্মুখ্যলাভে যোগাধিকারী সমর্থ হইলেও, সবিগ্রহ পূর্ণ-শক্তিমৎ তত্ত্বের আংশিক প্রকাশ বা অন্তর্যামী স্বরূপ পর্য্যন্তই অষ্টাঙ্গ-যোগিগণের অধিকার-সীমা; সুতরাং 'প্রিয়তর' স্থানীয় পরমাত্মাই তাঁহাদের নিকট 'প্রিয়তম' বা পরমানন্দ-তত্ত্ব।

পরমাত্মার পূর্ণতম স্বরূপই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণই নিখিল আনন্দ ও প্রীতির মূল-কারণ; অতএব তিনিই হইতেছেন 'প্রিয়তম'। একমাত্র অমলা রাগভক্তির অধিকার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সাম্মুখ্য লাভ করা যায়। স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নালোকের সংস্পর্শ ব্যতীত অপর কোন আলোকের সমক্ষে যেমন কুমুদিনীর বিকাশ অসম্ভব, সেইরূপ কেবল শুদ্ধ-ভক্তগণের ভক্তি-চন্দ্রিকালোকের সমক্ষেই

শ্রীগোবিন্দরূপ ইন্দিবরের প্রকাশ হইয়া থাকে। 'প্রিয়তম'কে 'প্রিয়তম' বলিয়াই চিনিতে পারিবার যোগ্যতা কেবল শুদ্ধ-রাগভক্তগণেরই প্রাপ্য-বিষয়; সুতরাং পরমানন্দের পরমকারণ-স্বরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমকে 'প্রিয়তম' ও 'রসঘন' রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসহ, তৎ-সম্পর্কীয় 'প্রিয়' ও 'প্রিয়তর' বিষয়-সকলেরও যথার্থ-স্বরূপ কৃষ্ণভক্তেরই অনুভবনীয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত তত্ত্বের সামঞ্জস্য ভূমি, এবং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই সকল তত্ত্বের সমাধান।

নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতির ঊর্দ্ধে সবিশেষ চিদ্-বিলাস একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বিষয়।

চিদ্-সাম্মুখ্য উপস্থিত হইলেও কেবল ভক্তির আলোক ব্যতীত নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতির ঊর্দ্ধে সবিশেষ চিদ্-বিলাস ও সবিগ্রহ চিদ্‌বিলাসীর সন্ধান, আর কিছুতেই মিলিবার সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, উপনিষদের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মদর্শী ঋষি, কোন ভাগ্যে ভক্তি কিরণকণার স্পর্শ লাভ করিবার পর নির্ব্বিশেষের অভ্যন্তরে সবিশেষের সন্ধান পরিজ্ঞাত হইয়া, শরণাগত ভক্ত ভাবেই প্রার্থনা করিতেছেন,—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥'

(বৃহদারণ্যক উ° ৫।১৫।১)

অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় আবরণদ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখ অর্থাৎ মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আবৃত রহিয়াছে। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎ-করণার্থ, তোমার ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

'ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং
কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।'

(বৃহদারণ্যক উ° ৫।১৫।২)

অর্থাৎ মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার রশ্মিসকল সংযত কর, তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে অতি মধুররূপ তাহা আমি তোমার প্রসাদে পরিদর্শন করি।

'কৃষ্ণভক্তি' বা পূর্ণতম চিদ্-সাম্মুখ্য দ্বারা জীব কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন সেই প্রিয়তমের সম্পর্কে কেবল যে আত্মবস্তুই প্রিয় হয় তাহা নহে,—আত্ম অনাত্ম নিখিল বিশ্ব-চরাচরই তৎকালে ভক্তের নিকট পূর্ণসুখ-স্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির উদয়ে, জীবের হৃদয়দ্বারের জড়ত্ব-অর্গল সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইবামাত্র, সেই পূর্ণ রসোৎস-উৎসারিত পরমানন্দের মধুর ধারা, জীবাত্মাকে পরিসিক্ত করিয়া, তাহার অন্তরের অনাবিল প্রদেশে প্রবাহিত হইতে থাকে,—যাহার প্রভাবে সকল ভুবন প্রেমময় ও মধুময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম 'ভক্তভাব' বা 'ভাগবতপদ'—ইহাই কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধ জীবের পরিপূর্ণ স্বরূপতা। এই অবস্থার উদয়ে জীবের নিকট 'বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে'—নিখিল বিশ্বই পূর্ণ-সুখস্বরূপে অনুভূত হয়; সুখ ব্যতীত—আনন্দ ব্যতীত তখন সে হৃদয়ে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোনও পদার্থ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। অনন্ত প্রেম ও মাধুর্য্যময় তদীয় প্রিয়তমের সম্বন্ধ-সিক্ত নিখিল ভুবনই যেন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠে। আর সেই সকল মাধুর্য্য ও প্রিয়তার উৎসরূপে তাহার মধ্যকেন্দ্রে দণ্ডায়মান যিনি, সেই বেণুবাদন-তৎপর গোপ-কিশোরের তরুণ তমাল হইতেও স্নিগ্ধ-শ্যামল শ্রীমূর্ত্তিখানিই নিজ প্রাণকোটি হইতেও অতি—অতি প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়। অন্ধকার আর যেখানেই থাকে থাকুক, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত মশালের সহিত যেমন তাহার কখনও সাক্ষাৎকার হয় না, সেইরূপ ভক্তির স্নিগ্ধালোকে যে হৃদয় একবার উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহার সহিত পরমানন্দ ব্যতীত আর কখন দুঃখাভাসেরও

ভক্তত্ব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তিতে জীবের পূর্ণানন্দের অনুভূতি।

সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ; ইহাই জীবের পরিপূর্ণ বা শুদ্ধ স্বরূপভাবে অবস্থিতি। ভক্তত্বই শুদ্ধ জীবের সেই পরিপূর্ণ স্বরূপতা। জীবের ভক্তত্ব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির অবস্থা বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর উ° ১।১১)

অর্থাৎ যিনি গুরু ও শাস্ত্র-প্রসাদে পরমেশ্বরকে বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না ; পাশ না থাকায়, তজ্জন্য কোন ক্লেশও থাকে না ; ক্রমে জন্মমৃত্যু নিবারিত হইয়া যায়। তাদৃশ পাশ-বিমুক্ত জীব, যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু গ্রহণও করেন, তাঁহাকে জন্মাদি নিমিত্ত দুঃখ অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের নিরন্তর স্মরণে লিঙ্গশরীরাদির বিনাশ হয়, এবং চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদ অপেক্ষা তৃতীয় যে, শুদ্ধসত্ত্বময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাকৃত-গন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবতপদ, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ভাগবতপদ-প্রাপ্তিতে সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

ভক্তি-সুখের তুলনায় অপর যে কোনও সুখ উপেক্ষনীয়।

জীবের পূর্ণতম স্বরূপভাব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির আনন্দ, লৌকিক ভাব ও ভাষার পক্ষে প্রকাশ করিবার কোনও সামর্থ্য না থাকায়, ইহা অচিন্তনীয় ও কেবল সাধন-গ্রাহ্য বিষয় বলিয়াই জানা আবশ্যক। ভাগবতপদ বা ভক্তি-সুখের কিঞ্চিৎ আভাস, শ্রীভগবানের নিজোক্তি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত প্রকারই বর্ণিত হইয়াছে ;—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা।
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ (ভা° ১১।১৪।১৪)

অর্থাৎ আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্ত, আমাকে ভিন্ন, অন্য ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব কিম্বা পাতালের আধিপত্য, অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি, কিছুই ইচ্ছা করেন না।

অধিক কথা কি,—ভাগবতগণ ভক্তি বা ভগবৎ-সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মায়িক ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোকাদির প্রাকৃত সুখ ত দূরের কথা—তৎ-সকাশে অপ্রাকৃত সালোক্যাদি ভগবত্তুল্য সুখও অল্প বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহাও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; তবে যে সকল ভক্তকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কেবল সেবা-সুখ প্রাপ্তির অনুরোধেই জানিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, জননী দেবহূতিকে নিজ মুখেই এই কথা বলিয়াছেন;—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৯।১৩)

(ভক্তি-সুখের কথা অধিক কি বলিব) হে জননি! নিষ্কাম ভক্তি-যোগিগণকে সালোক্য, (আমার সহিত একত্র বাস) সার্ষ্টি, (আমার সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য, (আমার সান্নিধ্য) সারূপ্য, আমার সমান রূপ) এবং একত্ব (সাযুজ্য) দিতে চাহিলেও, তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন এ সকলের কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না।

জড়-সাম্মুখ্য বা চিদ্-বৈমুখ্য অবস্থায়, সুখময় জীবাত্মার প্রতিবিম্ব ও আভাসের সংস্পর্শে অনাত্মবস্তু সকলে 'আত্মীয়' বুদ্ধির উদয়ে, জড়ীয় বিষয় সকল প্রিয় হয়; কিন্তু স্বরূপভাব-প্রাপ্ত জীবের ভগবৎ-সাম্মুখ্য বশতঃ দৃষ্টিরও স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে; সুতরাং তখন আত্মসম্বন্ধে কোনও বিষয় আর 'আত্মীয়' বা 'আমার' বলিয়া মনে হয় না; তখন স্থাবর

জঙ্গম,—বিশ্ব-চরাচর যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সমস্তই আত্ম-অনাত্ম সর্ব্ববিষয়ের মূল বা কারণ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ বা পূর্ণতম পরমাত্মার সম্পর্কে 'পরমাত্মীয়' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের' বলিয়া বোধ হওয়ায় পূর্ব্বের অবিদ্যা-বাধিত প্রিয়তা হইতে তাহা প্রিয়তরই হইয়া থাকে। জড়সাম্মুখ্য বা বিরূপতার অপনোদন এবং চিদ্-সাম্মুখ্য বা স্বরূপতার প্রাপ্তি নিবন্ধন, তৎকালে দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদাদি কোন বিষয়েই আর ভ্রান্ত 'আমার' বা 'আত্মীয়' বোধ থাকিতে পারে না;—তখন নিজেকেও যেমন 'তাঁহার' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বলিয়াই মনে হয়, তেমনি তৎসহ ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সৈকত, সিন্ধু, নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর ও কীটাণু হইতে ব্রহ্মা অবধি চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম—সেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় রূপে পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তখন সকলই 'শ্রীকৃষ্ণের' বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ও সেই চিরসুন্দর—চির-রসস্বরূপের সম্বন্ধে সকলই সুন্দর—সকলই মধুর ও সকলই পূর্ণ-সুখস্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। নব অনুরাগিণী কান্তার নিকট, তরুণ কান্তের সুখ-সম্বন্ধলিপ্ত তদীয় গৃহ, পরিজন, বসন, ভূষণ, শয্যা ও আসনাদি সমুদয় বস্তুই প্রিয় ও মধুর বলিয়া অনুভূত হইলেও, যেমন সেই প্রতি অনুভূতির মধ্যে—সকল প্রিয়তা ও সকল মাধুর্য্যকে পরাভূত করিয়া কান্তের প্রিয়তম মুখচ্ছবিই জাগিয়া উঠে, সেইরূপ মহাভাগবতগণের শুদ্ধ দৃষ্টিতে—কৃষ্ণসম্বন্ধে সকল ভুবন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠিলেও, প্রত্যেক মাধুর্য্যের মধ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়া,—সকল প্রিয় হইতে প্রিয়তম—সকল মধুর হইতে মধুরতম সেই কৃষ্ণমুখ চন্দ্রমাই স্ফুরিত হইতে থাকেন।

ভক্তিভাবের উদয়ে 'আত্মীয়' বিষয়সকল 'পরমাত্মীয়' বোধ হওয়ায় অধিকতর সুখকর হয়।

'মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥'

(শ্রীচরিতামৃতে। মধ্য ৮।২২৬-৭)

জীবের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় মহাভাগ্য-সাপেক্ষ—'ভক্তভাব' বা 'ভাগবতী-বৃত্তির' উদয়ে, তদীয় বাহ্য আকৃত্যাদি ও ব্যবহারাদি দর্শনে বিষয়-মদান্ধ জীবের অবিদ্যা-কলুষিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে উহা দুঃখ-দারিদ্র্যাদি পীড়িত—অনভীপ্সিত অবস্থাবিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এবং তন্নিবন্ধন সাধারণ জীব কর্ত্তৃক সেই ভক্ত উপেক্ষিত বা অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, যে-হেতু চিদ্-বহির্মুখ জীবের জড়ীয়-বৃত্তির সমক্ষে চিন্ময় বিষয় মাত্রের অপ্রকাশতাই স্বাভাবিক। বাস্তবিকপক্ষে ভক্তিরস বিভাবিত ভক্তের সেই অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবিল আনন্দ, কেবল তাঁহারই বা তৎসদৃশ ভগবৎ-সাম্মুখ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই বিষয় হইয়া থাকে। একই মৃত্তিকায় অবস্থিত নিম্ব ও খর্জ্জুর বৃক্ষদ্বয় যেমন পরস্পর বৃত্তিভেদে একই মৃত্তিকা হইতে তিক্ত ও মধুররস গ্রহণ করে,—বিশাল ধরিত্রীবক্ষে তিক্তরস ব্যতীত কোথাও যে মিষ্টরস আছে, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা নিম্ববৃক্ষের যেমন থাকে না, এবং অন্যপক্ষে, মধুরতা ব্যতীত বসুন্ধরার বুকে যে কোথাও কোন তিক্ততা আছে, তাহা খর্জ্জুর বৃক্ষের নিকট যেমন গ্রাহ্য হয় না, সেই প্রকার জড়-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ও ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীব-বিশেষের বৃত্তি-বিশেষে, যথাক্রমে জড়ভাবের বা সংসার-দুঃখের ও চিদ্ভাবের বা পরমানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে,—ইহাই জানিতে হইবে।

ভক্তি বা 'ভাগবতী-বৃত্তির' উদয়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বৃত্তির গ্রাহ্য বিষয় নহে।

ভাগবতগণেও যে সময়ে সময়ে ব্যবহারিক দুঃখাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্ম-বন্ধন জন্য নহে; সুতরাং সে-জন্য তাঁহাদের

কোনও দুঃখস্পর্শ হয় না। বিড়ালী যেমন নিজ শাবককে দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিলেও, তন্নিবন্ধন সুখ ব্যতীত সেই মার্জ্জার-শিশুকে যেমন দুঃখলেশও অনুভব করিতে হয় না, কিন্তু মূষিকাদির পক্ষে তদবস্থা নিদারুণ দুঃখকরই হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম-পাশবদ্ধ জীবের ন্যায় কর্ম্ম-পাশমুক্ত ভক্তগণকে এই বিনশ্বর দেহ ধারণকাল পর্য্যন্ত, বাহ্যতঃ একই দশাপন্ন বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সে-জন্য কর্ম্মপাশ-বদ্ধ জীবই দুঃখযুক্ত হয়, কিন্তু স্বরূপভাব-প্রাপ্ত ভাগবতগণ সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাবস্থায় সুখময়ই হইয়া থাকেন।

ভাগবতগণে ব্যবহারিক দুঃখাদি দৃষ্ট হইলেও তাহা ক্লেশকর হয় না।

যে সুখবিন্দুর অন্বেষণে জীবমাত্রেই আমরা অনাদিকাল হইতে অহর্নিশ কতই ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি,—সেই সুখের অতল—অনন্ত ও অনাবিল সিন্ধুর সাক্ষাৎকার, কেবল ভক্তির উদয়েই সম্ভবপর হইয়া থাকে এবং উহার প্রাপ্তিতে জীবত্বেরও পরম সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে। ধন-ধান্যাদি জড়বিষয় সকলকে অপেক্ষা করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যথার্থ 'সুখ' নহে—'সুখাভাস' মাত্র। সুখের সন্ধান জানি না বলিয়া, যাহা 'সুখাভাস' তাহাই আমাদের নিকট 'সুখ' নামে পরিচিত বিষয়। যে পর্য্যন্ত আমরা 'সুখ' ভ্রমে 'সুখাভাসের' কামনা করিব, সে পর্য্যন্ত 'সুখাভাস' প্রাপ্তির জন্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্যাদি বিষয়কে অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হইবে,—যে-হেতু সুখহীন-বিষয়ে প্রতি-বিম্বিত সুখ বা আত্মভাবের নামই 'সুখাভাস'; সুতরাং অনাত্মবিষয়কে অপেক্ষা না করিয়া 'সুখাভাস' প্রাপ্তির উপায় নাই; কিন্তু যাহা পরমানন্দ —পরম সুখ, তল্লাভের নিমিত্ত নশ্বর ধন-সম্পদাদি কোনও বিষয়কে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। রাজ-চক্রবর্ত্তীই হউন বা

সুখাভাস প্রাপ্তির ও সুখপ্রাপ্তির ভিন্ন উপায়।

কুক্কুরাদিসহ পথিনিক্ষিপ্ত অন্ন-ভোজীই হউন—ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ,—এমন কি জীবমাত্রেরই উহাতে অধিকার আছে, কেবল মুখ ফিরাইয়া—অন্তর্মুখ হইয়া সেই পরমানন্দকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিতে পারিলেই হইল ; যে-হেতু তাহাই নিত্য পদার্থ,—তাহাই জীবের চির আত্মীয়—স্বজাতীয় ও স্বাভাবিক বস্তু। অসার ও অনিত্য সুখাভাসকে প্রাপ্ত হইতে হইলে বিষয়-প্রাপ্তির একান্ত প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত পরমসুখ—পরমানন্দ-সিন্ধুর অতল তলে চির-নিমজ্জিত থাকা, কেবল চিদ্-সাম্মুখ্য—ভগবৎ-সাম্মুখ্য কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য ঘটিলেই যে-কোনও জীবের পক্ষে সুনিশ্চিত সম্ভব হইতে পারে, এ-কথা অভাবগ্রস্ত—দুঃখিত জীব মাত্রেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অমলা ভক্তির উদয়ে, পূর্ণতম স্বরূপভাব প্রাপ্ত জীব বা ভাগবতগণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকিলেও, তৎকালে শ্রীভগবৎ-প্রীতি লালসায় তদীয় অনুকূলতাময়ী সেবা ব্যতীত, তাঁহাদের আত্ম-সুখের অনুমাত্রও সন্ধান থাকে না। এমন কি, সেই প্রাপ্ত-সুখের প্রাবল্যে যদি প্রাণকোটি প্রেষ্ঠ—আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোন বাধা হয়, তবে কেবল তৎকালেই সেই প্রাপ্ত-সুখের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য পতিত হয়, এবং তাঁহারা সেই প্রাপ্ত-সুখকে কৃষ্ণ-সেবার বিঘ্ন বোধে ধিক্কার পূর্ব্বক, উহাকে নিদারুণ দুঃখের মতই পরিহার করিতেও ইচ্ছা করেন—শুদ্ধাভক্তির এমনই স্বভাব! এই অবস্থায় একমাত্র ভগবৎ-সুখবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনও আত্মসুখবাঞ্ছা থাকে না, বা থাকিবার প্রয়োজনও হয় না। 'সুখবাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ' (শ্রীচরিতামৃতে)। পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তির ইহাই প্রকৃত অবস্থা ও ইহাই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত জীবের পক্ষে যে, (১) আত্ম-সুখাভিপ্রায়

পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকিলেও ভাগবতগণের সুখ-সন্ধান-শূন্যতা।

কৃষ্ণ সেবায় আত্মসুখ হইতেও আকর্ষণাধিক্য।

থাকে না, এবং (২) থাকিবার প্রয়োজনও হয় না, তাহার দুইটি হেতু যথাক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

১। পরিপূর্ণ সুখের ইহাই স্বাভাবিকতা।

যেখানে অভাব নাই—ন্যূনতা নাই, সেখানে তৎপ্রাপ্তির জন্য বাঞ্ছা বা কামনাও নাই ; আর যেখানে অভাব অপূর্ণতা, সেখানেই বাঞ্ছা—সেখানেই কামনা। যে সুখের মধ্যে অভাব আছে—অল্পতা আছে,—যেখানে আরও সুখ চাহিবার প্রয়োজন আছে, সেখানে সুখস্পৃহা—সেখানে অস্থিরতা অবশ্যই থাকিবে ; কিন্তু যে সুখের মধ্যে অল্পতা নাই—অপূর্ণতা নাই—অধিক চাহিবার নাই, তাহাই পূর্ণ সুখ বা পরমানন্দ,—তাহাই প্রকৃত শান্ত অবস্থা। সেই পরমানন্দরসে নিমজ্জিত যিনি, পূর্ণ স্বরূপ-ভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন পূর্ণ-সুখ-সাগরে নিরন্তর পরিস্নাত যিনি, তাঁহার পক্ষে আর কোনও সুখের অভাব—সুখের সন্ধান পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না ; এই জন্যই ভগবৎ-ভক্তের আত্মসুখ-বাঞ্ছা না থাকায়, তাঁহাদিগকেই পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ—অতএব শান্ত বা স্থিরতা-প্রাপ্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ; যে-হেতু পরিপূর্ণ সুখপ্রাপ্তির নিষ্কামতা বা স্থিরতাই স্বাভাবিকতা।

সুখ-সন্ধান-শূন্যতাই পরিপূর্ণ সুখ-প্রাপ্তির লক্ষণ।

'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥'

(শ্রীচরিতামৃত, মধ্য ১৯।১৩২)

২। কারণের সুখ-সাধনেই তৎকার্য্যের প্রকৃষ্ট সুখ-পোষকতা।

ভক্তির আলোকে, ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ভক্তের অনাবিল ও অভ্রান্ত দৃষ্টির সমক্ষে সকল বিষয়েরই পূর্ণ-স্বরূপ জাগিয়া উঠে ; এইহেতু ভক্তগণই সম্যক্-প্রকারে বুঝিতে পারেন, কার্য্যস্থানীয় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সুখ-সাধন

প্রয়াস বা আত্ম-সুখ-তাৎপর্য্য পরিশূন্য হইয়াও কেবল তৎকারণস্থানীয় শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা, ভগবৎ-প্রীতির আনুষঙ্গ বা গৌণ ফলেই যখন তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎ-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও কেবল ভগবৎ-সুখ তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের কোনও স্বার্থকতা বা আবশ্যকতা বোধ, ভক্তের শুদ্ধচিত্তে সমুদিত হয় না।

কারণের সুখ-পুষ্টির আনুষঙ্গ ফলে কার্য্যের সুখ পোষণ।

কার্য্যের স্বতন্ত্র প্রীতি সাধন প্রয়াস অপেক্ষা, তৎকারণের প্রীতি-সাধন দ্বারা কার্য্য ও কারণ উভয়েরই সম্যক্ প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-তাৎপর্য্য হৃদয়ে লইয়া, অনুকূলভাবে একমাত্র তাঁহারই সেবন দ্বারা, তৎকার্য্য-স্থানীয় নিখিল ভুবনের সহিত ভক্তগণ নিজ আত্মাকেও পরিপূর্ণ সুখময়রূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সুখ-সন্ধানের পরিবর্ত্তে সুখ-বিস্মরণ এবং আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যই পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ; তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তর্পণেই ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলেই সকল আত্মা ও সকল ভূতের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-বিমুখ বা জড়ত্ব-প্রাপ্ত জীবের জড়ীয় বুদ্ধিবৃত্তির নিকট, আত্মসুখ

তাৎপর্য্যই সুখ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু এই প্রসিদ্ধি,—সুখ লাভের এই পন্থা যে দোষদুষ্ট ও মায়া-বিজৃম্ভিত,—তাহা কেবল ভাগবতগণের শুদ্ধ বুদ্ধিতেই পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। ভুক্তি বা মুক্তিকামী—কাহারও পক্ষে এই অবিদ্যার প্রতারণাকে সম্পূর্ণরূপে ভেদ করা সম্ভব নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বা স্ব-সুখ তাৎপর্য্যরূপ কৈতব বা অজ্ঞানতা দ্বারা সংস্পৃষ্ট। কার্য্যস্থানীয় আত্মার সুখাভিপ্রায় ব্যতীত, মুখ্যভাবে কারণাত্মক শ্রীভগবৎ-প্রীতি-বাঞ্ছার কোনও সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই পুরুষার্থত্রয় বা ভুক্তীচ্ছার মধ্যে, আত্মসুখ-তাৎপর্য্যক—দুঃখ পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির বাসনা স্পষ্টরূপেই প্রকাশ রহিয়াছে; আর মোক্ষ নামক চতুর্থ পুরুষার্থ বা মুক্তীচ্ছা যাহা,—তাহার সিদ্ধাবস্থায় জীব-ব্রহ্মৈকভাব উদিত হওয়ায় তৎকালে আত্মার বাঞ্ছাদি-ধর্ম্মের বিলীনতা নিবন্ধন, আত্মসুখেচ্ছা প্রকাশের অসম্ভাবনা বশতঃ উহা অলক্ষিত থাকিলেও যখন তৎসাধন-কালে, স্বীয় দুঃখনিবৃত্তির অভিপ্রায় মুখ্যভাবে ও স্পষ্টাকারেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন মোক্ষাভিসন্ধির অন্তরালেও যে, স্বসুখ-তাৎপর্য্য সূক্ষ্মরূপেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবের ভুক্তি বা ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তি বা মোক্ষবাঞ্ছা—স্পষ্টাস্পষ্ট যে ভাবেই হউক উক্ত উভয়বিধ অভিপ্রায়ই যে আত্ম-প্রীতিবাঞ্ছা-সঞ্জাত ও স্বসুখ-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই যে অল্পাধিক অজ্ঞানতা বা কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট, সুতরাং অকৈতব কৃষ্ণ-ভক্তি পথের বাধক-স্বরূপ, পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার, শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দেশ অনুসারেই তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন;—

ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তির বিশুদ্ধতা।

'অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।' (আদি ১।৫০)

ভক্ত বা ভাগবতগণের যাহা স্বভাব,—তাহারই নাম ভক্তি বা 'ভাগবত-ধর্ম্ম'। ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সুখস্পৃহা-শূন্যতা অপর কোন অবস্থায় সম্ভব হয় না; সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষার্থই কৈতবশূন্য নহে। ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে,—ভক্তিভাবের উদয়ে 'প্রীতিবাঞ্ছা' জীবাত্মাকে অতিক্রম করিয়া তৎকারণাত্মক পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপের চরণারবিন্দে সংলগ্ন হওয়ায়—ভক্তিই কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। ভক্তের পুরুষার্থ ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে পঞ্চম যে ভগবৎপ্রীতি, —সেই ভগবৎ-প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হওয়ায়, উহাকে 'প্রেম' বা 'পঞ্চম-পুরুষার্থ' বলা হইয়া থাকে। অতএব যাহা পুরুষার্থ হইতে পঞ্চম স্থানীয়, কেবল তাহাই আত্ম-সুখতাৎপর্য্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেই প্রেম-ভক্তি ব্যতীত যে আর কিছু অকৈতব নাই, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

ভক্তিভাব ভিন্ন নিষ্কাম ভাব সম্ভব হয় না।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্'—(১।১।২)

তাৎপর্য্য—প্রস্তাবিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছেন। এই পরমধর্ম্মটি কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন; 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' (প্র+উজ্ঝিতঃ+কৈতবঃ) অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে কৈতব

যাহাতে। শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্র'শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্য্যন্তও যাহাতে নাই—এই শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম এতাদৃশ অকৈতব; সুতরাং ইহাই মৎসর রহিত সাধুগণাচরিত পরমধর্ম্ম।

শ্রীভগবৎগুণ-লীলাদি-প্রসঙ্গরূপ প্রস্ফুটিত কমল-কহ্লার-শোভিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম কেবল ভক্ত-মরালগণেরই বিহার-দীর্ঘিকা। মহৎ কৃপাদি স্পৃষ্ট শুদ্ধজীবের পূর্ণতম স্বরূপই 'ভক্তত্ব' বা 'ভাগবতপদ'। শুদ্ধ জীবের পূর্ণতম স্বধর্ম্ম বা পরম ধর্ম্মই 'ভক্তি' বা 'ভাগবত-ধর্ম্ম'। জীবের জড়ভাব বা 'জড়ত্ব' হইতে চিদ্‌ভাব বা 'জীবত্ব' শ্রেষ্ঠতর অবস্থা হইলেও 'ভক্তত্বেই' জীবের অভিব্যক্তির অবসান; অতএব জীবত্বই জীবের স্বরূপ নহে—ভক্তত্বই শুদ্ধ জীবের পূর্ণতম ও বিশুদ্ধ স্বরূপ। এই জন্য ভক্তের অপর নাম 'শুদ্ধজীব'। আবার জীবের যাহা পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ স্বভাব,—জড়ত্ব জনিত দুঃখ-নিবৃত্তির পর, পরমানন্দ প্রাপ্তিতেই উহা পর্য্যবসিত নহে;—প্রাপ্ত সুখের সকল সন্ধান বিস্মরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্নতাই শুদ্ধ-জীবের পরিশুদ্ধ বা পূর্ণতম স্বভাবের অভিব্যক্তি-স্থল। এক কথায় জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তির ভিত্তি যাহা—তাহারই নাম 'কৃষ্ণদাস' ও 'কৃষ্ণদাস্য'।

'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।' (পদ্মপুরাণ উ° খণ্ড, ৯০ অ°)

অর্থাৎ জীবগণ শ্রীহরিরই দাস,—অপর কাহারও দাস নহেন।—পদ্ম পুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে।

জীবের এই পূর্ণতম স্বরূপ বা ভক্তত্বের বিকাশে, পূর্ব্বোক্ত পুরোবর্ত্তী আত্মসুখের সকল প্রসঙ্গই তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী বা অবসান প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থান হইতে অতঃপর কেবল ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যময় প্রসঙ্গই পরিগীত হইতে থাকে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার

পবিত্র অগুরু গন্ধে ভক্তের হৃদয়-মন্দির পূর্ণ থাকায়, সেখানে আর আত্ম-সুখবাঞ্ছারূপ পূতিগন্ধের কোন সন্ধান মিলে না। আত্ম-সুখাভিপ্রায়—সে ত' দূরের কথা,—যে জন্ম-মরণরূপ ভববন্ধন ছিন্ন করাই মুমুক্ষুগণেরও মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচিত, সেই ভয়াবহ সহস্র সংসার-দুঃখ গ্রহণ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা—ভগবৎপ্রসঙ্গাদি হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচ্যুত হইতে না হয়, তবে আত্মসুখানুসন্ধান রহিত ভাগবতগণ সে দুঃখকেও বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (এ-স্থলে বলা বাহুল্য যে, ভক্তগণের পক্ষে সকল অবস্থাতেই পূর্ণ সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভবের কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহারা কিন্তু ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না।)

তাই ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছেন ;—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

(বিষ্ণু পুরাণ ১।২০।১৮-১৯)

অর্থাৎ হে নাথ! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে। অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেমন প্রীতি,—তোমাতে যেন আমার সেইরূপ প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই সুরেই সুর মিলাইয়া ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন ;—

"কি এ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ
করম বিপাকে গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥"

ইহারই নাম আত্ম-সুখানুসন্ধান-শূন্য ও ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তি। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ই উহার অভিব্যক্তির প্রারম্ভাবস্থা এবং

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তেই সেই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তির অভিব্যক্তির চরমাবস্থা।

দেহ ত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা (অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিধৃত পদ্যাবলী ৩৩৬)

(শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আর না আগমন করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতি কষ্টে আর রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে, তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না।) আমার এই দেহ পঞ্চত্বলাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারদীর্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গণাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হয়।

অতএব 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' হইতে 'ভক্তিকে' অতিশয় গরীয়সীই জানিতে হইবে। ('সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা'।—নারদ ভক্তিসূত্রে—২৫) ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বসুখতাৎপর্য্যের মলিনতা যে পর্য্যন্ত লেশমাত্রও অন্তরে সংলিপ্ত থাকে, তাবৎ সেই হৃদয়ে পরমশুদ্ধা

ভক্তিসুখের আবির্ভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন ;—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।২২)

অর্থাৎ যাবৎ ভুক্তি-মুক্তিরূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাবৎ সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হইবে? (অর্থাৎ সম্ভব নহে।)

যে অহৈতুকী সেবা বা ভক্তিসুখের তুলনায় ভুক্তি দূরের কথা—মুক্তি-সুখকেও পিশাচীর ন্যায় অমঙ্গলকর বোধ হইয়া থাকে, কোনও লৌকিক ভাব ও ভাষায় সে আনন্দের কোনও বর্ণনা প্রদান করা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। ইহা একমাত্র সাধনগ্রাহ্য বিষয়।

বিশ্বনাথের এই বিশ্বসংসার, ভক্তের শুদ্ধ অনুভবদ্বারা যেমন শুদ্ধরূপে গ্রাহ্য হয়, ভুক্তি ও মুক্তিকামীর নিকট সেরূপ শুদ্ধস্বরূপে গ্রহণযোগ্য হয় না।

জগৎ-সংসারের সহিত ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী ও ভক্তগণের সম্বন্ধ।

(১) 'দেহাত্মবাদী'—জড়ভাবাপন্ন ভুক্তিকামী জীবের নিকট এই মায়িক সংসারই একমাত্র সত্য বস্তু ; এই জন্য সেই সকল জীব অত্যন্ত আসক্তির সহিত বিষয়-ভোগ-তৎপর হইয়া কেবল সকাম কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে ; অপরপক্ষ—(২) 'চিদেকাত্মবাদী'—চিদ্‌ভাবাপন্ন মুক্তিকামী জীবের নিকট বিশ্ব-সংসার সকলই স্বপ্নবৎ অলীক বা অসত্য ; সুতরাং তাঁহারা সংসার-সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, কেবল জ্ঞানেই নিমগ্ন থাকেন। (৩) 'চিৎকণাত্মবাদী'—কৃষ্ণদাস-স্বভাবাপন্ন সেবাকামী শুদ্ধজীব বা ভাগবতগণ এই জগৎ-সংসারকে শ্রীভগবানেরই

শক্তিবিশেষ জানিয়া, ইহার নশ্বরতা অনুভব করিলেও, ইহাকে একান্ত সত্য বা একান্ত মিথ্যা বোধে, সংসারে অত্যন্ত আসক্ত বা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন না। শ্রীভগবান্ এ বিষয়ে নিজেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(শ্রীভাগবতে ১১।২০।৮)

অর্থাৎ মহৎসঙ্গাদি কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি যদি সাংসারিক-কর্ম্মে অত্যন্ত বিরক্ত না হয়েন, অথচ তাহাতে অতিশয় আসক্তিপরায়ণ না হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়।

ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা তাহার তন্তু বা জালরূপ নিজ শক্তিকে একবার বিস্তার করিয়া পুনরায় গ্রহণ করে বলিয়া, উহা মাকড়সার মত স্থিরবস্তু না হইলেও যেমন অবস্তু বা অলীক নহে, সেইরূপ জগৎ নশ্বর হইলেও স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা বা অলীক নহে ;—ইহা শ্রীভগবানেরই মায়া বা জড় নামক শক্তি বিশেষের পরিণাম। আবার যেমন ঊর্ণনাভের ন্যায় ঊর্ণনাভ-শাবকগণ তদীয় স্বরূপ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, সেই জালে বদ্ধ না হইয়া তদুপরি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তৎবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কীট-পতঙ্গাদি তাহাতে সহজেই আবদ্ধ হয়, তেমনি স্বরূপ-ভাবপ্রাপ্ত জীবগণ নির্লিপ্তভাবে ও স্বচ্ছন্দে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-জালের উপর বিচরণ করিতে সমর্থ হইলেও, বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন দেহাত্মবাদী জীবসকল তাহাতেই সংবদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি এই বিশ্বের বাস্তবিকতাকে স্বীকার করিয়া, উক্ত প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহাকে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষের পরিণতিরূপে স্পষ্টতঃ বর্ণন করিয়াছেন ;—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ (মুণ্ডক উ° ১।১।৭)

অর্থাৎ উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ-লোমোদ্গম হয়, তেমনি এখানে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তি উভয়েই যখন বস্তুবিশেষ, তখন স্বরূপশক্তির ন্যায় জড়শক্তিরও বাস্তবিক সত্তা অস্বীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কখনও অলীক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। আবার প্রাপঞ্চিক জগৎ সত্য হইলেও, উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিপরীত বা বহিরঙ্গ হওয়ায়, অবিকারী বা অবিনশ্বরাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বরূপ-শক্তির যে বিপরীত ভাব, অর্থাৎ বিকারী বা নশ্বরাদি ধর্ম্ম—বহিরঙ্গাশক্তি তদ্ভাবাপন্না। অতএব বিশ্বসংসার সত্য হইলেও ইহার অনিত্যতা বা নশ্বরতা নিবন্ধন, অত্যন্ত সত্য মনে করিয়া ইহাতে আসক্তি অথবা অত্যন্ত মিথ্যা মনে করিয়া ইহাতে বিরক্তি,—এই উভয়বিধ অবস্থাকেই আংশিক সত্য বা অজ্ঞানতা মিশ্রিত বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তের পরিশুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভগবৎসত্তায় সত্তান্বিত এই বিশ্ব-সংসার, সেই মহা-বিশেষ্য স্থানীয় শ্রীভগবানের মহা-বিশেষণ বা তন্মহিমার প্রকাশকরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই গুণবাচক জগৎই সেই গুণাকর জগন্নাথের অনন্ত গুণরাশির প্রথম প্রচারক। নিখিল বিশ্ব-সংসার ঐক্যতানে ঝঙ্কৃত হইয়া বিশ্বপতির গুণগানে নিমগ্ন! সুতরাং সেই প্রিয়তম গুণাকরের সম্বন্ধেই তদীয় গুণগায়ক এই নিখিল বিশ্বই প্রিয় হওয়ায়, ভক্তগণ যেমন

বিশ্ব-সংসারের যথার্থ স্বরূপ ভক্তেরই বিশুদ্ধ দৃষ্টির গ্রাহ্য।

তাহাতে বিরক্ত হইতে পারেন না, তেমনি এই প্রিয় বিশ্ব অপেক্ষা প্রিয়তম বিশ্বপতিতে অধিক আসক্ত থাকায়, তাঁহারা এই সংসারে আসক্তও হয়েন না। জগতে যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মধুর—যাহা কিছু মনোহর—যাহা দর্শন করিয়া, ভাগবতগণ শ্রীভগবানেরই অসীম সৌন্দর্য্য—অনন্ত মাধুর্য্য ও অতুল মনোহারিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ভাগবতগণের বিশুদ্ধ দৃষ্টিই শাস্ত্রানুমোদিত।

নিখিল শক্তিবর্গের সহিত শক্তিমান্—শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করাই দর্শনের পূর্ণ সার্থকতা! ভাগবতগণের ভক্তি-বিভাবিত দৃষ্টিতেই কেবল সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রতিভাত হয়,—অন্যত্র সম্ভব হয় না। শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া কেবল শক্তি-বিশেষকেই সত্য বলিয়া জানা অথবা শক্তিকে মিথ্যা জ্ঞানে কেবল এক নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই সত্য বলিয়া দর্শন করা,—উভয়ই একদেশ-দর্শীতার ফল। তাই প্রকৃষ্ট বা পূর্ণ দর্শনের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১১।২।৪৫)

অর্থাৎ যিনি চেতন অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবরূপে দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায়।

বিশ্বনাথের সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া, যাহারা এই বিশ্ব-সংসারে আসক্তি-পূর্ব্বক সংসারসুখ ভোগেই তন্ময় হইয়া থাকে, সেই সকল জীবকে যেমন গভীর অন্ধকার গর্ভে নিমগ্ন হইতে হয়, তেমনি আবার ইহাতে একান্ত বিরক্ত জীব,—যাঁহারা পরমেশ্বরের মহিম-ব্যঞ্জক এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে অলীক ও অসত্য বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক, সেই জগদীশ্বরেরই

অনন্ত স্নেহ, দয়া, প্রেম ও করুণাদি গুণের সহিত তদীয় অপরিসীম মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যাদি শক্তির অপলাপ করিয়া থাকেন, সেই সকল জীবকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার লোকে গমন করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

(ঈশোপনিষৎ—৯)

অর্থাৎ যাহারা কেবল অবিদ্যার (ভক্তি বর্জ্জিত কর্ম্মের) অনুসরণ করে, তাহারা ঘোর তামস লোক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা কেবল বিদ্যায় (ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানে) রত, তাহারা তদপেক্ষাও ঘোরতর তামস-লোকে গমন করিয়া থাকে।

অতএব যাঁহারা জগদীশ্বর ও জগৎ, কোনও পক্ষের অস্তিত্বের অপলাপ না করিয়া, শক্তিমানের সহিত শক্তিকে ও শক্তির সহিত শক্তিমান্‌কে সামঞ্জস্য পূর্ব্বক দেখিতে জানেন, তাঁহারা জগতের কোনও বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারেন না,—এবং তাদৃশ দৃষ্টিতেই দর্শনের পূর্ণতা। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন ;—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

(ঈশোপনিষৎ—৬)

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন, এবং সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।

ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক এই বিনশ্বর বা মরজগতের ভিতর দিয়াই ভগবানকে জানিয়া, তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক, সাক্ষাৎসম্বন্ধে

অমৃতময় শ্রীভগবৎসেবাদ্বারাই জীব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥
(ঈশোপনিষৎ—১১)

যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে একত্র জানেন, (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এককে ত্যাগ ও অপরকে গ্রহণ না করিয়া, যিনি উভয়কেই একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন) তিনি উক্ত অবিদ্যা (বা কর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

অতএব ভক্তগণ সংসারে অত্যন্ত আসক্ত কিম্বা বিরক্ত না হইয়া অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই এই বিশ্ব-সংসারকেও মধুর ও সুন্দর দেখিয়া, প্রতি অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ;—ইহারই নাম 'বিশ্বজনীন্-প্রেম'। বিশ্বের সহিত বিশ্বেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা কোনও জীবে পরিপূর্ণাকারে প্রকাশ সম্ভব হয় না।

ভক্তি-শাস্ত্রে এবং ভক্তগণের আচরণের ও উপদেশের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণে সুতীব্র সংসার-বৈরাগ্যভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বহির্ম্মুখ—বিষয়াসক্ত ও মোহগ্রস্ত জীব সকলের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য এবং প্রবৃত্ত-ভক্ত ও সাধকদিগকে সাধন পথে সত্বর অগ্রসর হইবার উৎসাহ প্রদান করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে ; যে-হেতু 'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'—(চরিতামৃতে, মধ্য ২২ পঃ)। নিদ্রিত ব্যক্তির সহিত তাহার কোনও পরমাত্মীয়, মধুর আলাপাদি দ্বারা তাহাকে আনন্দ দান করিতে আসিলেও, যেমন তাহার নিদ্রা ভঙ্গের জন্য প্রথমে কঠিন ও কর্কশ শব্দাদি দ্বারা তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, তদ্রূপ বিষয়-মদিরা পানে

নিদ্রিত ও নিরুৎসাহী জীবকে কৃষ্ণভজনে উৎসাহিত করাই ভক্তিপথের তীব্র বৈরাগ্য-বাণীর অভিপ্রায়।

তরুকে আশ্রয় করিবার জন্য লতিকার যেমন স্বাভাবিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়, এবং বিটপীকে আশ্রয় না করা অবধি যেমন তাহার নিরাশ্রয়তার ও অবসন্নতার অবসান হয় না, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, লতিকার মতই এমন কোনও এক উৎকৃষ্ট আশ্রয়-তরুকে অবলম্বন করিতে চাহে,—যাহাতে অবলম্বিত হইয়া, তাহার সকল উদ্বেগ ও অবসাদ,—তাহার সকল বিঘ্ন ও বিষণ্ণতা বিদূরিত হয়। জীব মাত্রের ইহা স্বাভাবিক অভিলাষ হইলেও, সেই অভিপ্রায়, ব্যবহারবৃত্তি বা স্তূপীকৃত জড়তা দ্বারা আবরিত থাকায়, উহা স্বরূপে প্রকাশ না হইয়া বিকৃতভাবেই যে ব্যক্ত হইয়া থাকে, নিবিষ্টতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। জীবাত্মার এই বাঞ্ছা-লতিকা যখন কোনও বিশেষ ভাগ্যোদয়ে পরিশুদ্ধ ও পরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই আশ্রয়-তরু অবলম্বন করিয়া তাহারই সুখ-সাধনেচ্ছা ভিন্ন যখন অন্য তাৎপর্য্য আর পরিদৃষ্ট হয় না,—জীবের সেই বৃত্তিবিশেষ বা বাঞ্ছা-লতিকার পূর্ণ অভিব্যক্তিরই অপর নাম 'ভক্তি' বা 'ভাগবতীবৃত্তি'। 'কৃষ্ণ-কল্পতরু' ভক্তি-বল্লীর শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন।

লতিকার বিটপী আশ্রয়ের ন্যায় কোন উৎকৃষ্টতর আশ্রয়কে অবলম্বন করা জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি।

কৃষ্ণ-কল্পতরু অভিসারিণী বাঞ্ছা-লতিকার নাম 'ভক্তি' বা 'ভাগবতী-বৃত্তি'।

আবার নবলতা যেমন তরুণ তমালে অবলম্বিত হইতে চাহে, তেমনি তমালের পক্ষেও স্পষ্টতঃ না হউক—এমন একটা অব্যক্ত অভিলাষ অবশ্যই আছে, যাহাতে তমালও চাহে, সে নব-বল্লীর অবলম্বন হয়। ব্রততী ও বনস্পতির মধ্যে এই যে পরস্পরে অবলম্বিত ও অবলম্বন ভাব,—ইহা যে কেবল উপকৃত ও উপকারক সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত তাহা

তরু ও লতার মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ভাবের সম-প্রয়োজনীয়তা বোধ।

নহে,—তাহার উপরেও এমন কোনও এক স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধে উভয়ে সংবদ্ধ, যেখানে এই পরস্পরের মিলনে একের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যের অপ্রয়োজনীয়তার কোনও পরিচয় নাই, আছে কেবল উভয়ের মিলনের জন্য উভয় দিকেই সমান প্রয়োজন বোধ—সমান ব্যাকুলতা।

পরমাত্মার পূর্ণ স্বরূপ বা শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মার মিলন মধ্যেও সেইরূপ উভয় পক্ষেই যে পরস্পর প্রয়োজনবোধ নিহিত রহিয়াছে,—উভয় পক্ষেরই পরস্পর ব্যাকুলতা হইতেই যে, সে মিলন সংঘটিত হয়,—সে সংবাদ ভক্তি-বাদ ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই; ইহা কেবল ভক্তি বা প্রেম-ধর্ম্মেরই বিজয়-বার্ত্তা। জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যে পরস্পর এই যে ব্যাকুলতাভরা মধুর সম্মিলন,—ইহারই নাম 'মহামিলন'। একমাত্র প্রেম-সূত্রেই মহামিলনের মধুর গ্রন্থি সংবদ্ধ হয়,—তদ্ব্যতীত উহা অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না। জীব-জগতের এই শ্রেষ্ঠতম আশার-বাণী কেবল ভক্তিবাদ—বিশেষভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের 'প্রেমবাদ' ব্যতীত, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কোনও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই। প্রেমধর্ম্ম ভিন্ন অপর সকল ধর্ম্মের সার মত এই যে,—কেবল দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বররূপ পরতত্ত্বকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু জীবকে প্রাপ্ত হওয়া, পরতত্ত্বের নিজের পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই; যে-হেতু তিনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব,—তিনি আপ্তকাম; সুতরাং তাঁহার দিকে কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই; তবে যে শরণাগত জীবকে তিনি সংসার পাথার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক, স্ব-চরণ সমীপে স্থান দান করিয়া, তাহাকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন, সে কেবল তদীয় অহৈতুকী কৃপাগুণে জীবের উপকারক হইয়া জীবকে উপকৃতই করিয়া থাকেন; ইহাতে জীবের প্রয়োজন সাধন ভিন্ন

জীবেশ্বরের পরস্পর সম-প্রয়োজনীয় 'মহা-মিলন' সংবাদ, একমাত্র ভক্তি বা প্রেমবাদ হইতেই প্রচারিত।

তাঁহার স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই।—পরতত্ত্বের সহিত জীবতত্ত্বের এতাদৃশ সম্বন্ধ হইলেও, পরতত্ত্বের সীমা ও জীবতত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ যেখানে অবসান-প্রাপ্ত,—সেই ভক্তিরাজ্যে—প্রেমরাজ্যে ভগবান্ ও ভক্তের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। তাই সকল ধর্ম্মের অগোচর সেই নিগূঢ় বার্ত্তা—জীব-জগতের সেই অভিনব আশার বাণী, কেবল প্রেমধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে; একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে জগৎ বিদিত হইয়াছে,—শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, শ্রীভগবানের পক্ষেও জীবকে স্বরূপে বা ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন। কৃষ্ণসেবাবাঞ্ছারূপ পূর্ণতম স্বধর্ম্ম জাগ্রত হইলে, তদীয় চরণাশ্রয় করিবার জন্য জীবের সেই বিশুদ্ধ বাঞ্ছা-লতিকা বা ভক্তিবল্লী যখন কৃষ্ণাভিসারিণী হয়, তখন সেই অভিসারিকাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া, পরম আদরে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবার জন্য শ্রীভগবৎ-কল্পতরুও নিরন্তর ব্যগ্র হইয়া থাকেন। মধুকর যেমন মকরন্দের জন্য লোলুপ হয়, ভক্তিবল্লী হইতে বিকসিত প্রেম-প্রসূনের মধুপান করিবার জন্য শ্রীভগবান্ মধুব্রত হইতেও সতত ব্যাকুল। তিনি পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল প্রেম-মকরন্দই ভগবদ্-ভ্রমরের একমাত্র উপজীব্য। সর্ব্বাধীশ ভগবানের এই প্রেমাধীনতা—এই ভক্তবশ্যতা, ইহা তাঁহার দূষণ নহে, পরন্তু ভূষণস্বরূপই জানিতে হইবে। সর্ব্ব-গুণাকর শ্রীভগবানের ভক্তিবশ্যতা—ভক্তাধীনতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পদ; অতএব প্রেম-ভক্তির বিকাশ দেখিবার জন্য ও বিকসিত প্রেম-প্রসূন প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার নিত্যই আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ আছে। পূর্ণকাম শ্রীভগবানের এই যে অভিলাষ বা আবশ্যকতার সংবাদ, ইহাই জীবের পক্ষে নিরাশার ঘনান্ধকারের প্রান্ত সীমা হইতে সমুদিত—আশার তরুণ

প্রেম-মকরন্দই ভগবৎ-ভ্রমরের একমাত্র উপজীব্য।

অরুণালোক-স্বরূপ! একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে বিকীর্ণ এই আশার উজ্জ্বলতম আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইলেও, উল্লুক-স্বভাব জীব-সাধারণের বদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে তাহা গ্রাহ্য হইবার বিষয় হয় না। 'উলুক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।' (—শ্রীচরিতামৃত, আদি ৩ প°)

কেবল প্রেম-ধর্ম্মই প্রচার করিতে পারিয়াছেন,—একমাত্র মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য, তেমনি ভক্তের হৃদয়-কমলভরা প্রেম-মধুই জগজ্জীবন শ্রীভগবানের জীবনোপায়। শ্রীভগবান্ অসীম বলিয়া তাঁহার প্রেম-পিপাসাও অনন্ত; তাই অনন্ত জীব-হৃদয়-কমলে প্রেম-মকরন্দের সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অনন্ত-ব্যাকুলতার বিরাম নাই। এই জন্যই অনাদিকাল হইতে ভূলোকে ও গোলোকে অনন্তবার তাঁহার আসা ও যাওয়া চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। নীড়চ্যুত —'বিপদ'-গ্রস্ত বিহগীর পার্শ্বে বিহগ যেমন ব্যাকুল প্রাণে শতবার আসা যাওয়া করিয়া তাহাকে 'স্বপদে' প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে; তাহার মধুর চঞ্চুপুটের প্রেমস্পর্শ প্রাপ্ত হইতে চাহে,—তাহার সকল 'অভাব' ঘুচাইয়া দিয়া তাহাকে 'স্ব-ভাবে'—স্ব-নীড়ে ফিরাইয়া আনা বিহঙ্গীর প্রতি কৃপা নহে,—কৃপা হইতে অনেক উপরের কোনও এক প্রীতি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট স্বপ্রয়োজন বলিয়াই বিহঙ্গ যেমন মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ 'অবতার-বাদের' উদ্দেশ্য—জীবকে বারম্বার শুধু কৃপা করিতে আসাই নহে,—এই কৃপার অন্তরতম প্রদেশে শ্রীভগবানেরও এমন একটা নিজ প্রয়োজন লুকান রহিয়াছে, যাহার জন্য স্বপদচ্যুত পতিত জীবের পার্শ্বে না আসিয়া তাঁহারও চলে না। রজত, সুবর্ণ, মুক্তা বা হীরকে জগৎ ভরিয়া উঠিলেও ভ্রমর যেমন সে দিকে দৃষ্টিপাতও করে না; সে কেবল তৃষিত নয়নে চাহিয়া থাকে সেই দিকে—যেথায় একটি শিশিরসিক্ত

'অবতারবাদ'—শুধু জীবের প্রতি কৃপার সংবাদ নহে; ইহা শ্রীভগবানের অনন্ত প্রেম-পিপাসার পরিচয়।

শতদল উষার আলোকে ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে; ধন, ধান্যে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও যদি কোথাও কুসুম আর প্রস্ফুটিত হইতে দেখা না যায়,—মকরন্দ আর সঞ্চারিত না হয়, তবে মধুকরের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুলতায় ভরিয়া উঠে, সেইরূপ অনন্ত ভক্ত-কমলের হৃদয়জাত প্রেম-মকরন্দ পানে শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে সংরত থাকিলেও, অনন্ত ও অনাদিবদ্ধ জীবকোটি হইতে যদি আর ভক্ত-কমলের বিকাশ না হয়, তবে প্রেমবিলাসী ভগবানের হৃদয়ে একটা আকুল-ব্যথা জাগিয়া উঠে,—তবে প্রেমের রাজ্যে একটা ব্যাকুলতার হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়! অনন্ত প্রেম-সুধা যাহার একমাত্র উপজীব্য, কেবল সে-ই জানে, প্রতিবিন্দু—প্রতিকণা প্রেমের মূল্য তাহার কাছে কত অধিক! অতএব জীবের দিকে—ভক্তের দিকে যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও জীবকে ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া ততোধিক প্রয়োজন। যেখানে উভয়ের মিলনে একের প্রয়োজন ও অন্যের নিষ্প্রয়োজন, সেখানে আশার আলোক অতীব ক্ষীণ বলিয়াই জানিতে হইবে। ক্ষুধিত অতিথির পক্ষে অন্ন-প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকিলেই যে অন্ন সুখলভ্য হইবে তাহা নহে,—যদি গৃহস্থের অন্নদানের আবশ্যকতা বোধ না থাকে; কিন্তু ক্ষুধিত অতিথির অন্নপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতেও গৃহস্থের অতিথি-সেবনের আবশ্যকত যেখানে অত্যধিক, সেখানে উভয়ের প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার সহজ সম্ভাবনা; সুতরাং যে ধর্ম্ম—যে বাণী কর্ত্তৃক জীব ও ঈশ্বরের সম্মিলন সম-প্রয়োজন বলিয়া বিঘোষিত,—সেই বাণীকেই আশার উজ্জ্বলতম আলোকের মত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে সংস্থাপন করা আবশ্যক। ভক্তি-বাদই এই আশার বাণীর প্রচারক এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবাণীতেই তাহার চরম অভিব্যক্তি।

ভক্ত-কমলের বিকাশ দেখিবার জন্য ভগবানের চির-ব্যাকুলতা।

প্রেম-ভক্তি ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সাধন দ্বারা পরতত্ত্বের সম্মিলন সহজসাধ্য নহে; যে-হেতু সেখানে কেবল 'জীবত্ব' ও 'পরতত্ত্ব' সম্বন্ধ। অপূর্ণ-জীবের পক্ষে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তিরূপ স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পরতত্ত্বের সম্মিলন বা সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা থাকিলেও, পূর্ণকাম পরতত্ত্বের পক্ষে 'ভক্তি' ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না থাকায়, কেবল জীবভাব-বিশিষ্ট জীবকে তাঁহার পক্ষে প্রাপ্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই জন্য আপ্তকাম তিনি জীবের প্রয়োজন প্রাপ্তি বিষয়ে অপেক্ষাশূন্যই হয়েন। কেবল জীবভাবের নিকটই পরমেশ্বর নিরপেক্ষ সুতরাং সমদর্শী। এই অবস্থায় তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নহে সত্য, কিন্তু তিনি সপ্রয়োজন যেখানে, সেই ভক্তভাবের নিকট তাঁহার নিরপেক্ষতা থাকে না; সেখানে ভক্তকে পাইবার জন্য ও ভক্তের হইবার জন্য ভগবান্ সতত ব্যাকুল। পরমেশ্বরের এই নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা সম্বন্ধে গীতায় তিনি স্বয়ংই শ্রীমুখেও ব্যক্ত করিয়াছেন;—

জীবত্ব ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে পরমেশ্বর জীবের নিকট নিরপেক্ষ হইলেও, ভক্তত্বের সহিত ভগবানের সাপেক্ষ সম্বন্ধ।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ (৯।২৯)

অর্থাৎ আমি সকলের পক্ষেই সমান; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নহে। (জীব-সাধারণের সহিত তদীয় নিরপেক্ষ সম্বন্ধের কথা বলিয়া, অতঃপর ভক্তের সহিত তাঁহার সাপেক্ষ সম্বন্ধের কথা বলিতেছেন—) যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি।

অতএব কেবল জীবত্ব ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধ—যেখানে উভয় দিকেই প্রয়োজনাভাব, অথবা এক দিকে প্রয়োজন ও অন্য দিকে প্রয়োজনাভাব—সেখানে উভয় পক্ষের মিলন অসম্ভব অথবা সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে।

তাই সেখানে কেবল অজ্ঞাত—অজ্ঞেয় কিম্বা অনন্ত ও অচিন্ত্যাদি স্বরূপেই তাঁহার অবস্থান করা সম্ভব হয়। সেই জন্যই ভক্তি ব্যতীত অপর সকল অবস্থায় সকল জীবের নিকট তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ'। স্ব-প্রয়োজনপর বা সাপেক্ষ জীব ও নিরপেক্ষ পরতত্ত্বের সম্বন্ধস্থলেই শ্রুতি বলিয়া থাকেন,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—(তৈত্তিরী উ° ২।৯।১)

অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া, যাঁহার অন্বেষণ হইতে ফিরিয়া আইসে।

ভক্তির সংযোগ-সূত্র ব্যতীত জীবত্ব ও পরতত্ত্বের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনের জন্য উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ আর কিছুতেই জাগ্রত হইতে পারে না। 'আপ্তকাম' পরতত্ত্ব কেবল সেখানেই 'ভক্তিকাম'—যেখানে তিনি পূর্ণ-সীমতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; আর সেখানে ভক্তরূপে জীবত্বের বিকাশ, জীবত্ব সেখানেই পূর্ণ-সীমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমভক্তিসূত্র সংযুক্ত থাকায়, উভয়ের মিলনে উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয়। যেখানে ভগবদ্রূপ পূর্ণ-পরতত্ত্ব,—সেখানে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের পিপাসা নিত্যই বিদ্যমান আছে—সেখানে তিনি নিত্যই প্রয়োজনপর। কেবলমাত্র ভক্তের ভক্তির সম্বন্ধেই তাঁহার এই প্রয়োজনপরতা। তদ্ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই। আপ্তকাম পরতত্ত্বের পক্ষে প্রয়োজনশূন্যতা বশতঃ, তদন্বেষণপর জীবের, বাক্য ও মনের সহিত তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিবার কথা—যেমন শ্রুতি বলিয়া থাকেন, তেমনি আবার আত্মবৃত ভক্তের সমীপে শ্রীভগবানের আত্মবরণের অভিলাষ বিষয়েও শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

মহামিলনের আত্ম-বিনিময়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠোপনিষৎ ১।২।২৩)

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে (পরতত্ত্বকে) বেদাধ্যাপন অথবা মেধাদ্বারা কিম্বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না; যাঁহাকে ইনি আত্ম বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই লভ্য হয়েন;—তাঁহার নিকট ইনি (পরমাত্মা) স্বকীয়া তনূ প্রকাশ করেন।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে পূর্ণকাম পরতত্ত্বের আত্ম-বরণাভিলাষ স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে। তিনি বেদাধ্যাপনাদি অন্য কিছুতেই লভ্য হয়েন না; কিন্তু যাহাকে এই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব আত্মবরণ করেন, তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য হয়েন;—তাহার নিকট ইনি (অর্থাৎ এই পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপ যে শ্রীভগবান্) স্বকীয়া তনূ প্রকাশ করেন; অর্থাৎ ঘনীভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপে দেখা দেন।

ইহাতে একদিকে শ্রীভগবানের যেমন নিত্যই আত্মবরণের অভিলাষ ব্যক্ত হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে 'তাহা দ্বারা ইনি লভ্য হয়েন'—অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিদ্বারা লভ্য হইয়া ভক্তের নিকট আত্ম-বরণ করেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে। তাহা হইলে, যুগপৎ উভয়পক্ষেই পরস্পরকে বরণ ও পরস্পর কর্ত্তৃক বৃত হইবার অভিলাষ জাগ্রত হইলেই, পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে ইহাই জানিতে হইবে; অর্থাৎ যে ভক্ত শ্রীভগবানকে আত্মবরণ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক বৃত হইতে চাহেন, শ্রীভগবানও তৎকর্ত্তৃক বৃত হইয়া সেই ভক্তকে আত্মবরণ করেন। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে যথাক্রমে এই যে আত্মসাৎ করিয়া আত্মদান ও

আত্মদান করিয়া আত্মসাৎ,—উভয় পক্ষের যুগপৎ এই সমপ্রয়োজন সিদ্ধিরই অপর নাম—'মহামিলন'।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (৯।৪।৬৮)

অর্থাৎ সাধুসকল আমাতে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে। আমি সাধুগণের হৃদয় অবগত আছি। তাহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না;—ইহা শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানেরই নিজোক্তি; এবং ইহাই 'মহামিলনের' আত্মবিনিময় সংবাদ।

তিনি যে অনন্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তির কাছে সান্ত হইয়া আসেন, তিনি যে অসীম হইয়াও ভক্তের বাহুপাশে সসীম হইয়া ধরা দেন, তিনি যে নিস্পৃহ হইয়াও ভক্তকে প্রেমালিঙ্গনে বক্ষে ধরিতে চাহেন, তিনি যে নিরাকার হইয়াও ভক্তের প্রেমনেত্রের সম্মুখে পূর্ণ-রসময়-তনু প্রকট করেন, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও যে, ভক্তের নয়নপথে ও মানসপটে নিরন্তর প্রতিভাত হয়েন,—এই আশার বাণী কেবল ভক্তিবাদ হইতেই যেমন এই মরজগতে প্রচারিত হইয়াছে, তেমনি এই মহতী আশার সম্পূরণ কেবল ভক্তি দ্বারাই সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন;—

শ্রীভগবানের ভক্তি-বশ্যতা।

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্ত বন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিং।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্॥
(হরিভক্তিসুধোদয়ে।)

অর্থাৎ আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রেমরজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ, আমি অজিত হইয়াও ভক্ত কর্ত্তৃক বিজিত, এবং আমি অন্যের অবশীভূত

হইয়াও তাহাদের নিকট বশীভূত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধুগণের মমতা পরিহার পূর্ব্বক কেবল আমাতেই রতি বিধান করে, একমাত্র আমি তাহার এবং সে ব্যক্তিই আমার। আমাদের উভয়ের আর অপর সুহৃদ্ নাই।

শ্রীভগবান্ কেবল যদি আপ্তকাম, অনন্ত ও অচিন্ত্যাদিই হইতেন, তবে জীবের পক্ষে তাঁহার সহিত 'মহামিলনের' কোন আশাই থাকিত না; কিন্তু প্রেমধর্ম্মের অভয় বাণী জীবের নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন,—পূর্ণ স্বরূপভাব-জাগ্রত প্রত্যেক জীবকে 'মহামিলন' দান করিবার জন্য প্রসারিত-বাহুযুগে শ্রীভগবান্ নিত্যই প্রতীক্ষা করিতেছেন। যত ক্ষুদ্র—যতই দুর্ব্বল হউক্ না কেন সে, ভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ লালসায় জীব তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুইটি তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া একান্তভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে চাহিলেই—অগ্রসর হইয়া যাইতে না পারিলেও, শ্রীভগবান্ নিজেই আসিয়া তাহাকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক আত্মদান করিয়া থাকেন। তিনি জীবকে যদি নিজে না চাহিতেন,—জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার আবশ্যকতা—তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যদি না থাকিত,—যে তাঁহাকেই চাহিয়াছে তাহার হৃদয়-দুয়ারে তিনি যদি নিজেই না আসিয়া দাঁড়াইতেন,—তবে সেই প্রাণের প্রাণ—জীবনের চির-সহচর—আত্মার পরমাত্মা—সেই হৃদয়-বল্লভের সহিত মিলিত হইবার সকল আশা—সকল অভিলাষ অনন্ত শূন্যেই বিলীন হইয়া যাইত। তাই মনে হয়,—

'ছোট দুটি ভুজ-পাশে,
সে যদি না নিজে আসে,
অনন্ত মহান্ সে যে—
মিছে আশা তারে ধরা;

(তবে) মিছে আশা তার সাথে,
নীরব নিথর রাতে—
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে
প্রেম বিনিময় করা।'*

তাঁহাকে ধরিতে চাহিলেই তিনি ধরা দিতে নিজেই ছুটিয়া আসেন। ভ্রমর যেমন স্বেচ্ছায় ও সাধ করিয়াই কমলে আবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের হৃদয়-কমলে স্বেচ্ছায় - সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়েন। ইহা কেবল করুণাই নহে,—করুণার ঊর্দ্ধের কোনও এক আন্তরিকতা।

দাম্পত্য-বন্ধনে নবদম্পতি যেমন যুগপৎ উভয়েই উভয়কে বরণ করিয়া, উভয়ের দ্বারা উভয়ে বৃত হইতে চাহিলেই শুভ-মিলন সংঘটিত হয়,—পরস্পরকে প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের অন্তরে জাগ্রত হইলেই যেমন মিলন সম্ভব হয়—নচেৎ হয় না, সেইরূপ জীব-সমষ্টিকে ভক্তরূপে পাইবার জন্য, শ্রীকরে বরমাল্য লইয়া শ্রীভগবান্ নিত্যই অপেক্ষা করিতেছেন। জীব, ভক্তিভাবে—অকৈতব কৃষ্ণসেবা লালসায় ঊষার শিশিরসিক্ত কমলের মত—প্রেমাশ্রুপূর্ণিত নয়নে প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া, তদীয় রাতুল চরণোপরি নমিত মস্তকে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই, শ্রীভগবান্ সাগ্রহে—সানন্দে সেই জীবকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক আত্মবরণ করেন।

কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে, ভক্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভব হয়; এবং 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' পরতত্ত্ব যে কেবল ভক্তের ভক্তি দ্বারাই 'নয়নগোচর' হয়েন, শ্রুতিতে এই কথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে;—

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।' (প্রীতিসন্দর্ভধৃত (৬৫)—মাঠর শ্রুতি)

* পরমপূজ্যপাদ কবিরাজ শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি মহোদয় কৃত 'প্রেমাশ্রু' হইতে উদ্ধৃত।—প্রকাশক।

অর্থাৎ ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান; ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন; শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ; ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র, সর্ব্বাধীশ হইয়াও যে ভক্তাধীন এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও যে কেবল ভক্তিদ্বারাই প্রকাশ হয়েন—এ কথা তিনি উল্লাসভরে শ্রীমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন;—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

(শ্রীভাগবতে, ৯।৪।৬৩-৬৬)

অর্থাৎ আমি ভক্তাধীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। আমি ভক্তজনপ্রিয়। ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে।

যাহাদের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপন আত্মাকে এবং অত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

ফলতঃ যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ ও পরলোক পর্য্যন্ত সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি?

সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।

ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎসম্মিলন—ভগবৎসাক্ষাৎকার অপর কিছুতেই সম্ভব নহে। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভাঃ ১১।১৪।২১) অর্থাৎ আমি একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকি; এবং এই কথা আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঁ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না,—আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই।

তবে যে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ বা আংশিক-সবিশেষ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তাহাও জানিতে হইবে ভক্তির সংমিশ্রণ জন্যই। অর্থাৎ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগাদি সাধনের সহিত, যে পরিমিত ভক্তির সংমিশ্রণ থাকে, ভক্তি-সংমিশ্রণের তারতম্য অনুসারে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেরও পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ বা সঙ্গলাভ না করিলে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল ভজন-সাধনই অজাগলস্তনের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল। শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম সহজে সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিবার জন্য, তাই পরমপূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন;—

ভক্তির সহায়তা ভিন্ন জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মাদির সার্থকতা নাই।

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥' (মধ্য ২৪।৬৫-৬)

শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন, ভক্তির সহায়তায় বা সঙ্গলাভ করিয়াই সিদ্ধ হয়; এই জন্য উহাদিগকে 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা'

ভক্তিই বলা হইয়া থাকে। যাঁহার সম্বন্ধাভাসে ও সম্বন্ধে অন্যান্য সাধন সকল সুপ্রসিদ্ধ হয়েন—নচেৎ হয়েন না, পরিপূর্ণস্বরূপে ভগবৎসাক্ষাৎকার বা সম্মিলনের পক্ষে সেই বিশুদ্ধা ভক্তির প্রভাব যে কতদূর অচিন্তনীয়,—সে কথা লৌকিক ভাব ও ভাষার পক্ষে প্রকাশ করিবার কোনই সামর্থ্য নাই। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য-নিরপেক্ষা, বিশুদ্ধা ভক্তি-বল্লীই শ্রীভগবৎ-কল্পতরুর সহিত জীবের মহামিলনের একমাত্র সংযোগ-সূত্র।

ভক্তির সহায়তা ব্যতীত, জ্ঞান, কর্ম্মাদির সার্থকতা না থাকায়, ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনাদর শাস্ত্রে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার প্রমাণস্বরূপ কেবল কয়েকটি শ্লোক মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানের নিরর্থকতা বিষয়ে; যথা,—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (শ্রীভাগবতে ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে প্রভো! নিখিল পুরুষার্থের আকর স্বরূপ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য শ্রম করে, তাহারা তণ্ডুলহীন তুষ সকলে অবঘাতকারীর মত কিছুমাত্র লাভবান না করিয়া কেবল ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয়।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (শ্রীভাগবতে ১।৫।১২)

উপাধিরহিত বিমল ব্রহ্ম জ্ঞানও অচ্যুতভাব বর্জ্জিত অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে যখন শোভনীয় হয় না, তখন দুঃখস্বরূপ ও দুঃখপ্রায় যে কাম্যকর্ম্ম

এবং নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহা যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে শোভা পাইবে।

ভক্তি বর্জ্জিত জ্ঞানের ন্যায় ভক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্মাদির নিরর্থকতা ও দোষ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য ; যথা,—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়া।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যতিচারবৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭২ ধৃত স্কন্দপুরাণ বাক্য)

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া সকল যদি হরি-ভক্তি সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশভোগ মাত্রই ফল হইয়া থাকে ; অধিকন্তু উহা কুলটা রমণীর ব্যভিচার সদৃশই দোষাবহ।

যাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া অপর কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না,—যিনি কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপে বা স্বয়ংই সিদ্ধ হয়েন,—কৃষ্ণ-সেবাতাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়—অপর কোনও অভিলাষ যাঁহাতে লেশ মাত্রও নাই,—তিনিই ভগবৎ-বশীকারিণী 'শুদ্ধাভক্তি'। নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া, পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ, তদীয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তির নিম্নোক্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

শুদ্ধাভক্তি লক্ষণ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (১।১।১১)

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধীয় যে কিছু অনুশীলন অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও বাচিক চেষ্টা,—তাহা যদি তদীয় প্রতিকূল না হইয়া তদনুকূল অর্থাৎ রুচিকর হয়, তাহাকে 'ভক্তি' কহে। [ইহা ভক্তির স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ।] আর সেই ভক্তি যদি অন্য অভিলাষশূন্যা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদি

কর্ত্তৃক অনাবৃতা অর্থাৎ অমিশ্রিতা হয়, তবে তাহাকেই 'উত্তমাভক্তি' বলা যায়। [ইহা ভক্তির তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ]

উত্তমা-ভক্তির উদয়েই জীবত্ব পরিপূর্ণ সার্থকতাকে বরণ করিয়া চিরধন্য হইয়া যায়। আপ্তকাম শ্রীভগবানের অন্তরে কেবল একটি বাঞ্ছা—একটি প্রয়োজন নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে। অনন্ত শুদ্ধভক্তের সহিত নিত্য মিলিত থাকিয়াও জীবকোটি হইতে অনন্ত শুদ্ধভক্তের সম্মিলন লাভ করাই তাঁহার সেই অভিলাষ। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে, কেবল সেবার্থে ভগবৎ সম্মিলন ভিন্ন জীবেরও অন্তরে অন্য কোনও অভিলাষ আর জাগে না। জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানকে পাইবার লালসা পরিপূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিলেই 'মহামিলনের'ও বিলম্ব হয় না।

শ্রীভগবান্ জীবকে তাহার পূর্ণস্বরূপে বা ভক্তরূপে সর্ব্বদাই পাইতে চাহেন। ভগবানের দিক হইতে এ 'চাওয়া' যেমন নিত্যই রহিয়াছে, সেইরূপ জীবের দিক হইতে ভগবানকে 'চাওয়া' জাগিয়া উঠিলেই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা যে, ভগবানকে পাই না, তাহার কারণ তিনি সুদুর্লভ বলিয়া নহে,—আমরা তাঁহাকে চাহি না বলিয়া। যাহা চাহিলেই পাওয়া যায়, তাহা হইতে সুলভ বস্তু আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবানকে যখন চাহিলেই পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে 'দুর্লভ' না বলিয়া 'সুলভ' বলাই সঙ্গত; কিন্তু এমন সুলভ বস্তুও যে, জীব-সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াই রহিয়াছেন,—সে দুর্দ্দৈবের একমাত্র কারণ, জীবের দিক হইতে তাঁহাকে 'চাওয়া' নাই বলিয়া। যেখানে পরস্পরকে পাওয়া পরস্পরের প্রয়োজন,—যেখানে উভয় দিকেই উভয়কে 'চাওয়া' আছে,—সেখানে উভয়ের মিলন দুর্লভ না হইয়া সুলভ বা সহজ সাধ্যই হওয়া উচিত। ভগবানের অন্তরে, জীবমাত্রকে ভক্তরূপে

ভগবান্‌কে না চাওয়াই ভগবান্‌কে না পাইবার কারণ।

পাইবার প্রয়োজনবোধ যেমন নিত্যই জাগ্রত, সেইরূপ জীব-হৃদয়ে তাঁহাকে পাইবার লালসা তেমনি করিয়া জাগিয়া উঠিলেই তখন 'মহা-মিলনের' আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হয় না; অতএব শ্রীভগবৎ-সম্মিলন জীবের পক্ষে বাস্তবিক অত্যন্ত সুলভ হইলেও, তাহা যে সুদুর্লভ হইয়াই রহিয়াছে—'তাঁহাকে না-চাওয়াই' 'তাঁহাকে না-পাওয়ার' একমাত্র কারণ। আমরা সমস্তই চাহিয়া থাকি; কিন্তু যাহা চাহিলে সকল চাওয়ার অবসান হয়, —অবিদ্যা-বিড়ম্বিত জীব আমরা কেবল সেই চাওয়াই চাহিতে পারি না,—আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব!

'চাওয়ার' স্বরূপ নির্ণয়।

এখন প্রকৃতপক্ষে 'চাওয়া' কাহাকে বলে, আমাদিগকে সহজে তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে। বিষয়ী জীব যে ভাবে বিষয় চাহে, আতুর যেমন আরোগ্য চাহে, পিপাসাতুর যেমন জল চাহে, ক্ষুধাতুর যেমন অন্ন চাহে, অর্থাতুর যেমন অর্থ চাহে,—'চাওয়া' ইহারই নাম। এই ভাবে ভগবানকে চাহিবার নামই 'প্রেম-ভক্তি'। তাই ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

যুবতীনাং যথা যূনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৮৯ অধ্যায়)

এই প্রকার 'চাওয়া' ভগবানের জন্য হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। 'চাওয়া' আমাদের নিত্যই আছে। 'চাওয়া' জীবের নিত্যসিদ্ধা-বৃত্তি। কিছু না চাহিয়া জীব ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। অবিদ্যাচ্ছন্ন—স্বরূপভ্রান্ত জীবের অনাদি বহির্মুখতা বশতঃ সেই 'চাওয়াটি' যতক্ষণ প্রাকৃত বিষয়ে প্রযুক্ত থাকে, সেই সগুণা বৈষয়িকী বৃত্তিই 'কাম' নামে অভিহিত হয়; আর যখন কোনও অতিভাগ্য বলে সেই 'চাওয়া' শ্রীভগবানকেই পাইবার

'কাম' ও 'প্রেমের' পার্থক্য।

জন্য কোনও জীবের অন্তরে জাগিয়া উঠে, তখন সেই নির্গুণা ভাগবতী বৃত্তিই 'প্রেম' নামে কীর্ত্তিতা হয়েন।

'কাম' বা বিষয় চাওয়া,—সংসার-চক্রে চির আবর্ত্তিত হইবার কারণ; আর 'প্রেম' বা ভগবান্ চাওয়া, পূর্ণানন্দের অতল-তলে চির নিমগ্ন থাকিবার একমাত্র উপায়;—

'অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥' (—চরিতামৃতে, আদি ৪।১৪৭)

'চাওয়া' পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে 'পাওয়া' যায় না। ধন, ধান্যাদি বিষয় সকল আমরা যে ভাবে প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করি, ইহারই নাম পরিপূর্ণ বা অকপটভাবে 'চাওয়া'; সেইরূপ পরিপূর্ণ চাওয়া ভগবানের জন্য হইলেই, সেই পূর্ণ প্রেমের উদয় মাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। শ্রীভগবান্ যাহার নিকট অপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন,—অবশ্যই জানিতে হইবে তাহার অন্তরে 'চাওয়ার' অসম্পূর্ণতা আছেই। চাওয়ার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ব্যতীত শ্রীভগবানকে না পাইবার অপর কারণ নাই। যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন নাই,—তিনিই যে, ভগবানকে যথার্থরূপে চাহেন নাই—ইহা সুনিশ্চয়।

হয়ত' অনেকেই স্বীকার করিতে না পারেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানকে চাহেন না; অথবা এমন অনেক সাধক-ভক্ত বা ভাগ্যবান্ রহিয়াছেন, যাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্য ও তৎসহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি ও আকুলতা দর্শন করিয়া, অন্ততঃ তাঁহারাও যে ভগবানকে চাহেন নাই, এ-কথা হয়ত' সহজে কেহ স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না। এরূপ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরিপূর্ণ বা অকপট রূপে 'বিষয়-চাওয়া জীব' যেমন ভগবানকে একেবারেই চাহে না, সেইরূপ সাধক ভক্তগণ যে, একেবারেই ভগবানকে চাহেন না, তাহা নহে; তাঁহারা

'চাওয়ার' পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা ভেদেই সিদ্ধ ও সাধকাবস্থা ভেদ।

ভগবানকে চাহিলেও, সাধক-দশা উত্তীর্ণ না হওয়া অবধি, তাঁহাদের সেই 'চাওয়ার' মধ্যে কিছু কিছু 'না-চাওয়া' লুকাইয়া থাকে। যেমন 'হাজার বাতি' আলোকের মধ্যেও যে, অন্ধকার মিশান আছে, এ-কথা তখনই বুঝিতে পারা যায়—যখন সেখানে দু-হাজার বাতির আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়; সেইরূপ 'ভগবান-না-পাওয়া' সাধক ভক্তগণের ভক্তি বা 'ভগবান্-চাওয়ার' মধ্যে কতটা 'না-চাওয়া' মিশাইয়া আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা তখনই উপলব্ধি করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতা আর এক স্তর ঊর্দ্ধসীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেমোদয়ের ক্রম বা স্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

প্রেমোদয়ের ক্রম।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।৪।১৫-১৬)

অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে; সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

প্রেমোদয়ের এই যে ক্রম বা স্তরের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—পরিপূর্ণরূপে ভগবান্ চাহিবার ইহাই ক্রমিক অবস্থা। 'শ্রদ্ধা' হইতে 'ভগবান্ চাওয়ার' আরম্ভ এবং সেই 'চাওয়া' ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইয়া 'প্রেমের' উদয়ে তাহার পূর্ণতার পর্য্যবসান। (প্রেমেরই আবার স্নেহাদি ক্রমে যে সকল অবস্থা-বিশেষের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা মূল ভক্তি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।) প্রেমের অর্থ—

পরিপূর্ণরূপে বা একান্তভাবে ভগবানকে চাওয়া। তাই বলিতেছি, প্রেমোদয়ের পূর্ণস্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সাধন-ভক্তি ও ভাব-ভক্তির ক্রমানুসারে সাধক-ভক্তহৃদয়েও তাঁহাদের 'ভগবান্ চাওয়ার' মধ্যে কিছু কিছু 'না-চাওয়া' মিশ্রিত থাকে; সুতরাং শ্রীভগবানও সাধক-ভক্তগণের 'চাওয়ার' অনুপাতে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, 'না-চাওয়ার' অনুপাতে দূরবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যিনি ভগবানকে যত বেশী চাহিয়াছেন—যিনি 'পরিপূর্ণ চাওয়া' বা 'প্রেমের' যত সন্নিকটতর হইয়াছেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে ততই আসন্ন বলিয়া জানিতে হইবে। সাধকগণের এই 'না-চাওয়া' মিশ্রিত 'ভগবান চাওয়া' যে মুহূর্ত্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ যে 'চাওয়ার' মধ্যে আর লেশমাত্রও 'না-চাওয়া' লুকান থাকিবে না,—'ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি'—তখনই সেই 'চাওয়া' প্রেম-সূর্য্য রূপে উদিত হয়েন। দিবাকরের উদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ হয়, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হয়েন।

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম ভগবান্ সুলভই বটেন; কিন্তু দুর্লভ হইয়াছেন তিনি—শুধু আমরাই তাঁহাকে চাহি না বলিয়া।

বিম্বের সহিত দর্পণস্থিত-প্রতিবিম্বে, বিষয়ে একতা থাকিলেও যেমন সংস্থিতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, (অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ বিম্বের প্রতিবিম্ব যেমন পশ্চিমাভিমুখ ইত্যাদি প্রকারে পরিলক্ষিত হয়)—প্রতিবিম্ব-স্থানীয় বহির্মুখ জাগতিক ব্যাপারের সহিত জীবের অন্তর্মুখ-ভাব বা বিম্বস্থানীয় ভগবদ্ভক্তির সেইরূপ সম্বন্ধ।

বিষয় চাওয়া সুলভ কিন্তু পাওয়া দুর্লভ; ভগবান্ চাওয়া দুর্লভ কিন্তু পাওয়া সুলভ।

সংসারী জীবমাত্রেই নিরন্তর বিষয়াভিলাষ করে,—বিষয় চাহে, কিন্তু বিষয়সকল প্রায়ই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। কদাচিৎ কেহ পায়; অধিকাংশ স্থলেই অকপটে বা পূর্ণরূপে বিষয় চাহিয়াও মায়িক ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয় কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়।

যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত কুক্কুর সকল, বারম্বার তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়াও যেমন খাদ্য প্রাপ্তির আশায় তদভিমুখে বারম্বার ধাবিত হয়, মোহান্ধ জীবকে মায়িক বিষয়সুখ সেই প্রকার বারম্বার উপেক্ষা করিলেও, জীব তৎপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না; অতএব বদ্ধ জীবমাত্রের বিষয়সুখ 'চাওয়া' স্বাভাবিক ও সুলভ কিন্তু অকপটে চাহিলেও সেই বিনশ্বর বিষয়সুখ 'পাওয়া' অতীব দুর্লভ; আর শ্রীভগবানকে 'পাওয়া' অতি সুলভ,—যে-হেতু চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাকে 'চাওয়া' অতি সুদুর্লভ। 'বিষয়-চাওয়া' সুলভ বা সহজসাধ্য বলিয়া, ক্রিমি-কীট পর্য্যন্ত সকলেই বিষয় চাহিতে পারে ও চাহিয়া থাকে। কীটেতেও যে বৃত্তি সুলভ, তাহার মূল্যই বা কি আছে? তাই ইহা অন্ধতম 'কাম' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; কিন্তু 'ভগবান্ চাওয়া' সুদুর্লভ; এমনকি দেবতাতেও সে বৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই জন্য এই সুদুর্লভ 'ভগবান-চাওয়া' নির্ম্মল ভাস্কর স্বরূপ 'প্রেম' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই 'প্রেম' বা 'পরিপূর্ণরূপ ভগবান্-চাওয়া' ত্রিভুবনে একান্তই দুর্লভ! মহৎকৃপাদি জনিত কোন ভাগ্যে এই সুদুর্লভ 'চাওয়া' জীবের অন্তরে উদিত হইলেই, ভগবান্ 'পাওয়া' অত্যন্ত সুলভ বা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবান্ অতিশয় সুলভ বস্তু। যাহা চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, তাহাকে 'সুলভ' না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু তাঁহাকে চাওয়াই অতীব দুর্লভ। যে প্রকার আমরা বিষয় সুখ প্রার্থনা করি,—প্রার্থনা করিয়াও প্রায়ই তৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি, ঠিক সেই প্রকারে যদি শ্রীভগবান্‌কে চাহিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাতে বঞ্চিত হইতাম না। অকপটে তাঁহাকে চাহিয়া কেহ কখনও বঞ্চিত হয় নাই। হা দুর্দ্দৈব! আমরা এমন 'সুলভ' মহা-সম্পদ কেবল না

চাহিয়া 'দুর্লভ' করিয়া রাখিয়াছি, ইহা হইতে আমাদের প্রতি অবিদ্যার প্রতারণা আর কি হইতে পারে!

শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবার অন্য কোনও সাধনা নাই; তাঁহাকে পাইবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়—তাঁহাকে চাওয়া; কিন্তু সেই চাওয়াই সুদুর্লভ বলিয়া, যাহা কিছু সাধন-ভজনের কথা—সে কেবল চাহিতে পারিবার সাধন;—নচেৎ ভগবানকে পাইবার জন্য একমাত্র 'চাওয়া' ভিন্ন অন্য কোনও সাধনা নাই। যাহাতে জীবের হৃদয়ে সেই 'চাওয়া' জাগে,—বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রাণ যেমন কাঁদে, যাহাতে শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ তেমনি করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—তাহার জন্যই সাধন-ভজন। অবিবেকী—বিষয়াসক্ত জীবের বিষয়-সুখ প্রাপ্তির জন্য যে অনুরাগ—ভক্ত তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—হে নাথ! তোমাতে যেন আমার অন্তরের অনুরাগ সেই ভাবে ধাবিত হয়;—

ভজন-সাধন, ভগবানকে পাইবার জন্য নহে—ভগবানকে চাহিবার স্পৃহা অন্তরে জাগাইবার জন্য।

'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥' (বিষ্ণু পুরাণ ১।২০।১৯)

শ্রীভগবৎ-সেবাভিলাষে তাঁহাকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠার নামই 'প্রেম';—ভগবানকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া চাহিবার নামই 'প্রেম'। জীব-হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইবামাত্র ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদ-পদ্ম-মধুপ—জীব-হিতৈকব্রত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, শ্রীভগবানকে 'প্রয়োজন' রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া, প্রেমকেই 'প্রয়োজন তত্ত্ব' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই প্রেম-ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, জীবের জীবত্ব পূর্ণ সফলতাকে বরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না।

'ভগবান-চাওয়া' বা প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।

যে দ্রব্য চাহিবামাত্রই পাওয়া যাইতে পারে,—একান্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা বশতঃ মুমূর্ষু রোগী, কেবল চাহিবার শক্তিহীনতার জন্য যেমন তাহা প্রাপ্ত হয় না,—সেইরূপ 'পরমানন্দ' বা শ্রীভগবানকে চাহিতে পারিলেই পাওয়া যায় ইহা অতীব সত্য হইলেও, ভবরোগ-ক্লিষ্ট অবসাদগ্রস্ত জীবাত্মা এতই বলহীন যে, সে 'চাওয়া' চাহিবার শক্তি পর্য্যন্তও তাহার বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই অপরিসীম আত্ম-দৌর্ব্বল্যই সংসারী জীবের পক্ষে শ্রীভগবানকে না চাহিবার—অতএব না পাইবার কারণ। জীবাত্মার এই বলহীনতাই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবার পথে প্রধানতম অন্তরায়। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়া থাকেন ;—

ভগবানকে চাহিবার পক্ষে জীবাত্মার বলহীনতা ও তাহার কারণ।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। (মুণ্ডক°।৩।২।৪)

অর্থাৎ এই পরমাত্মা (বা পরতত্ত্ব) হতবল জীবাত্মা কর্ত্তৃক লভ্য হয়েন না। আত্মার এই অবসাদ ও বলহীনতার কারণ কি? এখন তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অবিদ্যার ঘনান্ধকারে স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের দেহাত্মবোধ নিবন্ধন, অনাদি-কাল হইতে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' বা 'আত্ম' বুদ্ধি থাকায়, সেই মিথ্যা 'আমির' তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য, জন্মে জন্মে তৎ-স্বজাতীয় বা জড়ীয় আহার-বিহারাদির অবিশ্রান্ত তর্পণে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিরই বলাধান সংঘটিত হইয়া থাকে ; সুতরাং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিই বলবান। অপরপক্ষে আত্মস্বরূপ বা চিৎকণ জীবাত্মার কথা বিস্মৃত হওয়ায়, আত্ম-স্বজাতীয় বা চিন্ময় আহার বিহারাদি বিষয় হইতে সেই সত্য 'আমি' বা জীবাত্মা চির-বঞ্চিতই রহিয়াছে ; এই জন্যই আত্মা বলহীন ও অবসাদগ্রস্ত। আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত জীবের পক্ষে, আত্মার স্বধর্ম্ম বা স্বভাব সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞতা স্বাভাবিক। চিদাত্মার স্বভাব অজ্ঞাত বলিয়াই, তাই আমরা যে

অবিশ্রান্ত আহার বিহারাদি জড়ীয় বিষয়ের তর্পণে আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-পুষ্টির প্রয়াস করিয়া থাকি, তাহাতে জড় দেহেন্দ্রিয়াদির বলাধান সাধিত হইলেও যে, সেই বিজাতীয় বিষয়ের দ্বারা কখনই চিন্ময় জীবাত্মার বলাধান ও তুষ্টিবিধান সাধিত হইবার নহে,—সে-কথা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-পুষ্টির মানসে যথার্থ আত্মাকে যে, এইরূপে চির উপবাসী ও চির দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছি,—ইহা আমাদের প্রতি অবিদ্যার ছলনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। স্বজাতীয়া বলিয়া নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মার একমাত্র স্বাভাবিক পথ্য। ভক্তি-রসায়ন ভিন্ন—প্রেমসুধা ব্যতীত চিৎকণ জীবাত্মার বলাধানোপযোগী অপর কোনও খাদ্য বা পানীয় নাই। ধরণী পৃষ্ঠে কত শত নদ, নদী, প্রস্রবণ—কত জলাশয় বিদ্যমান থাকিতেও সুনীল আকাশ সঞ্চারী মেঘমালা হইতে বারিবিন্দু বর্ষিত না হওয়া অবধি যেমন তৃষিত চাতককে প্রাণভরা পিপাসা লইয়াই দিনের পর দিন কাটাইতে হয়, সেইরূপ জড়জগতে জড়ীয় আহার বিহার সামগ্রী স্তূপীকৃত থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-শ্যামলাকাশ সঞ্চারী ভক্তি-মেঘাম্বুর কণামাত্রও সেবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত—জীব-চাতককেও চির-ক্ষুধিত—চির-তৃষিত—চির-অতৃপ্ত থাকিতেই হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। একান্ত বলহীনতা প্রযুক্ত ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টতঃ আত্মার সেই ক্ষুধা ও পিপাসার প্রকাশ হয় না। শ্রীভগবানকে চাহিবার শক্তিশূন্যতাই জীবাত্মার শ্রেষ্ঠতম বলহীনতার পরিচায়ক। না চাহিতে পারিবার দুর্ব্বলতাই জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মবস্তু লভ্য না হইবার কারণ।

ভক্তি-মেঘাম্বুই জীব-চাতকের একমাত্র স্বাভাবিক পথ্য।

প্রকৃষ্টরূপে 'ভগবান্-চাওয়ার' অপর নাম 'প্রেমভক্তি'। 'প্রেম-ভক্তি' বা 'ভগবান্-চাওয়া'-সামর্থ্য, 'সাধন-ভক্তি'-রূপ আত্মার অমৃত-

ময় পথ্যের সংযোগ দ্বারাই সুসিদ্ধ হইতে পারে। জড়দেহের শক্তি যেমন প্রাকৃত অন্নরসেরই পরিণতি, সেইরূপ চিন্ময় জীবের পক্ষে 'ভগবান্-চাওয়া'-সামর্থ্য বা 'প্রেম-ভক্তি', নির্গুণা, 'সাধন-ভক্তি' রসেরই পরিণতি বা পরিপক্কাবস্থা। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় অনুকূলতাময়ী শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিরূপা কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টার প্রারম্ভদশার নাম 'সাধন-ভক্তি'। 'সাধন-ভক্তি'রূপ নির্গুণ পথ্য বা স্বজাতীয় আহার-বিহারাদি দ্বারা বলহীন জীবাত্মার ক্রমশঃ বলাধান ঘটিলে, তখন 'ভগবান্ চাওয়া-শক্তি' বা প্রেমের উদয় মাত্র সেই 'পরমানন্দ' বা পরতত্ত্বের পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হতবল জীব যে কেবল ভগবান্‌কে চাহিতেই অসমর্থ, তাহা নহে,—জীবাত্মার এতই দৌর্ব্বল্য যে, যাহার সেবনে 'ভগবান-চাওয়া' সম্ভব হয়, সেই 'সাধন-ভক্তি' রূপ নির্গুণ পথ্য চাহিবার ও তৎসেবনের জন্য উন্মুখ হইবার ক্ষমতাও তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মায়াহত বলহীন জীবাত্মার জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত বলিয়া, তাহার পক্ষে কোন চিদ্বস্তু চাহিবার ক্ষমতা নাই। কোনও ভাগ্যে চিন্ময় জীবের চিন্ময় বিষয় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কিম্বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইলে, স্বরূপতঃ তাহাকেই জীবের জীবত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। আর দেহাত্মবোধ-বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত জীবের পক্ষে জড়ীয় আহার বিহারাদি বিষয়ের জন্য যে, অবিশ্রান্ত উদ্যম ও আর্ত্তনাদ, উহা আত্মার বৃত্তি—আত্মার বাণী নহে,—দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহেরই ক্ষুধিত চীৎকার! চির-উপবাসী ও অবসন্ন আত্মার ক্ষীণস্বর জড়তার কোলাহলের মধ্যে শ্রবণ করা যায় না বলিয়া, আমরা ইন্দ্রিয়াদির চীৎকারকেই ভ্রম বশতঃ আত্মস্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকি এবং তৎফলস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানকেই আত্মতৃপ্তি

প্রেমভক্তি বা 'ভগবান-চাওয়া-সামর্থ্য',—সাধন-ভক্তিরূপ চিন্ময় পথ্যের পরিণতি।

জীবাত্মার-বাণী ও দেহেন্দ্রিয়ের আর্ত্তনাদ—উভয়ের ভিন্নতা নির্ণয়।

বলিয়াই মনে করি; বস্তুতঃ উহাকেও অবিদ্যার প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

চিন্ময় বস্তু নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ। স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে—স্বরূপায় ধরা না দিলে আমাদের সগুণ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা নাই। স্ব-সামর্থ্যে চাহিবার যোগ্যতা না থাকিলেও, দুগ্ধপোষ্য দুর্ব্বল শিশু স্তন্যপানের জন্য কিঞ্চিৎ উন্মুখতা প্রকাশ করিলেই, করুণাময়ী জননী যেমন স্বয়ং অগ্রসর হইয়াই তাহাকে স্তন্যদান করেন, তদ্রূপ বলহীন জীবের বলাধানের পক্ষে যাহা একমাত্র স্বাভাবিক ও সুপথ্য,—সেই সাধনরূপা চিন্ময়ী ভক্তিকে স্ব-সামর্থ্যে গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা না থাকিলেও, তৎসেবনে কেবল কিঞ্চিন্মাত্র উন্মুখতা দৃষ্ট হইলেই, তিনি স্বয়ংই কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকেন। তাই ভক্তিশাস্ত্রে জীবের প্রতি স্বপ্রকাশ ভক্তিদেবীর এই অত্যাশ্চর্য্য কৃপার কথাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে;—

জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশ ভক্তির আবির্ভাব পক্ষে কেবল কিঞ্চিৎ তৎ-সেবোন্মুখতার অপেক্ষা।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।২৩৪)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীভগবন্নাম-গুণ-লীলাদি বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি রূপা নির্গুণা সাধন-ভক্তিকে স্ব-সামর্থ্যে, কর্ণ, জিহ্বাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা জীবের গ্রহণযোগ্যতা নাই বলিয়া, এবং তৎ-সহায়তা ও তৎসঙ্গ ব্যতীত চিৎকণ জীবের পক্ষে জড়স্তূপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বরূপভাব প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই দেখিয়া—হতবল জীবাত্মার পক্ষে উহা চাহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত না থাকিলেও, কেবল কোন প্রকারে উহা সেবনের জন্য যদি কিঞ্চিৎ উন্মুখতাও

পরিদৃষ্ট হয়, তবে স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাদি রূপা 'সাধন-ভক্তি' তৎসেবোন্মুখ জীবের প্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

জড়স্তূপের অন্তরালে সন্নিহিত ও চেতনাহত জীবকে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বরূপে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীভগবান্ ভক্তিদেবীর দ্বারা এতাদৃশী কৃপার বিস্তার করিলেও, জীবের দুর্গতির সীমা এতই বিস্তীর্ণা যে, সে কৃপা-প্রবাহও তাহার দুর্দ্দৈব-মরু অতিক্রম পূর্ব্বক তৎসমীপে পৌঁছাইতে পারে নাই; যে-হেতু উন্মুখ হইলেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইবার সঙ্কল্পে ভক্তিদেবী প্রতীক্ষাপরায়ণা থাকিলেও, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা 'সাধন-ভক্তি' সেবনের জন্য সংসারী জীব-সাধারণের কিঞ্চিৎ উন্মুখ হইবার মত আত্মশক্তিও অবশিষ্ট নাই। মৃতদেহে কেবল যে পথ্যাদি চাহিবার শক্তিই বিলুপ্ত তাহা নহে, তৎ-সেবনের জন্য লেশমাত্র উন্মুখ হইবার মত জীবনীশক্তির চিহ্নও আর তাহাতে যেমন লক্ষিত হয় না, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মায়া বা জড়ের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, জীব এমনই জড়তাগ্রস্ত—এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছে যে 'মায়াহত' জীবের পক্ষে 'সাধন-ভক্তি' রূপ স্বাভাবিক পথ্য গ্রহণে লেশমাত্রও উন্মুখতা জাগিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অত্যধিক আহত বা মুমূর্ষু ব্যক্তিতেও কিঞ্চিৎ জীবন-লক্ষণ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জীব, মায়া কর্ত্তৃক কেবল 'আহত' হইলেও তদবস্থায় হয় ত' ভক্তি সেবনের জন্য কিঞ্চিৎ উন্মুখতা সম্ভব হইত; কিন্তু জীব আহত বা মুমূর্ষু নহে—মায়া কর্ত্তৃক 'হত' বা মৃত; সুতরাং মৃতবৎ জীবের পক্ষে স্বতঃ ভক্তি-সেবনের 'উন্মুখতা' সম্ভব হইতেই পারে না। 'মায়াহত' জীব ভক্তিদেবীর মহতী কৃপার সীমাকেও স্বীয় অপরিসীম দুর্দ্দৈব দ্বারা এইরূপে অতিক্রম করিয়াছে।

সংসারী জীব 'মায়াহত' সুতরাং মৃতের পক্ষে স্বতঃ ভক্তি-সেবোন্মুখতা অসম্ভব।

জীবাত্মা চিন্ময় পদার্থ; অতএব নির্গুণ বা অপ্রাকৃত বস্তু। নির্গুণ পদার্থে নির্গুণ ধর্ম্ম ও সগুণ বা প্রাকৃত বস্তুতে সগুণ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। জীবের যাহা নির্গুণভাব, তাহাই জীবত্ব বা জীবের আত্মধর্ম্ম; আর যাহা কিছু সগুণ বা প্রাকৃত ভাব, তাহাই জড়ত্ব বা জড়ধর্ম্ম। অবিদ্যা বা জীবমায়া, চিদণু জীবকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া, তাহারই চেতনায় দেহেন্দ্রিয়াদি জড়ীয় পদার্থ সকলকে চৈতন্যযুক্ত করিলেও উহারা সগুণ বা জড়বস্তু বলিয়া, উহা হইতে নিরন্তর জড়ধর্ম্ম বা মায়িকী-বৃত্তিই প্রকাশ পাইতেছে। জীবমায়া কর্ত্তৃক স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের বিরূপতা বা জড়াত্মবোধ নিবন্ধন তাহাতে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, অনাদিকাল হইতেই জীবের স্বধর্ম্ম বা নির্গুণভাব বিলীন হইয়াছে। চিন্ময় জীবাত্মা নিত্যবস্তু,—সুতরাং মৃত্যুহীন বা অমৃত। ধর্ম্মী বা জীব কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু মায়া-প্রভাবে তদ্ধর্ম্ম বা জীবত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবত্বহীন জীবকেই 'মায়াহত' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 'মায়াহত-জীব' বলিতে 'মায়া কর্ত্তৃক জীব হত বা মৃত' এরূপ অর্থ নহে; মায়া কর্ত্তৃক জীবত্বে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, জীবের জীবত্বই হত বা মৃতবৎ জড়তাগ্রস্ত। এক কথায়, জীবত্বহীন জীবকেই 'মায়াহত জীব' বলিয়া জানিতে হইবে। দেহাদি জড়ে ক্ষুৎ-পিপাসাদির অনুভব রূপ চেতনা-শক্তির প্রকাশ ও চৈতন্য স্বরূপ জীবে দেহাত্মবোধরূপ জড়ত্ব,—এই ভাববিপর্য্যয় অসম্ভব হইয়াও অচিন্ত্য মায়াশক্তি কর্ত্তৃক সম্ভব হয় বলিয়াই মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' বলা হইয়া থাকে।

'মায়াহত-জীব' অর্থে—'হতজীব' নহে, 'জীবত্ব-হত' জীব।

জড়ীয় দেহাদি বিষয়ে আত্মবোধ নিবন্ধন জীবের স্বরূপভাবের বিরূপতা বা জড়তা বশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যাবতীয় ক্রিয়াশক্তির উদ্গম হইয়া থাকে, সে-সমস্তই সগুণভাব বা জড়ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। মৃতদেহ রৌদ্রে প্রতপ্ত, বায়ুকর্ত্তৃক বিশুষ্ক, সলিলে স্ফীত,

ঝটিকায় উৎক্ষিপ্ত, স্রোতবেগে চালিত ও তরঙ্গে কম্পিত হইতে দেখা যাইলেও, যেমন সেই ক্রিয়াশীলতা দ্বারা তাহার মৃতত্বের অপনোদন হয় না,

জীবের জড়ত্ব বা মৃতত্ব নির্ণয়।

সেইরূপ জীবের জড়ত্ব বা অবিদ্যাচ্ছন্ন জ্ঞান হইতে যে কিছু ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়,—অবিদ্যা-সংবৃত জীবে যাহা কিছু ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সকলই শবের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় জড়ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আনুকূল্যে ভগবদনুশীলন অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তি-সম্বন্ধ ভিন্ন জীবের যাহা কিছু কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা, তৎসমুদয়কে জড়ত্ব বা মৃতত্ব বলিয়াই জানা আবশ্যক। প্রাকৃত বা সগুণ-ভাব মাত্রেই জড়ত্ব বা জড়ধর্ম্ম। ভক্তি নির্গুণা; অতএব ভক্তিভাব ভিন্ন, মায়াহত জীবের আত্মভাব বা জীবন-লক্ষণ অপর কোনও ক্রিয়াশীলতা দ্বারা প্রকাশ হয় না। মহাপ্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তীর অরিজয়ী অদম্য উৎসাহই হউক, কিম্বা উন্নতিশীল উদীয়মান্ তরুণের অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতাই হউক, অথবা জীর্ণ-কুটিরের নিভৃত প্রান্তশায়ী—তন্দ্রালসে নিমগ্ন কর্ম্মহীন জীবনের অলসতাই হউক,—ভগবদ্ভক্তিভাবের স্ফুরণ ব্যতীত, তৎসমুদয়ই জড়ত্ব বা মৃতত্বের পরিচয় ভিন্ন তন্মধ্যে অণুমাত্রও জীবত্ব বা আত্মধর্ম্মের প্রকাশ নাই। নির্গুণা ভক্তিভাবের উন্মেষ যে জীবে, যে পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে, সেই জীবের জীবত্ব বা জীবনের লক্ষণ সেই পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অলসতাদি তমোভাব হইতে কর্ম্মতৎপরতাদি রজোভাব শ্রেষ্ঠ ও অহিংসা-আত্মত্যাগাদি সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠতর হইলেও প্রাকৃত বা সগুণভাব মাত্রেই জড়ত্ব; সুতরাং কেবল সত্ত্বাদি লক্ষণ দ্বারা নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত জীবের জীবত্বের প্রকাশ হয় না। নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মার আত্মধর্ম্ম বলিয়া, এই নির্গুণ-ভাবের অধিকতর সন্নিহিত ও দূরত্ব বশতঃই যথাক্রমে তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ এবং সত্ত্ব হইতে

রজঃ ও রজঃ হইতে তমোগুণের অপকর্ষের হেতু হইয়া থাকে। প্রকাশ-লক্ষণ সত্ত্বগুণ নির্গুণভাবের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়াই অপর গুণদ্বয় হইতে ইহার কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ ও আদর দেখা যায়; নচেৎ সত্ত্বাদি-গুণত্রয় সম্পূর্ণ প্রাকৃত বা জড়বস্তু; অতএব কেবল সত্ত্বাদিগুণের প্রকাশে জড়ত্বেরই প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভক্তিহীন 'কর্ম্মজড়' জীবের ক্রিয়াশীলতা, শবের ক্রিয়াশীলতা হইতে অভিন্ন।

জড়ত্বই মৃতত্ব বলিয়া, ভক্তিভাব-বর্জ্জিত কর্ম্মাদিরত জীবকে 'কর্ম্মজড়' আখ্যা প্রদান করা হয়। শবের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় মায়াহত জীবের যাহা কিছু কর্ম্ম-তৎপরতা,—সে-সকলই জড়ত্ব বা মৃতত্ব ভিন্ন যে লেশমাত্রও জীবত্বের পরিচায়ক নহে, উক্ত 'কর্ম্মজড়' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শবাসনের শবদেহ যেমন মৃত বা সম্পূর্ণ জড় হইয়াও কখন হস্তপদাদি সঞ্চালন করে, কখন হাস্য বা রোদন করে, কখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকে, কখন মুখ ব্যাদন করে, কখন সিক্ত চণকাদি ভক্ষণ করে, কখন বা উঠিয়া বসিতে চাহে,—তথাপি উহা যেমন মৃতদেহ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ অজ্ঞতা বশতঃ আমরা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসহীন জড়বৎ নীরব ও নিস্পন্দ দেহকেই 'শব' বলিয়া মনে করিলেও আমাদের জানা উচিত, যখন শবেও ক্রিয়াশীলতা ও কর্ম্ম-তৎপরতা দৃষ্ট হইতে পারে, তখন জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে নিরন্তর উত্থিত জড়ীয় বাসনা ও বিলাসাদি সগুণ-ধর্ম্ম মাত্র পরিলক্ষিত হইলেই, তদ্দ্বারা কখন তাহার জড়ত্ব বা মৃতত্বের অপনোদন হইতে পারে না। যে জীবে নির্গুণা ভক্তি-লক্ষণের লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই, তাহা প্রাকৃত বা ব্যবহার বিষয়ে যতই কেন সার্থকতা বরণ করুক, অথবা তাহা যতই কর্ম্মতৎপর হউক,—যতই কেন শ্রীমান্ বা কৃতিমান্ হউক,—যতই কেন উদ্যম ও উৎসাহশীল হউক,—যতই কেন জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যবান্ হউক অথবা যতই কেন সুশ্রী, সুবেশ ও সালঙ্কৃতই হউক,—তাহাকে

'ক্রিয়াশীল শব' বা 'কর্ম্মজড়' নামক মৃত-বিশেষ ভিন্ন, শাস্ত্র অপর কোনও লক্ষণে লক্ষিত করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবন্ শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণূন্
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্চবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥ (২।৩।২০-২৩)

অর্থাৎ, অহো! যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি শ্রবণ করে নাই, তাহার সেই কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র, এবং যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করে নাই, সেই জিহ্বা কেবল ভেক-জিহ্বার ন্যায় অসতী বা ভ্রষ্টা।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষাদি ও মণিময় মুকুটে ভূষিত হইয়াও যে মস্তক শ্রীভগবানের পাদপীঠে নমিত হয় নাই, তাহা কেবল ভার মাত্র, এবং

যে করদ্বয় কনক-কঙ্কণাদিযুক্ত হইয়াও শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয় নাই তাহা শবেরই কর তুল্য।

মনুষ্যগণের যে নেত্রদ্বয় শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সন্দর্শন করে নাই, সেই নেত্রদ্বয় কেবল ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত নয়ন সদৃশ; এবং যাহার পাদযুগল শ্রীহরিক্ষেত্রে বিচরণ করে নাই, সেই পাদদ্বয় বৃক্ষমূলের তুল্য; (অতএব তাহার দেহও বৃক্ষকাণ্ড-সদৃশ কাষ্ঠময়—জড়।)

যে মনুষ্যের অঙ্গ ভগবদ্ভক্তচরণ-রেণুর সংস্পর্শ লাভ করে নাই, সেই দেহ জীবিতাকারেও মৃত; এবং যে মানব শ্রীভগবৎপাদ-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস থাকিলেও তাহাকেও 'শব' বলিয়াই জানা আবশ্যক।

শিশিরের পত্র-পুষ্পহীন নীরস ও শুষ্কপ্রায় তরুলতার ধূসরিমা মুছিয়া গিয়া, বিকশিত নব-পল্লবের স্নিগ্ধ-শ্যামলীমা ধরিত্রীবক্ষে ছড়াইয়া পড়িলে, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবের কথা তখনই যেমন বুঝিতে পারা যায়, জড়জগতের জড়রাশির অন্তরালে—মর-জগতে মৃতস্তূপের অভ্যন্তরে চির-শায়িত জীবত্বহীন জীবের, জড়ীয় দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও সকল ইন্দ্রিয় হইতে সগুণা 'মায়িকী-বৃত্তি' বা জড়ত্বের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবদনুশীলন-রূপা নির্গুণা 'ভাগবতী-বৃত্তি' বা ভক্তত্বের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেবল তৎকাল হইতেই জীবের জীবত্ব বা অমৃতত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনাদি মায়াহত জীবের পুনর্জ্জীবন লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত প্রকারেই নির্ণীত হইয়াছে;—

ভক্তির বিকাশেই জীবের জীবত্ব বা অমৃতত্বের অভিব্যক্তি।

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥ (১০।৮০।৩-৪)

সে-ই বাক্য, যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি কীর্ত্তিত হয়, সে-ই হস্ত, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের কর্ম্ম কৃত হয়, সে-ই মন, যাহাদ্বারা স্থাবর-জঙ্গমে স্ফুরিত শ্রীভগবানকে স্মরণ করা যায়, সে-ই কর্ণ যাহাদ্বারা শ্রীভগবানের পুণ্য কথা শ্রুত হয়।

যে মস্তক, শ্রীভগবানের বিভূতি-বিশেষ জানিয়া স্থাবর ও জঙ্গমে প্রণত হয়—সেই মস্তকই মস্তক, যে চক্ষু বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবন্মহিমাকে অবলোকন করে—সেই চক্ষুই চক্ষু, এবং যে অঙ্গ নিত্য শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্ত-জনের পাদোদকে সংলিপ্ত হয়—সেই অঙ্গই অঙ্গ।

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ও তদনুকূলতাময়ী জীবের যে, কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা—তাহাই প্রকৃষ্ট জীবন-লক্ষণ। পূর্ণ ভক্তত্বই পূর্ণ-জীবত্ব; সুতরাং ভক্তশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ মহারাজের আচরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতে জীবের পরিপূর্ণ জীবন-লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে;—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ (৯।৪।১৮-২০)

অর্থাৎ সেই মহামনা শ্রীমদম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তায় মনকে, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনাদিতে বাক্যকে, শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে করযুগলকে, ভগবৎকথাদি শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিয়োগ করিলেন।

তিনি দৃষ্টিকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি ও মন্দিরাদিতে, অঙ্গকে ভক্তজনস্পর্শে; ঘ্রাণকে শ্রীভগবচ্চরণার্পিত তুলসীর গন্ধ গ্রহণে নিয়োগ করিলেন।

তিনি রসনাকে ভগবন্নিবেদিতান্ন-আস্বাদনে, চরণযুগলকে শ্রীহরি ক্ষেত্র গমনে, মস্তক শ্রীভগবচ্চরণ-বন্দনে, কামনাকে বিষয়ভোগের পরিবর্ত্তে কেবল ভগবদ্দাস্যে, এবং সকল কর্ম্মকে ভক্তজনের প্রীতি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন।

উক্ত শাস্ত্রনির্দ্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব—অমৃতত্ব ও মৃতত্ব কেবল ভক্তি ও ভগবৎ সম্বন্ধের উদয় ও অনুদয় অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। জীবনের অন্য কোন লক্ষণ না দেখিয়া, কেবল নাসারন্ধ্রে তূলা ধারণ পূর্ব্বক সামান্যাকারে তাহা স্পন্দিত হইতে দেখিলেও যেমন ব্যবহার-বুদ্ধিতে আমরা তাহাকে আর মৃত জ্ঞান করি না, কিন্তু সঞ্জীবিত বলিয়াই মনে করি, সেইরূপ নিত্য সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেই মায়াকর্ত্তৃক নিহত বা মৃত হইলেও যদি তাহাতে লেশমাত্র ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর মৃতজ্ঞান না করিয়া যথার্থ জীবনপ্রাপ্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। হতজীবে পুনরায় জীবন লক্ষণ—নির্গুণা-ভক্তি-লক্ষণের সংযোগেই সম্ভব হয়—কিন্তু নাসাগ্রধৃত তূলার কম্পনে নহে। আবার ভক্তি উদয়ের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুসারে জীবত্বের প্রকাশ-তারতম্য হইলেও যেখানেই ভক্তির লেশাভাস মাত্রেরও

সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট করিবার পক্ষে কোনই বাধা নাই।

মৃতের উপরই যমরাজের অধিকার—কিন্তু জীবিতের উপর নহে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। ভক্তির সংযোগ বা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় ও তদনুকূলতাময়ী কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টার লেশমাত্রও স্ফুরণ হইলে, সেই জীবের জীবন-লক্ষণ তৎকালে যতই কেন অত্যল্প হউক,—তাহাকে তখন হইতে জীবিত, সুতরাং যমরাজের অধিকার বহির্ভূতই জানা আবশ্যক।

ভক্তি-সংস্পৃষ্ট বা জীবিত জীব, যমরাজের অধিকার বহির্ভূত।

জীব যে পর্য্যন্ত ভক্তি-সম্বন্ধহীন, সেই পর্য্যন্তই মৃত। জীবত্বশূন্য জীবেরই নাম 'মৃতাত্মা'। মৃতাত্মা ভিন্ন সঞ্জীবিত বা স্বধর্ম্ম-প্রাপ্ত আত্মার উপর যমের কর্ত্তৃত্ব থাকিতেই পারে না; তাই শ্রীভাগবতে অজামিল-উদ্ধার প্রসঙ্গে দেখা যায়, স্বীয় দূতগণের প্রতি যমরাজের সুস্পষ্ট আদেশ এই,—যে জীবে একটিবার মাত্রও ভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ বা ভক্তির অত্যল্প সম্বন্ধও দেখা যাইবে না, কেবল সেই অসৎ বা জড়ত্ব-প্রাপ্ত জীব সকলকেই আমার ভয়াবহ ভবনে আনয়ন করিও;—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ॥
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ (৬।৩।২৯)

অর্থাৎ হে দূতগণ! যাহাদের জিহ্বা একবারও শ্রীভগবদ্-গুণ-নামাদি কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত একবারও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ করে নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাহাদের মস্তক একবারও প্রণত হয় নাই, সেই ভগবদ্ভক্তিহীন অসৎ লোকদিগকেই দণ্ডের নিমিত্ত আমার ভবনে আনয়ন কর।

[উক্ত শ্লোকে 'একদাপি' অর্থাৎ একবারও এই পদটি সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য। জিহ্বা, চিত্ত ও মস্তক দ্বারা একবারও কীর্ত্তন, স্মরণ ও প্রণামের উল্লেখ থাকায়, শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় অনুকূলতাময়ী বাচিক, মানসিক অথবা শারীর-চেষ্টারূপা ভক্তির স্বল্পমাত্র উদয়কেও বুঝিতে হইবে।]

পরিশেষে জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব বিষয়ক সারমর্ম্ম, যাহা পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত,—সেই চিরস্মরণীয় পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।

তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক্ সে ছার খার
সেই বপু লৌহসম জানি ॥ (মধ্য, ২।২৬-৩১)

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, ভক্তির সংযোগেই জীবের যথার্থ জীবত্বের প্রকাশ হয়, এবং তৎসম্বন্ধেই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণ সার্থকতাকে বরণ করে—নচেৎ যেমন সমস্তই ব্যর্থ, সেইরূপ ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত হইলেই সকল কর্ম্ম শুদ্ধ হয়, এবং জ্ঞান, যোগ, তপাদি সকল সাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে—নচেৎ সমস্তই মৃত ও জড়তুল্য অসার ও অশ্রদ্ধেয়। মৃতের পক্ষে যেমন কোনও পথ্যাদি সেবনের প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ মায়াহত বা চিরমৃত জীবের পক্ষে, যাহার সংযোগ ব্যতীত সঞ্জীবিত হইবার উপায়ান্তর নাই,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধন-ভক্তি-রূপ সুপথ্য বা অমৃত সেবনের প্রথম প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে,—অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মায়াহত জীবের পক্ষে ভক্তি সেবনের প্রথম উন্মুখতার উপায় অনুসন্ধান।

অভিধেয় প্রকরণ

—:(০):—

নিরতিশয় দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন বাক্‌শক্তিহীন আহত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছুই চাহিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, উপযুক্ত পথ্যাদি-প্রয়োগে তাহাকে সবল ও সুস্থ করিয়া তুলিবার আশায় তৎসমীপে অপেক্ষা করিয়া থাকার সেই পর্য্যন্তই সার্থকতা আছে,—যে পর্য্যন্ত তাহাতে জীবনী-শক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ—পথ্যাদি সেবনের কিঞ্চিৎ উন্মুখতা পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু মৃতের পক্ষে পথ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে কোনও উন্মুখতা বা চেষ্টাশীল হইবার আর কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অতিশয় স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-বন্ধুগণও তদবস্থায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন,—ইহাই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়।

'আহত' ও 'হত' উভয়ের পার্থক্য।

জীবের জীবত্ব অনাদিকাল হইতে মায়া কর্ত্তৃক হৃত হওয়ায়, জীবত্বহীন জীবমাত্রেই বাস্তবিকপক্ষে মৃত ; সুতরাং মৃতের পক্ষে স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা —সাধনভক্তিরূপ নির্গুণ পথ্যাদি সেবনের জন্য স্বাভাবিক উন্মুখতা সম্ভবপর নহে ; অতএব কিঞ্চিন্মাত্রও সেবোন্মুখ হইলে, স্বপ্রকাশ 'সাধন-ভক্তি' কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে স্বয়ং আবির্ভূতা হইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্পা হইলেও, 'মায়াহত' জীবের পক্ষে ভক্তিদেবীর এতাদৃশী মহতী কৃপাকে বরণ করিয়া লইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ; যে-হেতু মায়ামৃত জীবের পক্ষে শবাসনের শবের ন্যায় অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার প্রকাশ সম্ভবপর হইলেও, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাধন-ভক্তি সেবনে উন্মুখতারূপ স্বাভাবিক জীবন-লক্ষণের স্বতঃ প্রবৃত্তি অসম্ভব। এইরূপে

ভক্তি-সেবোন্মুখতা শূন্য মায়ামৃত জীব সম্পূর্ণ পরিহার যোগ্য হইলেও, ভগবৎ কৃপা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই।

মায়াহত জীবের দুর্দ্দৈবসীমা এ-স্থলে শ্রীভগবানের কৃপার সীমাকে অতিক্রম করিলেও, সেই দয়াময়ের দয়ার সীমাও অনন্ত! তাই যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশার অপেক্ষা না করিয়া, স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-পরিজনও তাহাকে সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকে,—মায়াহত জীবমাত্রেই যথার্থরূপে তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, জীবের প্রতি ভগবৎকরুণা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ ও কৃপার ন্যায় এখানেই অবসান প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি মায়ামৃত জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মৃতের প্রতি তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণের ব্যবহারের মতই জীবকে চির-পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু স্বপদভ্রষ্ট জীবের এই শোচনীয় দুর্গতির সীমা অপরিসীম হইলেও, তদীয় অনন্ত করুণার কিরণ জালে, জীবের সেই দুর্দ্দৈবের অপার অন্ধকার রাশিকেও অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় কৃপা-বেষ্টনী দ্বারা পুনরায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। মায়াকর্ত্তৃক জীবকে নিহত দেখিয়াও শ্রীভগবান্ নিরস্ত হয়েন নাই; তিনি 'মৃতসঞ্জীবনী' প্রয়োগে মায়ামৃত জীবকে সঞ্জীবিত করিয়া, 'সাধন-ভক্তি' সেবনে তাহার উন্মুখতা আনয়ন পূর্ব্বক, নির্গুণা সাধন-ভক্তি-পথ্যের পরিণতাবস্থা যাহা,—যথাক্রমে সেই 'প্রেম-ভক্তি' বা ভগবৎ-সেবা, প্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসার উদয় করাইয়া, মৃত-জীবকে এইরূপে অমৃতত্ব প্রদানের সহিত আত্মবরণ করিতেছেন।

মহৎ-কৃপারূপ মৃত-সঞ্জীবনী প্রয়োগে মায়াহত জীবে প্রথম জীবত্বের প্রকাশ।

মৃতকে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে 'মৃতসঞ্জীবনী' প্রয়োগের কথা লৌকিক-জগতে শ্রুতিগোচর হইলেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; এবং কদাচিৎ বা পরিদৃষ্ট হইলেও সে জীবন-লক্ষণ স্বাভাবিক জীবন না হওয়ায়, সেই মৃতসঞ্জীবনীও যথার্থ নহে। উহাতে মৃতেরই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার সাময়িক পুনরাবির্ভাব হয় মাত্র; কিন্তু যাহার প্রয়োগে

জীবের স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ হয়, যাহার সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব অফুরন্ত—অনন্ত মধুময় জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই যথার্থ ও অব্যর্থ মৃতসঞ্জীবনীর অপর নাম 'মহৎ-কৃপা'।

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে মহৎ কৃপার লেশমাত্রও সংযোগ ঘটিলে তাহার পর হইতে সেই জীবের স্বাভাবিক জীবনধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। জীবত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 'সাধন-ভক্তি' সেবনের জন্য জীব-হৃদয়ে যে উন্মুখতা—যে চেষ্টাশীলতার বিকাশ হয়, জীবাত্মার সেই স্বাভাবিক সঞ্জীবতার অপর নাম 'পুরুষকার'। ধন, ধান্য, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাদিরূপ সগুণ বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবগণের যে উৎসাহ—যে কর্ম্মতৎপরতা, তাহা নির্গুণ জৈবধর্ম্মের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া, সেই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতাই ব্যবহার জগতে 'পুরুষকার' নামে কথিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহা কখনই 'পুরুষকার' পদবাচ্য হইতে পারে না; যে-হেতু 'পুর্ষু শেতে য ইতি পুরুষঃ'—অর্থাৎ যিনি স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহরূপ পুরসকল-মধ্যে শায়িত থাকেন—অবস্থান করেন, তাঁহার নাম 'পুরুষঃ'; সুতরাং দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মাই পুরুষ-পদবাচ্য। আবার সেই 'পুরুষস্য কৃতিঃ' অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়া বা চেষ্টা যাহা, তাহারই নাম 'পুরুষকার'। আত্মাই পুরুষ; অতএব নির্গুণ আত্মার নির্গুণ বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা,—উহাও নির্গুণ বলিয়া, আত্মার সেই স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতাই যথার্থ 'পুরুষকার'। সগুণ বা জড়ীয় বিষয়ের নিমিত্ত অবিদ্যা বা জড়তায় অভিভূত আত্মার যে অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা, তাহা সগুণ বা জড় বলিয়া, ভগবৎসম্বন্ধ বর্জ্জিত সেই সকল চেষ্টাশীলতাকে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির আস্ফালন বা জড়ত্ব ভিন্ন 'পুরুকার' নামে অভিহিত করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অবিদ্যা কর্ত্তৃক দেহাত্মবোধরূপ 'মূলে

'সাধন-ভক্তি' সেবন-সামর্থ্যই জীবের প্রকৃষ্ট 'পুরুষকার'।

ভুল' উপস্থিত হওয়ায় আমাদের অস্বাভাবিক জীবন-প্রবাহের আগা গোড়া সমস্তই ভ্রমময় করিয়া তুলিয়াছে।

'মহৎ-কৃপা' রূপ মৃতসঞ্জীবনীর অমোঘ স্পর্শলাভের পর হইতে জীবের যথার্থ জীবন-স্পন্দনের আরম্ভ হয়, এবং তাহারই ফলে মায়ামৃত—হতবল জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতা সম্ভব হয়। ভক্তি-সেবোন্মুখতারূপ জীবের যথার্থ পুরুষকার জাগ্রত হইলেই, তখন কৃত-সঙ্কল্পা ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় স্বয়ংই জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-সাধনরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই প্রকারে নির্গুণ ভক্তি-সুধা অনুসেবন দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীভগবৎসেবা প্রাপ্তির পূর্ণ লালসা বা প্রেমোদয়ে, জীবের পক্ষে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা 'মহামিলন' সংঘটিত হইয়া থাকে। একমাত্র মহৎকৃপাকেই ভক্তি-সেবোন্মুখতার বা ভগবদনুশীলনের মূল কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। 'মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।'—(শ্রীচরিতামৃতে, মধ্য ২২প°)।

'মহৎ-কৃপা' ভক্তি-সেবোন্মুখতার মূল কারণ।

ভগবৎ সংজ্ঞক তত্ত্ব লাভ যে, কেবল মহৎকৃপা হইতে আবির্ভূতা ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না, রাজা রহূগণের প্রতি মহানুভব ভরত কর্ত্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে ;—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

(শ্রীভাগবতে, ৫।১২।১২)

অর্থাৎ অহে রহূগণ! সেই ভগবৎ সংজ্ঞক তত্ত্ব, মহৎগণের চরণরজা-ভিষেক অর্থাৎ মহৎ-কৃপা ব্যতীত অপর তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি সংবিভাগ, গৃহস্থধর্ম্ম, পরোপকার কিম্বা বেদাভ্যাস অথবা জল, অগ্নি, ও সূর্য্যের উপাসনা—কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর সংযোগ ব্যতীত মায়ামৃত জীবের পক্ষে অপর

কোন প্রকারে স্ব-প্রকাশ ও সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীর পদরজও স্পর্শ করিবার পক্ষে কোনও চেষ্টাশক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। যেখানেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নির্গুণ ভক্ত্যঙ্গের কোনও সংযোগ পরিদৃষ্ট হইবে, তাহার মূলে বর্ত্তমান বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে কোন ভাবে হউক, মহৎকৃপা—ভক্তকৃপা সঞ্চারের সুসংবাদ অবশ্যই নিহিত আছে জানিতে হইবে।

যে জীবের ভাগ্যে কণমাত্রও মহৎ-কৃপামৃতের সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছে, তৎকালে মর্ত্ত্য বা মরলোকের মৃতস্তূপের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলেও সেই জীব, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আর মৃতের মধ্যে গণ্য নহে; তাহার যথার্থ জীবন-নিঃশ্বাস তৎকালে যতই অল্পাকারে প্রবাহিত হউক,—সেই জীবকে সঞ্জীবিত বলিয়াই জানিতে হইবে। বড়শী-বিদ্ধ ও মুক্ত মীন, একই জলাশয়ে—একই প্রকারে অবস্থান করিলেও বড়শীবিদ্ধ মৎস্যকে যেমন শীঘ্র বা বিলম্বে হউক জলাশয় হইতে উঠিতেই হইবে; পরিজন দ্বারা সংবৃত্ত হইয়া অপরাপর মুক্তমীনের মত তৎকালে জল মধ্যে বিচরণশীল হইলেও তাহাকে যেমন ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ যে জীব মহৎকৃপারূপ বড়শী দ্বারা একবার সংবিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে তাহাকে ভব-জলাশয়ে অপর সাধারণ জীবের মত একই প্রকারে অবস্থিত দেখা যাইলেও, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, সংসার পাথার হইতে তাহার উদ্ধার লাভ অনিবার্য্য। মহৎ-কৃপা-বিমুক্ত জীবের সহিত আপাততঃ তাহার আচরণ ও বিচরণ প্রায় একই প্রকারের লক্ষিত হইলেও, মহৎ-কৃপাবিদ্ধ সেই জীবকে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে। তাই মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শলাভ ব্যতীত যাহা অন্য কোনও কারণ হইতে সঞ্জাত হয় না,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা সাধন-ভক্তি সেবনের সামর্থ্য যেখানে যে কোন ভাবে পরিলক্ষিত হইবে, তৎকালে তাহার সংসারপাশ

'মহৎকৃপা' সংযোগের অব্যর্থতা।

বিমুক্তির কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও, যথাকালে ও যথাক্রমে সেই জীবের ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য জানিয়া ও তাহার সেই অনাগত সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া শাস্ত্র, সেরূপ জীবকেও বার বার সম্মান প্রদান করিতে বিরত হয়েন নাই ;—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত ১১—শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে)

অর্থাৎ পরিহাস ও উপহাসাদিতেও যাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীভগবন্নাম স্ফুরিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার।

মহৎকৃপা-স্নাত জীবের, জড়স্তূপের অভ্যন্তর হইতে বিমুক্ত হইয়া চিদানন্দের চির-জ্যোৎস্না-শীতল স্বদেশের দিকে অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য যে ক্রমিক অভিযান,—তাহার গতি কেবল 'অপরাধ' ভিন্ন অপর কোনও বিরুদ্ধ শক্তি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইতে পারে না।

ভক্তিপথে 'অপরাধের' শ্রেষ্ঠতম অপকারিতা।

'আরাধনা' যাহা হইতে 'অপগত' হয়—শিথিল হয়, তাহাই 'অপরাধ'। ভজন বিষয়ে শিথিলতা বা এক কথায় ভজন-শৈথিল্যই অপরাধের বিষময় ফল। 'সেবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ' ভেদে উক্ত অপরাধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ হইলেও তন্মধ্যে নামাপরাধই সাধনভক্তি সেবনে উন্মুখতার পক্ষে—প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের পক্ষে সর্ব্বাধিক অনর্থকর। নামাপরাধ সকলের মধ্যে আবার মহতের নিকট—বৈষ্ণবের নিকট—ভক্তের নিকট অপরাধই ভজনপথের প্রধানতম অনর্থ বলিয়া, উহার অপর নাম 'মহদপরাধ'। অপরাধের সারমর্ম্ম এই যে, ভক্তি ও ভক্তজনের সম্বন্ধে নিন্দা, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাদি হইতে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাদের গৌরব ও সম্মান সর্ব্ববিষয়ে যথাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভজনের যে প্রবৃত্তি,—তদ্বিষয়ে পুরুষকারের শৈথিল্য জনিত অক্ষমতাই অপরাধ লক্ষণ।

সংসার-সর্পাক্রান্ত জীব, যে ভক্তি-কল্পলতামূল অবলম্বনে তাহার ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়া সম্পূর্ণ ভয়রহিত ও পরমানন্দিত হইবে, অসতর্কতা নিবন্ধন সেই আশ্রয়লতা মূলে নিজে 'অপরাধ' রূপ কুঠারাঘাত করিলে তাহাতে যে কি পরিমাণ অনর্থপাতের সম্ভাবনা, স্থিরভাবে চিন্তা দ্বারাই তাহা অনুভব করিবার বিষয়। জীবের সহিত কোনও প্রকার শুদ্ধা-ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগ দেখা যাইলে, তাহারই মূলে মহৎকৃপার বিদ্যমানতা যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি মহৎকৃপা সংযোগের পরক্ষণ হইতে প্রেমোদয়ের দিকে ক্রমিক অগ্রগতির পক্ষে যদি কোনও প্রবল প্রতিরোধ অনুভূত হয়, তাহা হইলেও সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে, ভক্তিলতিকা কুঞ্জে 'মহদপরাধ' রূপ মত্ত কুঞ্জরের অবশ্যই প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে। ভক্তি-লতাকুঞ্জের পক্ষে অপরাধ মাত্রেই কুঞ্জর সদৃশ অনর্থকর; তন্মধ্যে মহদপরাধ আবার মত্ত-কুঞ্জর সদৃশ ভয়াবহ।

মায়াবিনীর রূপার কাঠির স্পর্শে, পাতালপুরীর নিদ্রিতা কুমারী যেমন তদন্বেষণপর রাজকুমার কর্ত্তৃক সোনার কাঠির স্পর্শে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসে;—পরে কর-পল্লবে নয়ন মার্জ্জন পূর্ব্বক, ঘুমঘোর কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে, রাজকুমারের অনুপম মাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা কুমারী যেমন তদীয় রাতুলচরণে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ মহা-'মায়া'-বিনীর 'অবিদ্যা' নামক রূপার কাঠির স্পর্শে 'সংসার' মায়াপুরে চেতনাহত জীব, তদন্বেষণপর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক 'মহৎ-কৃপা'রূপ সোনার কাঠির সংস্পর্শে সচেতন হইয়া, 'পুরুষকার' বা আত্ম-শক্তিরূপ উত্থান লাভ করে; অতঃপর 'সাধন-ভক্তি' পাণিতলে চিত্তরূপ নয়ন-মার্জ্জন পূর্ব্বক, 'অনর্থ-ঘোর' কাটিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীব্রজরাজ-কুমারের অনুপম মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তদীয় চিরশান্তি-শীতল চরণকমলে আত্মবরণ পূর্ব্বক জীবত্বের পূর্ণ-সার্থকতা

পাতালপুরীর নিদ্রিতা কুমারীর জাগরণের ন্যায় মায়া-নিদ্রাচ্ছন্ন জীবাত্মার জাগরণ-ক্রম।

লাভে সমর্থ হয়। ভক্তত্বই জীবের জীবন-যজ্ঞের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ বলিয়া, ভগবৎকৃপা হইতেই জগতে মহৎ-কৃপামৃতের সমুদ্ভব হইলেও, ভগবান, ভক্তি ও ভক্তজনের একান্তরতা বশতঃ ('তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ' না° ভ° সূ° ৫।৪১) এবং স্বতন্ত্র ভগবানেরও ভক্তি ও ভক্তপরতন্ত্রতা নিবন্ধন ('ভক্তিবশঃ পুরুষো' শ্রুতিঃ) ('অহং ভক্তপরাধীনো' ভা°। ৯।৪।৬৩) ভক্তিকৃপা ও ভক্তকৃপাকেও স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তিদেবী স্বতন্ত্রভাবে জীবকে কৃপা করিতে উদ্যত হইলেও, তৎকালে মায়াহত জীবের তৎসেবনে উন্মুখতার অভাব বশতঃ, ভক্তকৃপা বা মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব সঞ্জীবিত হইলে, তদনন্তর ভক্তি-পথ্য সেবনে সমর্থ হয়; অতএব ভগবৎকৃপা-বাহনরূপ ও স্বতন্ত্র সাধুগণের কৃপাকেই ভগবদ্ভক্তির 'জন্মমূল' বলিয়া জানিতে হইবে।

মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে মায়াহত জীবের জীবত্ব ও তৎসহ প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে, কেবল সেই জীবের পক্ষেই নির্গুণা সাধন-ভক্তি সেবনের উন্মুখতা বা চেষ্টাশীলতা সম্ভব হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে উহা সম্ভব হয় না। সাধন-ভক্তির অনুসেবন দ্বারা জীবের অন্তরে 'সাধ্যভক্তি' বা প্রেমের উদয় হইলে তখনই শ্রীভগবৎসেবা প্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসা জাগ্রত হয়, এবং সেই প্রেমের আলোকেই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার সংসিদ্ধ হইয়া, জীবের জীবত্ব পূর্ণ সার্থকতাকে বরণপূর্ব্বক চিরকৃতার্থ হইয়া যায়। একই পূর্ণেন্দু যেমন মেঘজালে আবৃত, কিয়দাবৃত ও অনাবৃত অবস্থাভেদে ত্রিবিধ প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই নির্গুণা ভক্তি, জীবহৃদয়ে স্ফুরিত হইবার পর, চিত্তের অমার্জ্জিত, মার্জ্জিত

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে একই নির্গুণা ভক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ।

ও পরিমার্জ্জিত অবস্থাত্রয় ভেদে 'সাধনভক্তি', 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ;—

'সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।'

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।১)

একই চিদানন্দিনী শক্তির পরমসাররূপা ও নিত্যসিদ্ধা ভক্তি প্রধানতঃ উক্ত ত্রিবিধাকারে প্রকাশিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহা ভক্তির বিকার বা পরিবর্ত্তন নহে ; পৃথিবীর গতির পরিবর্ত্তনে যেমন সূর্য্যেরই পরিবর্ত্তন এবং উহা যথাক্রমে বালারুণ, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ও সন্ধ্যার রক্তরবির রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের জড়ত্ব হইতে ভক্তত্বের ক্রমবিকাশ অনুসারেই ভক্তির বিকাশভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র ; অতএব ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বের হানি হয় না। ('ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা—'। ভা° ।১১।৩।৩২)

জীবের জড়ত্ব হইতে ভক্তত্বের ক্রমবিকাশ ভেদে ভক্তির বিকাশভেদ লক্ষিত হইবার কারণ।

একই নির্গুণা ভক্তি, প্রথমে 'সাধন'রূপে জীবের সেবনীয়া হইবার জন্য প্রধানতঃ নববিধ লক্ষণে প্রকাশিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কর্ত্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রতি, এই নব-লক্ষণা সাধন-ভক্তির কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—

নব-লক্ষণা সাধন ভক্তি

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥ (৭।৫।২৩)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, পুরুষ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানে সমর্পিত হইয়া গৃহীত হইলে তাহাকে 'নব-লক্ষণা ভক্তি' কহে।

সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধনভক্তি-সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম একত্র চয়ন করিয়া, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুসারে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপে চারি ছত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অপর ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে প্রথমে সহজ-গ্রাহ্য হইয়া, সত্বর চিত্তমার্জ্জন পূর্ব্বক নববিধ ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ করেন বলিয়া, তাহার মধ্যে নামাশ্রয়—নামকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে ;—

নববিধা সাধন ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥' (অন্ত্য, ৪.৬৫-৬)

তাৎপর্য্য,—ভজনের মধ্যে নববিধ সাধনভক্তিই শ্রেষ্ঠ ; কৃষ্ণ-প্রেমোদয় করাইয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে এই সাধনভক্তি মহাশক্তি ধারণ করেন। এতাদৃশী সাধন-ভক্তি সকলের মধ্যে শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরূপ মহা-সম্পদের অধিকার সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নব-লক্ষণা ভক্তির অন্তর্গত 'শ্রবণ', 'কীর্ত্তন' ও 'স্মরণ' এই ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণাদির ন্যায়, তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনামেরও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ অনুশীলন, উক্ত সাধন-ভক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পরিগণিত হইয়া, নববিধা সাধন-ভক্তির সহিত একই উচ্চ আসনে—একই সম্মানে সাধন-জগতে সম্পূজিত হইতেছিলেন ; কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতম প্রচারক, প্রবর্ত্তক ও জনক—কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সেই নামকীর্ত্তন—নামাশ্রয়কে নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার বিশেষত্ব প্রদানপূর্ব্বক, তাহা সর্ব্বোচ্চ আসনোপরি সংস্থাপিত করিয়া, অতি সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রচার করিলেন,—

'তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।'

নিখিল সাধনভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ই যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তিনি শুধু এই কথাই প্রচার করিলেন তাহা নহে,—কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি কলি-কবলিত জগৎকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন যে,—

'নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥' (মধ্য, ১৫।১০৮)

অর্থাৎ কেবল নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতেই যথাক্রমে ও যথাকালে পূর্ণরূপে নববিধ 'ভক্ত্যঙ্গ' ও 'সাধনাঙ্গ' সকল সমুদিত হইয়া থাকেন। রাজা গমন করিলে যেমন রাজ অমাত্যগণও আপনিই তাঁহার অনুগমন করেন, তেমনি নামাশ্রয়রূপ সাধন-ভক্তির আবির্ভাবে অপর ভজনাঙ্গ সকল যথাক্রমে ও যথাকালে সাধকের ইন্দ্রিয় দ্বারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব নিখিল ভজনাঙ্গের, শ্রীনামাশ্রয়ই হইতেছেন 'অঙ্গী' অর্থাৎ কারণ বা বীজ স্বরূপ। সেই বৈশিষ্ট্যের কথা পরে বলা হইবে।

প্রেমোদয়ের পক্ষে নববিধ ভক্ত্যঙ্গই মহাশক্তিশালী।

উক্ত নবলক্ষণা ভক্তির যে কোনও একটি অথবা একাধিক অঙ্গ মহৎকৃপা-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে প্রথমে সামান্যাকারে গৃহীত হইয়া, উহাই যথাকালে ও যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমাবস্থার উদয় করাইয়া থাকেন;—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ।
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥ (শ্রীচৈ°, মধ্য ২২।৭৬-৭)

নবলক্ষণা ভক্তির সকল অঙ্গই যে যথাক্রমে প্রেমোদয়ের পক্ষে সমান শক্তিসম্পন্ন, শ্রীচরিতামৃতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত ভক্তবাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে;—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥ (পদ্যাবলী, ৫৩)

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণ করিয়া, শুকদেব কীর্ত্তন করিয়া, প্রহ্লাদ স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবী তদীয় চরণ-কমলের সেবা করিয়া, পৃথু তাঁহার অর্চ্চন করিয়া, অক্রূর তাঁহার বন্দনা করিয়া, কপিপতি তাঁহার দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, এবং সর্ব্বস্বের সহিত আত্মাকে নিবেদন করিয়া বলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেমন মূল হইতে কাণ্ড ও কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখাদির উদ্গম হইয়া পরিশেষে পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয়, তেমনি মহৎকৃপা ও সঙ্গাদির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপ ভক্তিমূল হইতে ভক্তিলতার উদয় হইয়া, তাহা ক্রমশঃ 'শ্রদ্ধা' ও 'সাধুসঙ্গ' নামক সোপানদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক 'ভজনক্রিয়া' রূপ তৃতীয় স্তরে সমারূঢ় হইলে, ঠিক তৎ-প্রারম্ভ হইতেই 'সাধনাঙ্গ' রূপ বহু শাখা প্রশাখাদি দ্বারা উহা ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া, যথাকালে অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত 'নিষ্ঠা', 'রুচি' ও 'আসক্তি' স্তর অতিক্রম পূর্ব্বক, 'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি' রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নবধা 'ভক্ত্যঙ্গ' হইতে তৃতীয় স্তরে তৎশাখাদিস্বরূপ যে 'সাধনাঙ্গের' উদ্গম হয়, তাহা বহুবিধ হইলেও, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে উহা 'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' আদি করিয়া প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে *।

'ভক্ত্যঙ্গ' হইতে 'ভজন-ক্রিয়া' নামক সাধনার তৃতীয় স্তরে 'সাধনাঙ্গ' সকলের প্রকাশ।

* চতুঃষষ্টি 'সাধনাঙ্গ' বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ২য় লহরী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংখ্যা রহিত সাধনাঙ্গকে চতুঃষষ্টি সংখ্যায় সংখ্যাত করিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ;—

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহু ত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু 'সাধনাঙ্গ' সার ॥ (মধ্য, ২২।৬০)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধনভক্তির নববিধ 'ভক্ত্যঙ্গ' হইতে কালে যে 'সাধনাঙ্গ' সকলের উদ্গম হয়, তাহা বিবিধাঙ্গে বহু বিস্তার লাভ করিলেও সেই 'সাধনাঙ্গ' সকলের মধ্যে সার বা প্রধান অঙ্গ সকল যাহা, তাহারই কিছু (৬৪ প্রকার অঙ্গ) সংক্ষেপে কহিতেছি।

মহৎকৃপা ও সঙ্গাদির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিমূল হইতে প্রেম-রূপ ফলের ক্রমিক অভ্যুদয় প্রণালী নিম্নোক্ত প্রকার হইয়া থাকে ;—

একই অখণ্ডিতা ও চিদানন্দময়ী ভক্তি, 'সাধন-ভক্তি' 'ভাব-ভক্তি' ও 'প্রেম-ভক্তি' ভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধা। সাধন-ভক্তির পর ভাব-ভক্তি হইতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। অহৈতুকী মহৎ-কৃপাপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে, প্রথমে সাধনভক্তি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি আবার 'ভক্ত্যঙ্গ' ও 'সাধনাঙ্গ' ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপে ভক্ত্যঙ্গও আবার নববিধ। মহৎকৃপা-সঞ্চারিত জীবের পক্ষে প্রথমে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একাধিক অঙ্গের গ্রহণে উন্মুখতা লাভ হইলে, তৎসেবন-কালে জীবের নিকট উহা প্রথমে সামান্যাকারে—অনিষ্ঠিতভাবে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। [যাহা বিশেষ নিয়মাদি বা সঙ্কল্পাদি দ্বারা প্রকৃষ্ট-ভজনরূপে অনুষ্ঠিত নহে, এবং যাহা যদৃচ্ছাক্রমে আচরিত, তাহাকেই 'সামান্যাকার' ও তদ্বিপরীত যাহা, তাহাকেই 'বিশেষাকার' নামে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।]

'মহৎ-কৃপাদি' রূপ মূল হইতে 'প্রেম' রূপ ফলোদয়ে ভক্তি-লতার ক্রমিক অভিব্যক্তি-প্রণালী।

সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ 'ভক্ত্যঙ্গের' এক বা একাধিক অঙ্গের সেবন করিতে করিতে, উহা সাধন-স্তরে 'শ্রদ্ধা' নামক প্রথম

সোপানারূঢ় হইলে, তদবস্থায় সেই জীবের পক্ষে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভজনাদি নিখিল পরমার্থ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে থাকে। তদনন্তর 'সাধুসঙ্গ' নামক দ্বিতীয় ভূমিকায় সমাগত জীব, সাধু-ভক্তগণের অনুসন্ধান পূর্ব্বক, তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিয়া ও তাঁহাদিগের সঙ্গ, সেবা ও সদুপদেশাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় প্রকৃষ্ট ভজনে অভিলাষযুক্ত হয়েন। মহৎ-কৃপা লাভের পর হইতে 'সাধুসঙ্গ' নামক সাধনার দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত এই সীমায় অবস্থিত জীবকে 'প্রবৃত্ত-ভক্ত' নামে নির্দ্দেশ করা যায়। অতঃপর 'ভজনক্রিয়া' নামক সাধনার তৃতীয় সোপান। এই স্তর প্রাপ্ত হইলে ভক্তিদেবী কৃপা পূর্ব্বক সেই জীবের নিকট 'সাধনাঙ্গ' রূপে নিজেকে বিস্তারিত করেন। এই স্তরে সমাগত হইবার পর হইতে প্রকৃষ্ট ভজন সাধনের আরম্ভ হয় বলিয়াই ইহাকে 'ভজনক্রিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' হইতে চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের প্রথম দশটি অঙ্গ, তৃতীয় স্তরে সমারূঢ় জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভজনের প্রারম্ভ-স্বরূপ উদিত হয়েন। অতঃপর সমষ্টিরূপে অবিশিষ্ট সাধনাঙ্গ বা তাহার প্রধান প্রধান অঙ্গ সকলের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নবাঙ্গ, তখন 'সামান্যাকার' হইতে 'বিশেষাকার' প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাও তৎকালে সাধনাঙ্গের অন্তর্ভূত হইয়া যায়; সুতরাং তদবস্থায় এই নববিধ ভক্তি আর সামান্যাকারে থাকেন না; এই অবস্থায় কেবল 'সাধনাঙ্গের' প্রকাশ হওয়ায়, সমুদয় সাধনাঙ্গই বিশেষাকারে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, এবং সেই প্রকৃষ্ট ভজন হইতেই 'অনর্থ-নিবৃত্তির' সহিত ক্রমে 'নিষ্ঠা' 'রুচি' 'আসক্তি' ও 'ভাব' নামক স্তর-চতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 'ভজনক্রিয়া' নামক তৃতীয় স্তর হইতে 'ভাব' নামক ষষ্ঠ স্তরের অন্তর্গত জীবকে 'সাধক-ভক্ত' নামে নির্দ্দেশ করা হয়। 'ভাব'-স্তরারূঢ় ভক্তির নামই 'ভাব-ভক্তি'; ইহা সাধন-ভক্তির পরিণতাবস্থা। এই স্তরে সমারূঢ়

সাধক-ভক্তের পক্ষে ভক্তিদেবী ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি,—এই অনুভাব-সকল উদয় করাইয়া তদনন্তর 'প্রেম'নামক পঞ্চম-পুরুষার্থরূপে সেই জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। প্রেমভক্তি-সংপ্রাপ্ত জীবকেই 'সিদ্ধভক্ত' বলা হয়। মহৎ-কৃপাদি রূপ মূল হইতে ভাবরূপ ফুল ও প্রেমরূপ ফল-সম্বলিত ভক্তি-লতার ইহাই সংক্ষিপ্ত বিকাশক্রম।

উক্ত ভক্তি-লতিকা আবার 'রাগ-ভক্তি' ও 'বৈধী-ভক্তি' ভেদে দ্বিবিধ লক্ষণান্বিতা, এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ ভাবযুক্তা হয়েন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদিতে লোভ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে 'রাগভক্তি' ও অপর ভগবৎ স্বরূপ-সম্বন্ধীয় 'ভগবদ্‌ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য' ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্র-শাসন-প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে 'বৈধী-ভক্তি' বলা হয়। যে ভগবদ্ভক্তি কেবল শ্রীভগবৎসেবা-বাসনা ব্যতীত, ভোগ অথবা মোক্ষাদি বাসনা দ্বারা স্পৃষ্টা নহেন, এবং যাহা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান-সাধনাঙ্গের দ্বারা মিশ্রিতা নহেন, তাঁহাকেই শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি কহে। সম্পূর্ণ গুণ-সম্বন্ধশূন্যা বলিয়া শুদ্ধাভক্তির অপর নাম নির্গুণা ভক্তি; সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার ও তৎসেবনই যাহার মুখ্যফল।

নির্গুণা-ভক্তির অপর বিভেদ।

উক্ত ভক্তিই আবার সত্ত্বাদিগুণ সম্বন্ধযুক্তা হইলে, তাহাকে সগুণা-ভক্তি কহে। সগুণা-ভক্তি সকামা ও নিষ্কামা ভেদে দ্বিবিধ। সকামাভক্তি তামস অথবা রাজস হইয়া থাকে; আর্ত্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি ইহার অধিকারী এবং পার্থিব বা স্বর্গাদি-সুখভোগ ইহার ফল। সকামাভক্তি সাত্ত্বিকী হইলে, উহা ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে মোক্ষবাসনাযুক্ত হওয়ায়, তখন উহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়; মুমুক্ষুগণই উহার

'সগুণা-ভক্তি' ও সগুণ ভক্তির প্রকার ভেদ।

অধিকারী। মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কাম ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান অথবা যোগ দ্বারা মিশ্রিতা হইলে উহা যথাক্রমে 'কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি', 'জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি' ও 'যোগমিশ্রা-ভক্তি' নামে কথিত হইয়া থাকেন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল—চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সহিত সদ্যোমুক্তি, এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল—পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-বাঞ্ছাদির সংযোগে এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনাঙ্গের সংমিশ্রণে একই ভক্তির বিভিন্ন প্রকার তারতম্য হইলেও,—

রাগাত্মিকা ও তদনুগতা রাগানুগাভক্তি।

মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী—রাগাত্মিকা—মধুরভাবযুক্তা—ব্রজরামাগণে অবস্থিতা শুদ্ধাভক্তিই সর্ব্বভক্তি-সার ও সর্ব্বভক্তি-শিরোমণি। নিখিল ভক্তি-ধারার ইহাই মূল-উৎস-স্বরূপিণী। পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-মহাপ্রভু হইতে এই সমুন্নত উজ্জ্বল-রসাত্মিকা 'রাগানুগা' প্রেমভক্তি, প্রতিকল্পে একবার করিয়া জগতে বিপুলভাবে বিতরিত হইয়া থাকে।

যে ভক্ত যাদৃশী ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, সেই ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাদি হইতে জীব-হৃদয়েও তাদৃশী ভক্তিরই বিকাশ হইয়া থাকে। পুনরায় যদি সেই জীবের প্রতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তির অধিকারী—এমন কোনও ভক্ত কর্ত্তৃক কৃপা সঞ্চারিত হয়, তবে আবার সেই জীবেই পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তির উদয় সম্ভব হইতে পারে—ইহাই জানিতে হইবে।

যে ভক্ত যাদৃশী ভক্তির অধিকারী, তৎ-সঞ্চারিত কৃপাদি হইতে তাদৃশী ভক্তির উদয়।

নবলক্ষণা ভক্তির এক বা একাধিক অঙ্গ প্রথমতঃ সামান্যাকারে অনুশীলন দ্বারা, তাহা হইতে যথাকালে বিবিধ সাধনাঙ্গ প্রকাশ পাইয়া, অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত নিষ্ঠাদি ক্রমে একই প্রকারে কিরূপে ভাব-পুষ্প ও প্রেম-ফলের অভ্যুদয় ঘটে, তাহার সংক্ষিপ্ত প্রণালী প্রদর্শিত হইল। ইহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের সকল অঙ্গেরই প্রেমোদয়

সামর্থ্য একই প্রকার ও প্রেমোদয়ক্রম একই রূপ ইহাই স্থিরীকৃত লইলেও, একই শ্রেষ্ঠতম আসনোপরি সংস্থাপিত নববিধ ভক্তির মধ্যে আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই 'তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া যখন এই কলিঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জগতে, স্বয়ং কলিপাবনাবতার—বেদময় পুরুষ শ্রীশ্রীগৌরহরি কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে, তখন অতঃপর আমাদিগকে আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, নববিধ ভক্তির শ্রেষ্ঠতম আসনেরও উপর আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কোনও এক বিশেষ গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ কি হইতে পারে।

নববিধ সাধন-ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্বের হেতু অনুসন্ধান।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা বশতঃ ('অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ'-পাদ্মে) আনুকূল্যে নামীর অনুশীলনের ন্যায়, আনুকূল্যে তন্নামের অনুশীলনও সেই একই ভগবদনুশীলন—কৃষ্ণানুশীলন-রূপ ভক্তি হইলেও, একই শ্রীভগবৎ স্বরূপের 'নামী' রূপ প্রকাশ হইতে 'নাম' রূপ প্রকাশে কৃপাধিক্যের কথা শাস্ত্রে স্পষ্টই কীর্ত্তিত হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, নামী হইতে নামের এই বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়;—

শ্রীভগবানে ও শ্রীভগবন্নামে অভিন্ন হইয়াও, নামী-স্বরূপ হইতে নাম-স্বরূপে কৃপাধিক্য।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্বপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স মামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

(পদ্ম পুরাণে, স্বর্গখণ্ড, ৪৮ অ°)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ বা পাপাচরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া

থাকে। আবার যে নরাধম এমন শ্রীহরির নিকট (অর্থাৎ নামীর নিকট) অপরাধী হয়, যদি সেই ব্যক্তি কখন নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নামপ্রভাবে ভগবদপরাধ হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। নাম সর্ব্বমঙ্গলময়—সর্ব্বোপকারক; অতএব এতাদৃশ নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে নিশ্চয়ই যে অধঃপতিত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও, কৃপার আধিক্যে নামী হইতেও যে নামের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, তদ্বিষয়ক শাস্ত্রমর্ম্ম আমাদিগকে সুবিদিত করাইবার জন্য জীব-হিতৈকব্রত শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকে লিখিয়াছেন,—

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্তেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥ (৬ষ্ঠ শ্লোক)

অর্থাৎ হে নামন্! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যাত্মক শ্রীবিগ্রহ (অর্থাৎ নামী) এবং বাচক অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' 'রাম' ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাম,—আপনার এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু আমরা তদীয় বাচ্য-স্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকেই অধিক করুণ বলিয়া বিবেচনা করি; যে-হেতু জীব, বাচ্য বা নামীর নিকট কৃতাপরাধ হইয়া বাচক বা নাম-স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ মাত্রেই নিরপরাধ হইয়া নিত্যানন্দসাগরে নিমগ্ন হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—নামীর নিকট কৃতাপরাধ ব্যক্তি নামীর আশ্রয়ে সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু তদবস্থায় নামের আশ্রয় লইলে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে; অতএব নামী অপেক্ষা নাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার এতাদৃশ পরম-কারুণিক নামের নিকট

সেবাপরাধ, সেবা দ্বারা খণ্ডন হয় না—কিন্তু সেবাপরাধ নাম দ্বারা এবং নামাপরাধও নাম দ্বারাই খণ্ডিত হয়।

অপরাধ ঘটিলে, যদিও সে ব্যক্তির পক্ষে অধঃপতিত হওয়া ভিন্ন অপর কেহই রক্ষক বা তন্নিবারক নাই, উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, —তথাপি সেই জীবকে অনন্যোপায় জানিয়া, অনন্ত কৃপালু 'নামই' তাহার গতি বিধান করিয়া থাকেন ;—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

(পদ্ম পুরাণে, স্বর্গখণ্ড ৪৮ অ°)

অর্থাৎ যাহারা নামাপরাধে অপরাধী, নাম সকলই তাহাদের সেই অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে অবিশ্রান্ত নাম-কীর্ত্তনে সকল প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নাম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অনুসারে যখন স্পষ্টই শ্রীনামী হইতে শ্রীনামে কৃপাশক্তির অধিক প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তখন আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে—প্রথমেই নামীস্বরূপের অনুশীলন অপেক্ষা নামস্বরূপের অনুশীলনের যে অধিকতর কৃপাবিস্তারের সুসংবাদ নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মায়াহত জীবের পক্ষে নির্গুণা ভক্তির কোন অঙ্গই গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না,—যে পর্য্যন্ত মহৎ-কৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শ লাভ না ঘটে। অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহৎ-কৃপা প্রভাবে প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল জাগিয়া উঠে বলিয়াই, কেবল সেই জীবের পক্ষে প্রথমে সাধন-ভক্তির অন্তর্গত নবধা ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একাধিক অঙ্গ সামান্যাকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় এবং তাহা হইতে যথাকালে সাধনাঙ্গের উদ্গমের সহিত যথাক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

মহৎকৃপা হইতে সঞ্জীবিত পুরুষকার বা আত্মবলই 'ভক্ত্যঙ্গ' গ্রহণ সামর্থ্যের কারণ।

যষ্টি-বিহীন পঙ্গুর পক্ষে স্বশক্তি-প্রয়োগে অসহায়তা-নিবন্ধন পথাতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও যষ্টি-প্রাপ্ত পঙ্গুর পক্ষে যেমন তৎসহায়তায় স্বশক্তি প্রয়োগে পথাতিক্রম করা সম্ভব হয়, সেইরূপ মহৎ-কৃপাবিরহিত জীবের পক্ষে সাধনভক্তিপথ প্রাপ্তির ও সেই পথে অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকিলেও, মহৎ-কৃপারূপ যষ্টিপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে তৎসাহায্যে ভক্ত্যঙ্গ সেবনে উন্মুখতা বা প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে ; সেই জাগ্রত আত্মশক্তি বা পুরুষকার প্রভাবেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। আবার প্রাপ্তযষ্টি পঙ্গুর পক্ষে পথাতিবাহন সম্ভবপর হইলেও, যেমন অবিরত নিজ চেষ্টাশীলতা দ্বারাই উহা অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু যানারোহণে সেই পথ অতিক্রম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, উহা যেরূপ তদপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ মহৎ-কৃপা সংযোগের সহিত, জীবের পক্ষে প্রথমে নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া সাধনপথে যে-ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, অপর ভক্ত্যঙ্গের সহিত নামাশ্রয়ে বা প্রথমে কেবল নামাশ্রয়ে, সাধনপথে সর হওয়া তদপেক্ষা সহজ ও সুখকর হইয়া থাকে। পথ চলিয়া যাইতে হইলে যথাক্রমে যে যে স্থান দিয়া ও যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, যানারোহণে গমন করিলেও যেমন ঠিক সেই সেই স্থান ও সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ নামাশ্রয় ভিন্ন অন্য ভক্ত্যঙ্গ, বা নামাশ্রয়ের সহিত অপর ভক্ত্যঙ্গ অথবা কেবল নামাশ্রয় হইতে প্রেমোদয়ের ক্রম বা প্রণালী একই প্রকার হইলেও, পথ চলিয়া যাওয়ায় যেমন 'যাইতে হয়' এবং যানারোহণে যাওয়ায় যেমন 'লইয়া যায়'—অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের ইহাই সুমহান্ বৈশিষ্ট্য। শ্রীনামী-স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীনাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য

'চলিয়া যাওয়া' ও 'লইয়া চলায়' যে প্রভেদ, অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের যথাক্রমে সেইরূপ ভিন্নতা।

হইতেই এই বৈশিষ্ট্য সংঘটিত হইয়া থাকে। নামাশ্রয়ীকে নাম 'শ্রদ্ধাদি' ক্রমে ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া 'লইয়া যান'; আর নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গাশ্রয়ীর পক্ষে, যথাকাল সমুদিত হইলেই 'শ্রদ্ধাদি' ক্রম ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া 'যাইতে হয়।' সাধন পথে এই যাইতে পারিবার শক্তি বা প্রকৃষ্ট পুরুষকারের প্রয়োগ যদিও মহৎকৃপা প্রভাবেই জীবের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তথাপি সন্তরণপটু কোনও ব্যক্তির পক্ষে সন্তরণ দ্বারা বিস্তীর্ণ জলাশয় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব না হইলেও, তরণীর সহায়তা লাভ করিতে পারিলে তাহা যেমন অত্যন্ত সহজ ও সুখকর হয়, সেই প্রকার প্রথমতঃ অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয়রূপ সন্তরণপটুতা অপেক্ষা, নামাশ্রয়রূপ তরণীর সহায়তা লাভ করা যে বিস্তীর্ণ সাধন-নদী উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে অধিকতর আশাপ্রদ হইয়া থাকে, তাহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের এই মহান্ বিশিষ্টতার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ,—

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন।' (শ্রীচৈ°, অন্ত্য ৪।৬৫-৬)

নামাশ্রয়ীর পক্ষে অপর 'ভক্ত্যঙ্গ' বা গুরুপাদাশ্রয় ও দীক্ষাদি 'সাধনাঙ্গ' আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই—এরূপ মনে করা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে; যে-হেতু নাম হইতে সহজে প্রেমোদয় হইলেও, অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে প্রেমোদয়ের ন্যায়, উহা যথাক্রমেই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গাদি ও গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সকলকেই উক্ত ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে। 'ভক্ত্যঙ্গ'

নাম শ্রয় হইতে প্রেমোদয়, যথাক্রমে দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সাপেক্ষ।

হইতে 'সাধনাঙ্গের' উদ্গম হয় বলিয়া, কারণস্বরূপ ভক্ত্যঙ্গের কার্য্যই সাধনাঙ্গ। কার্য্যকেই কারণের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু কারণ কখন কার্য্যাপেক্ষী হয় না; সেই জন্যই কারণ-স্থানীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সামান্যাকার অনুশীলনাবস্থায়, কার্য্য-স্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা নাই;—'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে'; (শ্রীচরিতামৃতে, মধ্য ১৫প°)—কিন্তু দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের পক্ষে তৎকারণস্থানীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অপেক্ষা আছে। নামাশ্রয়, দীক্ষা বা 'মন্ত্র' প্রাপ্তিরও কারণ বলিয়া, নাম—'মহামন্ত্র'। আবার ভক্ত্যঙ্গ যেমন গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের কারণ, তেমনি সাধনাঙ্গও আবার অনর্থনিবৃত্তি-নিষ্ঠাদি ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ;—'প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।' —(শ্রীচরিতামৃতে, আদি ৮ প°) সুতরাং প্রথমে সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনে দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা না থাকিলেও, সাধনাঙ্গ আবার যে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ,—সেই ভাব ও প্রেমভক্তিরূপ কার্য্যের পক্ষে তৎকারণ স্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অবশ্যই অপেক্ষা আছে। **ইহাদের মধ্যে শ্রীনামই সর্ব্বমূল কারণ।**

অপর ভক্ত্যঙ্গের ন্যায় নামাশ্রয় হইতেও একই ক্রমে—একই প্রণালীতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। 'জ্ঞান'-স্বরূপ জীবের পক্ষে 'ইচ্ছা' ব্যতীত 'ক্রিয়া' বা চেষ্টাশীল হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছা হইতেই ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। 'ভক্ত্যঙ্গের' আশ্রয় লাভ হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে যথাকালে যে 'সাধনাঙ্গ' ও ক্রমশঃ ভাব ও প্রেমভক্তিরূপ কার্য্যের প্রকাশ হয়, তাহা জীবের প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা চেষ্টাশীলতার ফল হইলেও, নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গসেবী জীবে, শ্রদ্ধাদি ও সাধনাঙ্গাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাকালে যে বাসনা ও চেষ্টাশীলতা লক্ষিত

ভজন-ক্রিয়াশীলতার মূলে মহৎকৃপা-সঞ্জাত 'স্বকৃত ইচ্ছা' ও 'নামকৃত ইচ্ছা' ভেদে দ্বিবিধ ইচ্ছাশক্তির বিকাশ।

হয়, তাহা মহৎ-কৃপা দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ স্বকৃত চেষ্টাশীলতা ; কিন্তু নামাশ্রয়ীর পক্ষে সেই ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতা 'স্বকৃত' না হইয়া 'নামকৃত' হওয়ায়, অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয় করিয়া সাধনপথে জীবকে চলিতে হয়, আর নাম নিজ আশ্রিত জনকে সাধনপথে লইয়া চলেন ; নববিধা ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের ইহাই সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। স্বকৃত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, বৃক্ষে যেমন অন্য কোনও এক ইচ্ছা কর্ত্তৃক যথাকালে ও যথাক্রমে শাখা, পত্র, পুষ্পাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ নামাশ্রয় হইতে নামকৃত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া যে ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয়, তৎফলে জীবের পক্ষে যথাক্রমে ও যথাকালে শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সকল এবং তাহা হইতে যথাকালে ভাব ও প্রেমভক্তির উদ্গম হইয়া থাকে। তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-মুখাজ্জবিনির্গত **শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের** ব্যাখ্যায়, শ্রীচরিতামৃতকার, নামাশ্রয় হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবামৃতে চিরনিমগ্ন হইবার সংক্ষিপ্ত স্তর বা ক্রম প্রদর্শন করাইয়াছেন ;—

'সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥' (অন্ত্য ২০।১০-১১)

অর্থাৎ নাম-সংকীর্ত্তন—নামাশ্রয় হইতে পাপক্ষয় ও অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া, চিত্তশুদ্ধি বা শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত সর্ব্বভক্তি=নববিধ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধন=সাধনাঙ্গ সকলের উদ্গমের পর, উহা যথাক্রমে প্রেমোদ্গম করাইয়া, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির সহিত কৃষ্ণসেবামৃত সমুদ্রে মজ্জমান্ ভক্তকে প্রেমামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকেন। নামাশ্রয় হইতে কেবল যে শ্রদ্ধাদিক্রমে—সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদ্গম হয় তাহাই নহে,—নববিধ

ভক্ত্যঙ্গের পূর্ণ বিকাশ, নামাশ্রয় হইতেই সহজে সম্ভব হইয়া থাকে ; তাই স্বয়ং নামী কর্ত্তৃক নামের এই বিজয়বার্ত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে,—

'নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।' (মধ্য ১৫।১০৮)

নামাশ্রয়ের পর, যথাক্রমে ও যথাকালে সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদয়ের অদর্শনের—নামাপরাধই কারণ।

যথাকালাবধি নামাশ্রয় করিয়াও যদি অপর ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গাদি গ্রহণ করিবার জন্য জীবহৃদয়ে নামকৃত ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতার কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে 'নামাপরাধের' বিদ্যমানতা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। একমাত্র নামাপরাধ ভিন্ন শ্রীভগবন্নাম-শক্তির অদর্শনের অপর কোনও কারণ নাই—ইহা দৃঢ়তার সহিত জানিয়া রাখা আবশ্যক। শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে ;—

'হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। [বহুদিন]
তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার॥ [শ্রদ্ধাদি-ক্রমে]
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর।' (আদি, ৮।২৫-৬)

দশবিধ নামাপরাধ।

পরম করুণাময় শ্রীনাম-স্বরূপও, যে অপরাধ সংঘটিত হইলে সেই অপরাধী জীবের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ কৃপাবিস্তারে কুণ্ঠিত বা বিরত হয়েন, তাহাকেই 'নামাপরাধ' কহে। পদ্ম পুরাণে যে দশবিধ নামাপরাধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র* নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) সাধুনিন্দা ; (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন ; (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা ; (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা ;

* শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ, শক্তি ও নামাপরাধাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, গ্রন্থকার প্রণীত ও ক্রমশঃ প্রকাশিত 'শ্রীনামচিন্তামণি' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।—প্রকাশক।

(৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে 'ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বা প্রশংসামাত্র' এইরূপ মনন; (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন বা কুব্যাখ্যা; (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি; (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন; (৯) শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ; (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অপ্রীতি।

[উক্ত সাধু, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে, যে-স্থলে অপরাধ ঘটিয়াছে প্রথমে তৎসমীপেই বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য; তাহাতে অকৃতকার্য্য বা অসম্ভাবনা ঘটিলে, সেই স্থলেই অনন্যোপায় জীব, নামের শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয়—নামকীর্ত্তন করিলে, নামের কৃপায় উক্ত নামাপরাধ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে।]

উক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, শ্রীনামকে নিরন্তর সুপ্রসন্ন রাখা আবশ্যক। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামের একটি সুস্পষ্ট ও প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নামাপরাধ ঘটিলে তৎপ্রশমনার্থ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইয়া, (অপর ভক্ত্যঙ্গ বা সাধনাঙ্গের নহে) একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে, সেই অপরাধ হইতেও উদ্ধার লাভ করা যায়; অতএব অপরাধ খণ্ডন বিষয়েও একমাত্র শ্রীনামেরই সমর্থতা ঘোষিত হইয়াছে; যথা—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥

(পদ্ম পুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৪৮ অ°)

অর্থাৎ যদি কোন প্রকার অনবধানতা বশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া—একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

সাধনপথে অগ্রসর হইবার কালে অনবধানতা বশতঃও নামাপরাধ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, এবং নামাপরাধ ঘটিলে নামাশ্রয় ভিন্ন তৎপ্রতীকারের অপর কোনও উপায় না থাকায়, নববিধ ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকারেও পরম উপকারক বলিয়া, নাম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ শ্রীভগবন্নাম জীবের পক্ষে অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের পূর্ব্বে, অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের সহিত এবং সাধনাঙ্গাদির মধ্যে—এক কথায় প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধ, সকল অবস্থায়—সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করা যে একান্তই আবশ্যক, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীহরিনামাশ্রয়-বর্জ্জিত যে অন্য কোনও স্বতন্ত্র ভজন সাধন নাই, একথা সর্ব্ব ভজন সাধনের নির্ণায়ক, শাস্ত্রই ত্রিসত্যরূপে ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা,—

শ্রীভগবন্নাম সর্ব্বদা, সর্ব্বভাবে, সকলের পক্ষেই আশ্রয়নীয়।

নামাশ্রয়ই কলির যুগ-ধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয়ে, ৩৮।১২৬)

যুগধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ ও অপর সমস্ত সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' বা কারণ-স্বরূপ হওয়ায়, এবং কর্ম্মাদির বৈগুণ্য দোষ সকলের একমাত্র শুদ্ধিকারক ও সম্পূরক বলিয়া, এইহেতু কলিযুগে কেবল শ্রীনাম সম্বন্ধেই এতাদৃশ দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইয়াছে। সুতরাং কলিযুগে শ্রীনাম হইতে শ্রেষ্ঠ বা শ্রীনামের সমান কিম্বা শ্রীনাম-বিযুক্ত যে, অপর কোন সাধনা নাই,—এই কথাটি বুঝিতে পারিলে আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক হইবে।

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের জনক ও মহোপদেশক শ্রীশ্রীগৌরহরি স্বয়ং

উক্ত শ্লোকের যে, প্রকৃষ্ট অর্থ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে—অন্ততঃ এই বর্ত্তমান যুগে, সকল মনুষ্যের পক্ষে নিরপরাধে নামাশ্রয় করাই যে শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য এবং তদ্ব্যতীত জীবের শ্রেয়োলাভের যে অন্য কোন পন্থা নাই,—এই কথা বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

'দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপ আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাই' 'নাই' 'নাই' তিন, তিনে 'এব'কার॥'

(শ্রীচরিতামৃত, আদি ১৭।২০-২২)

বীজ হইতেই যেমন অঙ্কুরের উদ্গম হইয়া, পরে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখাদিক্রমে পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয়, সেইরূপ একমাত্র মহৎ-সঙ্গ-সঞ্জাত শ্রীনামরূপ বীজ বা কারণ হইতেই শ্রদ্ধাদিক্রমে সমস্ত সাধন-ভক্তির উদ্গম হইয়া তাহা হইতে যথাক্রমে 'ভাব' ও 'প্রেম'-ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং 'শ্রদ্ধা' হইতে 'প্রেম' পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাবের শ্রীনামই হইতেছেন মুখ্য-কারণ এবং তৎসমুদয়ই শ্রীনামেরই কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ ব্যতীত যেমন কার্য্যের বিকাশ সম্ভব হয় না, সেইরূপ নিখিল সাধনাঙ্গের কারণস্বরূপ শ্রীভগবন্নাম—কৃষ্ণনামকেই 'অঙ্গী-সাধন' ও অপর সমস্ত সাধনাঙ্গকে 'অঙ্গ-সাধন' বা নামেরই কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া, শ্রীনামকেই কলিযুগের একমাত্র অঙ্গী-সাধন বা মুখ্য-ভজন

শ্রীনামরূপ বীজ বা কারণ হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে ভজনাঙ্গ সকলের উদ্গম হইয়া থাকে বলিয়া—শ্রীনামই হইতেছেন 'অঙ্গী'-ভজন।

রূপে বিদিত না হইয়া, যদি অপর ভজন-সাধনাঙ্গের সহিত সমান বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে ইহাও একটি 'নামাপরাধ' হয়। 'অপর শুভক্রিয়াদির —এমন কি অপর ভজনাঙ্গের সহিতও শ্রীনামের সমতা চিন্তন'—ইহাও শাস্ত্রে একটি 'নামাপরাধ' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। একমাত্র নামাপরাধ অর্থাৎ শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বিধান ব্যতীত, নামের অচিন্ত্য ও অব্যর্থ মহিমার অপ্রকাশ বিষয়ে অপর কোনও কারণ নাই। সুতরাং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিরূপ নামানুশীলনকেই সাধন-জগতে সর্ব্বোপরিস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া, যদি অপর যে-কোনও শুভক্রিয়াদি কিম্বা ভজনাঙ্গের সহিত নামকে 'সমান' বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা 'নামের সমতা চিন্তন' রূপ নামাপরাধ ঘটে; যাহার কুফলে নামের অব্যর্থশক্তির অনুভূতি না হইবার কারণ হইয়া থাকে।

কলিযুগে একমাত্র শ্রীনামই অঙ্গী-সাধন বলিয়া, অপর যেকোন ভজন-সাধনের সহিত নামের সমতা চিন্তা করাও অপরাধ। শ্রীনামের স্থান সর্ব্বোপরি,—ইহা সর্ব্বভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

বীজ বা মূলকে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়া, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্পাদির আবির্ভাব যেমন কল্পনামাত্রই হইয়া থাকে, সেইরূপ এই যুগে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি উদ্‌গমের একমাত্র মূল কারণ বা বীজস্বরূপ —শ্রীনামের নিকট অপরাধগ্রস্ত হইয়া, ভক্তির আবির্ভাবও সেইরূপ কল্পনামাত্রই জানিতে হইবে।

আবার বীজ যদি প্রসন্ন বা পুষ্ট থাকে, তাহা হইলে যথাকালে শাখা-পত্রাদির বিকাশ যেমন অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্যই হয়, সেইরূপ সর্ব্বমূল ও 'অঙ্গী' বা বীজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম প্রসন্ন থাকিলে, অপর সাধন ও সাধ্যবস্তু সকলের আবির্ভাব যথাক্রমে আপনিই সাধিত হয়; তদ্বিষয়ে সাধকের কোনও অনুসন্ধান ও স্বকৃত চেষ্টাদির অপেক্ষাই থাকে না। অতএব বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদিরূপ 'অঙ্গী' ভক্তিকে

অপর কোন সাধন বা ভক্ত্যঙ্গের সহিত কোন প্রকারে 'সমান' মনে না করিয়া,—সর্ব্বভাবে সাধন জগতের সর্ব্বোপরি স্থানে—অন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসনে সংস্থাপিত করিয়া যে নামগ্রহণ,—উহাকেই 'নামাশ্রয়' কহে। উক্তপ্রকারে শ্রীনামে ঐকান্তিক আদরবুদ্ধি না থাকিলে 'নামাশ্রয়' হয় না। আশ্রিতকে সর্ব্বভাবে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায়,—শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন স্বরূপ শ্রীভগবন্নামও তাই নামাশ্রয়ীকে অপরাধাদি হইতে সর্ব্বভাবে রক্ষা করিয়া প্রেমফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু 'নামাশ্রয়ী' না হইয়া কেবল 'নামগ্রাহী' হইলে, বিশেষ চেষ্টা দ্বারা দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণাদি দ্বারা নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শ্রীনামকেই সমস্ত ভজন সাধনের 'অঙ্গী' বা কারণ স্বরূপ ও অন্যান্য সাধন বা ভজনকে নামেরই অঙ্গ বা কার্য্যরূপে অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য কলিযুগে একমাত্র শ্রীনাম ব্যতীত যে অপর কোন স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ সাধন নাই,—হরের্নামৈব—ইত্যাদি শ্লোকে ত্রিসত্য করিয়া 'নাস্ত্যেব' শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতা সম্পাদন করা হইয়াছে।

সমস্ত ভজনাঙ্গের 'অঙ্গী' ও তন্মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠবোধে —অত্যাদর বুঝিতে নাম গ্রহণই—'নামাশ্রয়'। 'নামাশ্রয়ী' না হইতে পারিলে, নামের তুল্যত্ব বা ন্যূনত্ব চিন্তাদি দ্বারা নামাপরাধের সম্ভাবনা। কেবল নামাপরাধ ভিন্ন অপর কিছুতেই নামের প্রভাব অপ্রকাশের কারণ হয় না।

তাই দেখা যায়, কলিযুগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিরূপ একমাত্র নামাশ্রয়েরই অঙ্গী-সাধনত্ব শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতেও মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে ; যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(শ্রীভা° ১২।৩।৫১)

অর্থাৎ হে রাজন্! কলি সমস্ত দোষের নিধি-স্বরূপ হইলেও, (সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন) ইহাতে সুনিশ্চয় কেবল একটিমাত্র মহৎ গুণ আছে; উহা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন। যাহা হইতে জীবের সংসারপাশ বিমুক্তির সহিত পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।

কলিযুগে শ্রীনামই জীবের একমাত্র নিস্তারের উপায়। নাম হইতেই সমস্ত সাধ্য ও সাধনের উদ্গম হয় বলিয়া একমাত্র শ্রীনাম ব্যতীত এই যুগে অন্য কোন স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র সাধন ভজন নাই —ইহা শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কলিযুগে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ এই একটি মাত্রই মহৎগুণ বা পরম মঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছেন,—তদ্ভিন্ন সমস্তই যে দোষনিধি,—ইহা সুনিশ্চয়। যে নামকে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বমূল কারণ বোধে আশ্রয় করিতে পারিলে,—রাজ অমাত্যগণ যেমন মহারাজের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন, সেইরূপ অপর সমস্ত মঙ্গল শ্রীনামেরই অনুবর্ত্তী বা তৎকার্য্যরূপে সমুদিত হইয়া, জীবকে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীনাম ব্যতীত কলিযুগে স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র অপর কোনও সাধন না থাকায়, —শ্রীনামকে যদি সর্ব্বকারণ বা 'অঙ্গী'-ভজনরূপে 'আশ্রয়' করা না হয়, তাহা হইলে অপর কোন অঙ্গেরই প্রকৃষ্ট উদয় না হইয়া, তৎসকাশে সমস্তই অমঙ্গল স্বরূপ বা 'দোষ-নিধি' রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব

কলিযুগে জীব নিস্তারের অপর সমস্ত উপায়েরও উপায় স্বরূপ বলিয়া, শ্রীনামই হইতেছেন—পরমোপায়।

কলিযুগে সাধ্য-সাধনরূপ সকল মঙ্গল লাভের মূলে একমাত্র পরম মঙ্গল—শ্রীভগবন্নামকেই অবস্থিত জানিয়া, শ্রীনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করা আবশ্যক। তাই শ্রীনামের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংবাদ অপর উক্তি দ্বারাও স্বয়ংভগবৎ শ্রীগৌরহরি কর্ত্তৃক সহর্ষে ঘোষিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ (শ্রীচৈ° ৩.২০।৭)

অর্থাৎ অপর সকল উপায়েরও উপায় স্বরূপ বলিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই কলিযুগে জীব নিস্তারের পরমোপায় বলিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক।

সর্ব্ব সাধন-তরু ও সাধ্য-ফলের মূলে একমাত্র বীজস্বরূপ যে, শ্রীনাম বিদ্যমান রহিয়াছেন, শাস্ত্রের সেই পরম নিগূঢ় রহস্য, কলি-পাবনাবতার —শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বা জনকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি ;—

"সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন॥ বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥ স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন। নিমাই পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥ তেঁহো তোমার সাধ্য সাধন করিবে নিশ্চয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয়॥ স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে। স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে। প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল। 'নাম সঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল॥" (শ্রীচৈ° ১।১৬)

তাহা হইলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে, সর্ব্ব সাধ্য-সাধনের বীজস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা তৎসমুদয়ের 'অঙ্গী' ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু মঙ্গল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(শ্রীচৈ° ভা° ১।১০)

অতএব সমস্ত সাধ্য ও সাধনাঙ্গের মূলে একমাত্র শ্রীভগবন্নামই যে, 'অঙ্গী' বা কারণ-স্বরূপে বিরাজিত,—সমস্ত সাধ্য ও সাধন সকল যে, নামেরই 'অঙ্গ' বা কার্য্য,—সাধন জগতের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া এবং অঙ্গের সহিত অঙ্গীর সমতা বা ন্যূনতা চিন্তা না করিয়া,

—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যাদর বুদ্ধির সহিত কেবল শ্রীনামাশ্রয়ে ভজন করিতে পারিলেই ভজন-পথে মঙ্গলের পর মঙ্গল লাভ ভিন্ন কোনও অমঙ্গলের আবির্ভাব হইতেই পারে না,—ইহা স্থির। এই যুগে শ্রীনামকে হৃদয়ের সর্ব্বোপরি আসনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, 'সমতা-চিন্তন' রূপ বিশেষভাবে এই অপরাধটিই কলি-প্রভাববশতঃ সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান জীবজগতে অধিকতর রূপে সঞ্চারিত হইয়া, উহারই কুফলে পরম শ্রেয়োলাভ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে,—এই কথাটি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। (এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 'শ্রীনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণে আলোচিত হইবে)।

অপর সাধনাঙ্গের সহিত শ্রীনামের সমতা বা ন্যূনতা চিন্তনই কলিজীবের প্রতি কলির শ্রেষ্ঠ প্রতারণা।

কলিপাবনাবতার—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-হরি যে কেবল নামোপদেশ দ্বারাই জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠদান-স্বরূপ নাম-প্রচার কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতকে নামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করাইয়া, সমহিমা নামোপদেশ প্রদান ও অবাধে সর্ব্ব জীবকে শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনামতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান, কলি-তমসাচ্ছন্ন জগতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যবিদ্ সুধীবৃন্দও সহর্ষে ও সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন :—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যৎ তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তৎ
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—৩)

অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা কিম্বা তপস্যা, ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও

বহুস্তুতি দ্বারাও যাহা লাভ করিতে কেহ সমর্থ হয়েন নাই, তার্কিকগণও যাহা তর্কের গোচর করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অধিক কি যাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দ প্রেমভাজন বৈষ্ণবগণও যে রহস্য প্রকাশ করেন নাই,—যিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবতীর্ণ হইলে কেবল শ্রীভগবন্নাম হইতেই সেই ভগবৎ-প্রেম-রূপ রহস্য স্বয়ং প্রাদুর্ভূত করাইয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি নমস্কার করি।

অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যিনি বিদ্যুৎ-বরণা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা বিমণ্ডিত, সেই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, পরমকারুণিক—কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও তৎপ্রচারিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত সম্মত শ্রেষ্ঠতম উপাস্য ও শ্রেষ্ঠতম উপাসনা।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(শ্রীভাগবতে ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ ভক্ত বিশেষের দৃষ্টিতে অন্তরে শ্যামকান্তি হইয়াও যিনি বাহিরে গৌরকান্তিতে প্রকাশিত কিংবা তথাবিধ হইয়াও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ ও কৃষ্ণগুণ যাঁহার শ্রীবদনে সর্ব্বদা স্ফুরিত, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দ যাঁহার উপাঙ্গ, শ্রীহরিনাম যাঁহার অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি যাঁহার পার্ষদ,—স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ (এই কলিযুগে) শ্রীনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট। *

—— x ——

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শুভ আবির্ভাব—বর্ত্তমান যুগের মঙ্গলপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। অদূর ভবিষ্যতে, জড়বাদ—ভোগবাদের চিতাভস্মের উপর সমস্ত জগৎব্যাপী যে এক বিরাট আত্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে,—যাহার অচিন্ত্য প্রভাবে মানব-হৃদয়ের সকল দুঃখ,—সকল দৈন্য,—সকল বিষাদ,—সকল বিদ্বেষ,—সকল কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া গিয়া, এক অমল—অখণ্ড ভগবৎ-প্রীতির পবিত্র বন্ধনে সমস্ত জগৎ একসূত্রে সংবদ্ধ হইবে, তাহারই নাম শ্রীগৌরাঙ্গের 'প্রেমধর্ম্ম';—তাহাই হইবে বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম।

কেবল ভারতবর্ষ নহে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

---

* লেখকের 'ফাল্গুনী-পূর্ণিমা' নামক যে প্রবন্ধ, সাইন্তাগঞ্জ পোঃ; জেলা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ' পত্রিকার ১৩৩৫ সালের আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ও ১৩৩৮ সালের জৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় বহুল শাস্ত্র প্রমাণাদিসহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে,—এই পরিশিষ্ট তাহারই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম লইয়া লিখিত। বর্ত্তমান জগতের অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দিনের অবসানে কোনও এক পরম মঙ্গলময় নবযুগের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে মিঃ ওয়েলস্ প্রমুখ মনীষিগণ সম্প্রতি যে আন্দোলন আনিয়াছেন, (আনন্দবাজার পত্রিকা—৫।১০।১৯৩৮। দ্রষ্টব্য) উক্ত পরিশিষ্টের সহিত সেই মতের মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে কতদূর সাদৃশ্য আছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণের বিবেচনা করিবার বিষয়। পার্থক্য এই যে, উক্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষিদিগের ভবিষ্যদ্বাণী সম্প্রতি বিঘোষিত,—'কারণ' অনির্ণীত এবং কেবল কল্পনা প্রসূত। গ্রন্থকারের প্রয়াস ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও, উহার বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখিত—'কারণ' নির্দ্ধারিত ও সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত। স্বদেশবাসিগণ ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখেন, —ইহাই বিনীত নিবেদন। —প্রকাশক।

পর্য্যন্ত এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর দ্বারা আলোড়িত হইয়া,—মথিত সমুদ্র হইতে অমৃতের অভ্যুদয়ের পর তাহা যেমন আপনিই সুশান্ত হইয়া যায়—সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্ম—'প্রেমধর্ম্মের' অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের সকল চাঞ্চল্য,—সকল অস্থিরতা,—সকল গ্লানি, যে ক্রিয়ার ব্যাপ্তিক্রিয়ায় প্রকৃষ্টরূপে প্রশমিত হইয়া যাইবে,—তাহারই নাম 'গৌরলীলা'।

শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা যতই অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব,—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিগূঢ় রহস্য জগতের সমক্ষে যতই অধিকতররূপে উদ্ঘাটিত হইবে,—বর্ত্তমান জগৎ ততই পরমানন্দ ও পরম-শান্তির সন্নিকটবর্ত্তী হইবে,—ইহা আমাদিগের সুদৃঢ়রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। পূর্ণতম জীব-স্বরূপের যাহা পূর্ণতম স্বধর্ম্ম—তাহাই শ্রীগৌরলীলারূপ কারণের কার্য্য বা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিকল্পে একবার করিয়া একযোগে এই জগতে সার্ব্বজনীনভাবে স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের শ্রীগৌর-লীলা এই জগতে অপ্রকট হইলেও, সেই লীলার পরম মঙ্গলময় ও বিরাট প্রতিক্রিয়া, সমস্ত পৃথিবীর উপর সূক্ষ্মভাবে সম্প্রতি কেবল মাত্র আরব্ধ হইয়াছে, যাহার অব্যর্থ প্রভাব জগতের উপর ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিবে, এবং সেই প্রেমধর্ম্মই বর্ত্তমান কলিযুগে, কলি অকালে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর, অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জীবের শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্মরূপে—আত্ম-মহিমায় আপনিই সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধির বিষয় হইবেন।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, আমাদের এই মনুষ্যলোকের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে দেবলোকের একটি যুগ হইয়া থাকে, যাহাকে এক চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ কহে। এই প্রকার প্রায় সহস্র চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ, ব্রহ্মার একটি দিবস পরিমিত কাল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; যাহাকে 'কল্প' নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ এক

একটি কল্পের অন্তর্গত চতুর্দ্দশটি মন্বন্তর ; এবং একাত্তরটি চতুর্যুগ আবার এক একটি মন্বন্তরের অন্তর্গত। উক্ত শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসারে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনা এইরূপ ;—

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি।
এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥
একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥ (আদি ৩।৫-৬)

কলিযুগের পরিমাণ, আমাদের বর্ষ-পরিমাণের ৪,৩২০০০ বর্ষ ; দ্বাপর যুগের ৮,৬৪০০০, ত্রেতাযুগের ১২,৯৬০০০, ও সত্যযুগের ১৭,২৮০০০ বর্ষ। তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যলোকের ৪৩২,০০০০০০০, চারিশত বত্রিশ কোটি বর্ষ পরিমিতকালে এক 'কল্প' হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার একটি দিন, ও তদনুরূপ দিনের ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস ও তদ্রূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার একটি বর্ষ হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষে ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ ; এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধকাল বা শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরমায়ু। বর্ত্তমান ব্রহ্মার বয়সের পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম বর্ষের প্রথম মাসের প্রথম দিন বা 'শ্বেতবরাহ' নামক প্রথম কল্প চলিতেছে।* ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল স্মরণ করিতেই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি ; কিন্তু যাঁহার চক্ষের উন্মেষ ও নিমেষকাল মধ্যে এতাদৃশ ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে,—সেই নিত্যেরও নিত্য—অনাদিরও আদি—সর্ব্ব কারণের কারণ শ্রীভগবানের গুণ-লীলা-মহিমাদি সমস্তই যে, ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তদপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ

* প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি সম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের, প্রভুপাদ শ্রীমন্ মদনগোপাল গোস্বামি-কৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যের ২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা (২৮-৩২ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

কি? শ্রীভগবানের অসীম মহিমা স্মরণ করিয়া, তাই বৈষ্ণবকবি লিখিয়াছেন,—

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥' (—বিদ্যাপতি)

এতাদৃশ ভগবল্লীলা ও মহিমাদি শ্রবণে আমরা অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হইতে পারি, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি—ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত ও অচিন্ত্য শ্রীভগবল্লীলা ও মহিমাদি বিষয়ে অবিশ্বাসী হইবার কোনও অধিকার নাই—ইহাও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শাস্ত্রদৃষ্টে জানিতে পারা যায়, ব্রহ্মার এক দিনে বা এককল্পে—সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে শ্রীভগবান্ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে 'শুক্ল', 'রক্ত', 'শ্যাম', ও 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ ও এই নাম ধারণ পূর্ব্বক অংশে ও আবেশে যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

(শ্রীলঘুভাগবতে ধৃ° ১)

কল্পান্তর্গত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে ৯৯৯টি চতুর্যুগ সম্বন্ধে যুগাবতার-আবির্ভাবের ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু প্রতি কল্পের প্রায় মধ্যবর্ত্তী সময়—বৈবস্বত নামক সপ্তম-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ, উক্ত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে একমাত্র অসাধারণ লক্ষণান্বিত। এই বিশেষ চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতাযুগের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; যে-হেতু পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চতুর্যুগের ন্যায় 'শুক্ল' ও 'রক্ত' যুগাবতার কর্ত্তৃক উক্ত সত্য ও ত্রেতাযুগে যথাক্রমে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই চতুর্যুগের

কেবল দ্বাপর ও কলিযুগেরই বৈশিষ্ট্য আছে। কল্পান্তর্গত সহস্র দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যে কেবল বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-সংখ্যক চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলিযুগকেই অসাধারণ লক্ষণে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কারণ এই যুগ দুইটিতে যথাক্রমে 'শ্যাম' ও 'কৃষ্ণ' বর্ণ ও নাম বিশিষ্ট যুগাবতারের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণ' ও 'পীত' যুগাবতারের বিষয় শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে যুগাবতার সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—কেবল এই একটি অসাধারণ চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলি-বিশেষেই—প্রতিকল্পে একবার করিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। উক্ত অসাধারণ চতুর্যুগের অসাধারণ যুগাবতার সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে শ্রীগর্গাচার্য্য বলিয়াছেন;—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্ল রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।১৩)

এই অসাধারণ যুগাবতার বিষয়েই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

'শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি।
ইদানীং দ্বাপরে ত্রিহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সর্ব্ব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥' (১।৩।২৯-৩০)

এই অসাধারণ চতুর্যুগের যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৯ হইতে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকরভাজন কর্ত্তৃক সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে;—বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

'কৃষ্ণ' ও 'পীত' এই যে অসাধারণ যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন, ইঁহারা অবতার নহেন—সর্ব্বাবতার-অবতারী স্বয়ংভগবান্

শ্যামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণই উক্ত বিশেষ দ্বাপর যুগ অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় আবির্ভাব-বিশেষে তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভে 'পীত' অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌর-সুন্দররূপে প্রকট হইয়া থাকেন। সর্ব্বাংশী স্বয়ং-ভগবানের অবতরণ-কালে সেই সেই যুগে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য যুগাবতারের আর প্রয়োজন হয় না বলিয়া, সেই সেই যুগাবতার সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। 'স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব' অর্থাৎ স্বয়ংভগবানের অবতরণ-কালে কেবল যুগাবতারই নহেন,—বিলাস ও স্বাংশাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপই যে, তৎসহ মিলিত হইয়া থাকেন—এই শাস্ত্রনির্দ্দেশ, শ্রীচরিতামৃত-কার সহজ কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ;—

'পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥' (আদি ৪।৯-১১)

সুতরাং যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন তৎকালের 'শ্যাম'-বর্ণাখ্য যুগাবতার যেমন শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলিত থাকেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—তৎকালেও সেই কলিযুগের 'কৃষ্ণ'-বর্ণাখ্য যুগাবতার, স্বর্ণ-গৌর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে একীভূত হয়েন—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই কারণে কল্পের মধ্যে কেবল সেই দ্বাপর ও কলিযুগ-বিশেষে সাধারণ যুগাবতার কর্ত্তৃক সাধারণ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় না। এই অসাধারণ দ্বাপরযুগে পূর্ণতম শ্রীভগবান্—জীবের পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা 'প্রেমধর্ম্ম' জগতে প্রকট করেন এবং নিজ আবির্ভাব-বিশেষে তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভেই পুনরায় প্রকট হইয়া, সেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত 'প্রেমধর্ম্ম' ও তৎবীজ-শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, তদীয় লীলাকালে বিপুলভাবে বিতরণ পূর্ব্বক,

আবার সেই প্রেমধর্ম্মের বীজ, এই কলিযুগের ভাবী জীবগণের জন্য জগতে সঞ্চার করিয়া রাখেন;—যাহার প্রতিক্রিয়ায় গৌরলীলা অপ্রকটের কয়েক শতাব্দী পরেই, সূক্ষ্মাকারে সঞ্চারিত সেই প্রেমধর্ম্ম-বীজ জগতের উপর অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ শাখা পত্রাদি রূপে বিকশিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত ও সেই কলিযুগের অবশিষ্ট কাল—সত্যযুগ হইতেও শ্রেষ্ঠ এমন কোনও এক 'প্রেমযুগে' পরিণত করিয়া থাকে। প্রতি কল্পে অর্থাৎ ৪৩২,০০০০০০ কোটি বৎসরের মধ্যে (ব্রহ্মার রাত্রিকাল বা কল্পান্ত-প্রলয়কাল ধরিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমিত বর্ষের মধ্যে) জীবের পূর্ণতম স্বধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ভাবে প্রাপ্ত হইবার এরূপ পরিপূর্ণ সুযোগ, জগতের ইতিহাসে কেবল একবার সংঘটিত হয়,—এবং আমাদিগের পক্ষে বিশেষ আশার ও আনন্দের কথা এই যে—বর্ত্তমান যুগই সেই অসাধারণ কলিযুগ!

শস্য উৎপাদনের পক্ষে ভূমিকর্ষণাদি সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও, যেমন উহা শস্য উৎপাদন উদ্দেশ্যই বহন করিয়া তৎকার্য্যের সহায়ক হয়,—কিন্তু বীজবপনই শস্য উৎপাদনের সাক্ষাৎ কারণ, সেইরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের মৎস্য-কূর্ম্মাদি ও শুক্ল-রক্তাদি নিখিল অবতার সকল ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা প্রকাশ করেন,—ক্ষেত্র-নির্ম্মাণের ন্যায় সেই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি কার্য্য সকল, জগতে প্রেমশস্য উৎপাদনের সাক্ষাৎ কারণ না হইয়াও, পরম্পরায় উহা প্রেম-প্রবর্ত্তন-কার্য্যেরই সহায়ক হয়,—প্রেম-শস্য উৎপাদন-উদ্দেশ্যই বহন করিয়া থাকে; কিন্তু যে মুখ্য উদ্দেশ্য বহন করিয়া সকল অবতারের,—সকল লীলার প্রকাশ,—পৃথিবী ব্যাপী সেই প্রেম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকাল সমাগত হইলে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজের সহিত প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া প্রেম-লীলার প্রকাশ করেন। জগতে সাক্ষাৎ প্রেম-ধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্ ভিন্ন অপর কোনও অবতার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়েন না। তাই বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরের

শেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে প্রেম-লীলা ব্রজে প্রকাশ করেন, সেই প্রেমের বীজ পরবর্ত্তী কলিযুগ-বিশেষে বা 'প্রেমযুগে' বিতরণ ও রোপণ করিবার ইচ্ছায়, উহা তখন জগতের উপর সঞ্চিত রাখিয়া, তিনি কিয়ৎকালের জন্য সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েন। অতঃপর জীবজগতের পক্ষে কল্পের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম শুভকাল—সেই পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা প্রেমভক্তি-দানের প্রকৃষ্ট সময় সমাগত হইলে, তৎকার্য্যের যাহা একমাত্র অনুকূলভাব,—সেই মহাভাব-স্বরূপিণী নিজ কান্তা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা আবৃত—অতএব পূর্ণতম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ব্ব-সঞ্চিত সেই প্রেমবীজ লইয়া, এই কলিযুগের প্রথম-সন্ধ্যাংশে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীনবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হয়েন। শাস্ত্রের সেই নিগূঢ়-রহস্য শ্রীচরিতামৃতকার নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

'বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ (১।৩।৭, ৮)

* * *

যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দানে।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থানে॥

(১।৩।১১, ১২)

* * *

আপনে করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপনে ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়॥ (আদি ৩।১৯-২২)

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌর-লীলা অপ্রকট হইলেও, যে প্রেমবীজ সেই লীলা কালে জগতে সঞ্চার করা হইয়াছে, তাহারই অব্যর্থ প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক 'প্রেমধর্ম্মের' বিরাট প্লাবনে পরিপ্লাবিত করিবে।

ভবিষ্যতের কোটি জগাই-মাধাই যাহা হইতে সেই প্রেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে,—এক জগাই-মাধাই উদ্ধারের ভিতর তাহার সূচনা করা রহিয়াছে। যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে অদূর-ভবিষ্যতে—তাহার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখার ছায়ায় কোটি কোটি সন্তপ্ত জগাই-মাধাইকে সুশীতল করিবে,—এক জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলায় ভবিষ্যতের সেই বিরাট্ কার্য্যেরই কারণ বা বীজ সঞ্চারিত রহিয়াছে; নচেৎ তৎকালীন সমষ্টির মহা অভিযানে ব্যষ্টিগতভাবে জীবোদ্ধার-প্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়। অদূর ভবিষ্যতে মহদপরাধী কোটি গোপাল-চাপাল যে প্রণালীতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ আত্মাকে পূর্ণ করিয়া লইবে,—এক গোপাল-চাপাল-উদ্ধার লীলায় তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটীশ্বরগণ ইন্দ্রসম-ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া, শ্রীভগবানের মহা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে যে ভাবে ছুটিয়া চলিবে,—প্রকট লীলায় সে কার্য্যের কারণ বা বীজ, এক রঘুনাথের বিষয়-ত্যাগের মধ্যে সঞ্চার করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর পক্ষে বিষয়ত্যাগের গৌরব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভবিষ্যতের উচ্চপদ

গর্ব্বিত—প্রতিষ্ঠামদ-দর্পিত কোটি কোটি জন, যে বিবেক ও বৈরাগ্যের অমোঘ স্পর্শে, প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাদিকে কাকবিষ্ঠাদির ন্যায় বোধ করিয়া, ভগবচ্চরণ-সেবাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিবে,—প্রকট-লীলায় এক রূপ-সনাতনের গৌড়রাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সেই কার্য্যের কারণ বা বীজ বপন করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী তাঁহারা,—এ ত্যাগ তাঁহাদের জন্য নহে। অদূর ভবিষ্যতের শত শত রাজ্যেশ্বর,—রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিয়ত সেবিত হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে যেরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবকগণের চরণ সেবাকেই অধিকতর সুখকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহার বীজ বা কারণ এক প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার লীলায় সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটি জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া যে ভাবে ভক্তিদেবীর চরণতলে লুটাইয়া দিবে,—প্রকট-লীলায় এক প্রবোধানন্দ-সার্ব্বভৌমের পরিবর্ত্তনে তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহারা, তাঁহাদের জ্ঞানের অহঙ্কার কোন দিনই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটি কোটি অবনত—অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছাদি জাতি যে নাম-যজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গণে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, পরম শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদি দেবতারও বন্দনীয় হইবে,—শ্রীগৌরলীলায় এক হরিদাসের হরিনাম-সাধনে সেই বিরাট কার্য্যের কারণ বা বীজ সুরক্ষিত হইয়াছে; নচেৎ ব্রহ্ম-হরিদাসের যবনত্বপ্রাপ্তি,—ইহা সুবর্ণের লৌহত্বপ্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব। এইরূপ শ্রীগৌরলীলার অনেক কার্য্যই সেই সময়ের জন্য আবশ্যকীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র; কিন্তু ঐ সকল লীলার প্রয়োজনীয়তা—যথার্থ সার্থকতা,—শ্রীগৌর-আবির্ভাব-গৌরবে গৌরবিত এই কলির ভাবী জীবগণের মহা-ভাগ্যোদয়ের জন্য! সত্যযুগের জীবগণের পক্ষেও যাহা দুর্লভ,—কল্পের মধ্যে আর কোন যুগে,—কোনও জীবের পক্ষে যাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই,—বর্ত্তমান কলিযুগের ভাবী জীবগণ সেই অবিচিন্ত্য-সৌভাগ্যের বীজ বা কারণ লাভ করিয়া ধন্য! ভব-বিরিঞ্চি

বাঞ্ছিত সেই ব্রজরমাগণের অনুগত অনাবিল প্রেম,—যাঁহার আবির্ভাব বশতঃ এই কলিহত জীবের ভাগ্যেও প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছে—সেই প্রেমদাতা-শিরোমণি—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সহিত বর্ত্তমান জগতের যে কি মহতী আশা ও বিপুল আনন্দের বার্ত্তা বিজড়িত রহিয়াছে,—তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সাধারণতঃ দ্বাপরান্ত যুগই 'কুলিযুগ' নামে কথিত হইয়া থাকে বলিয়া বর্ত্তমান যুগ কলিযুগ নামেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অসাধারণ যুগে সমুন্নত উজ্জ্বল-প্রেমধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে একযোগে বিশ্বের প্রায় সকল মানব মানবীকে পরিপূর্ণতা বা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ত্তমান যুগ, কলিযুগের পরিবর্ত্তে 'প্রেমযুগ' নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। কালস্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'কলি'। দ্বাপরযুগের শেষদিনের পর হইতে সত্যযুগের প্রথম দিবসারম্ভের পূর্ব্বাবধি কাল, কলির কর্ত্তৃত্ব সীমা বলিয়া, এই সময়কে 'কলিকাল' বলা হয়। কলি সর্ব্বদোষনিধি ও সাক্ষাৎ পাপ স্বরূপ। কলির প্রভাব বশতঃই সাধারণতঃ মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও পারলৌকিক বিষয়ে অবিশ্বাসী বা এক কথায় ভগবদ্-বহির্মুখ হইয়া থাকে। কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, শেষ কলিতে নাস্তিকতা বা অধর্ম্ম পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া থাকে—ইহাই সর্ব্বসাধারণ কলিযুগের নিয়ম। সাধারণ কলিযুগের শেষ কলির যে সকল প্রভাব বা লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৪,৩২০০০ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ হাজার বৎসর মাত্র অতীত না হইতেই, পূর্ণকলির প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কলিযুগের এই এক বৈশিষ্ট্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কলি বিনির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইবার নিদর্শন। এক বিরাট প্রেমযুগের অভ্যুদয় সূচনা

জানাইয়া দিয়া, কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে—অপর কলিযুগ হইতে বর্ত্তমান কলিযুগের এই অসাধারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয়।

অভিধানে যেমন চতুর্থ যুগকে 'কলিযুগ' নামে নিরূপিত করা হইয়াছে, তেমনি আবার দেখা যায়, 'কলি' শব্দের যুদ্ধ, বিগ্রহ, কলহ প্রভৃতি অর্থ। শাস্ত্র-বর্ণিত পূর্ণ কলির লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবার যদি কাহারও অবসর না ঘটে, অন্ততঃ কলি-শব্দার্থের সহিত জগতের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেও কলিভাবের পরিপূর্ণতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। বিদ্বেষ ও কলহের দীপ্ত বহ্নি কেবল ভারতে নহে,—জগতের সর্ব্বত্রই প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শাসক ও শাসিতে কলহ, ধনিক ও শ্রমিকে কলহ, প্রাচীন ও নবীনে কলহ,—জাতিতে জাতিতে কলহ,—বর্ণে বর্ণে কলহ,—স্ত্রী পুরুষে কলহ,—শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সমাজে, সম্প্রদায়ে কলহ, কলহ—কলহ—সর্ব্বত্রই এই কলহানল—এই বিদ্বেষাগ্নি বিপুল আকারে জ্বলিয়া উঠিতেছে! এক স্থানের কলহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে যাইয়া উহাই আবার শতধায়—শত ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এরূপ হিংসা—বিদ্বেষ, এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহভাব—একযোগে অভিব্যক্ত হওয়া, জগতের ইতিহাসে একান্তই বিরল। সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্ততঃ এই 'কলি' শব্দার্থের 'কলহ' লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলেও বর্ত্তমান সময়কে কলির পূর্ণাবস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; অতএব এই কলিযুগের প্রারম্ভেই, অন্তিম কলি-প্রভাব যাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে,—গৌরলীলা-প্রভাবই কলির এই মরণ-লক্ষণের মূল কারণ—এ-কথা জগৎ ক্রমশঃই বুঝিতে পারিবে।

এই কলিযুগকে 'প্রেমযুগে' পরিণত করিতে, প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি স্বয়ং আসিয়া এই জগতের উপর প্রেমবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। যেমন শস্যাদির বীজ বপনের পর, অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে কিছু দিন তাহাকে মৃত্তিকাগর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়,

গৌরলীলা-সঞ্চারিত প্রেমধর্ম্ম-বীজেরও এখনও পর্য্যন্ত প্রায় সেইরূপ প্রথমাবস্থা,—ক্বচিৎ কোথাও অঙ্কুর বা দ্বিতীয়াবস্থার বিকাশ হইতেছে মাত্র। কারণ বা বীজরূপে সঞ্চারিত যে প্রেমতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে 'শান্তিপুর ডুব ডুব—নদে ভেসে যায়'—তাহারই কার্য্য বা ব্যাপ্তিরূপে অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রেমধর্ম্মের এক মহাপ্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষকে ডুবাইয়া, সারা জগৎ ভাসাইয়া দিবে! যে কলিযুগে বিশ্বব্যাপী প্রেমধর্ম্মের বীজ বা কারণের সঞ্চার হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেম-ক্ষেত্রের উপর কলির অবস্থিতি একান্তই অসম্ভব। তাই অন্যান্য কলিযুগের শেষ লক্ষণ, শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগের প্রারম্ভেই প্রকাশ হইতে দেখিয়া, কলির দ্রুত নিষ্ক্রমণ ও প্রেমযুগের আগমন বা অভ্যুদয় সূচনা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন শেষ একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রথম কলিতেই পূর্ণ কলি-লক্ষণের প্রকাশ—ইহা কলি-প্রভাব নির্ব্বাপিত হইবার সূচনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নিজ যুগকে করতলভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কলি 'মরণ কামড়ের' মত, অবসান-প্রাপ্তির পূর্ব্বে একবার তাহার পূর্ণ ও শেষ প্রভাব প্রদর্শন করাইবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছে।

চিদাত্মবাদের পবিত্র বেদীর উপর দেহাত্মবাদ বা ভোগবাদকে প্রতিষ্ঠিত করাই কলির শ্রেষ্ঠতম প্রভাব; যাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল —ধর্ম্মে অনাস্থা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এই দুই অনর্থ-কীটের অবিরত দংশনে জীবের অন্তরস্থিত চিদ্বৃত্তিরূপ কোমল পল্লব সকল জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তৎস্থলে জড়ভাবের এক বিকট শুষ্কতা জাগিয়া উঠে—যাহার অন্য নাম নাস্তিকতা। বর্ত্তমান জগৎ, নির্গমনোন্মুখ কলির প্রভাবকৃত জড়বাদ বা নাস্তিকতার এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রকাশ্যভাবেই অস্বীকার করিবার জন্য সারা বিশ্ব যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! প্রকাশ্যে আস্তিকতা পোষণ করিয়াও আবার অন্তরে অনেকেই

জড়বাদী—নাস্তিক। জীবের এই জড়তা, কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণে যতই দ্রুততর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে,—জড়ের উপাসনা বা কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল লালসা, সন্নিপাত রোগীর পিপাসার মত ততই দুর্দ্দমনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। বহির্ম্মুখতার খরস্রোতের ভিতর এখন যেন একখানি জীর্ণ কঙ্কালের মতই ধর্ম্ম ভাসিয়া চলিয়াছেন—ইহাই লোকের মনে হইতেছে।

ধর্ম্মই বিশ্বকে ধারণ করেন। ধর্ম্মের বন্ধন যতই শিথিল হইয়া পড়ে, সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য বা অস্থিরতা জগতে ততই জাগিয়া উঠে। আত্ম-ধর্ম্মের অবমাননা হইতেই বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী অসমতা ও অশান্তির উদ্ভব। সকল বৈষম্য—সকল অস্থিরতা—সকল হিংসা, বিদ্বেষ, কলহের একমাত্র কারণ—আধ্যাত্মিক বা আত্মধর্ম্মের শৈথিল্য। কেবল জীব-জগতেই নহে, আধিভৌতিক ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হওয়ায় জড়জগতেও এক অসাধারণ—এক অশ্রুতপূর্ব্ব বৈষম্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। অস্বাভাবিক ঝটিকা, ঘূর্ণিবাত্যা, জলপ্লাবন, ভূকম্পন, আগ্নেয়-গিরির অনলোদ্গার, দুর্ভিক্ষ, মহামরক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বজ্রাঘাত, তুষারপাত প্রভৃতির সংবাদ প্রায় প্রত্যহই বর্দ্ধিতাকারে পাওয়া যাইতেছে। ইহারও একমাত্র কারণ,—সেই ধারণ-রজ্জুর বা ধর্ম্মের শিথিলতা।

একযোগে সমস্ত জগদ্ব্যাপী এই যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা বা অশান্তভাব—এই অসাধারণ লক্ষণ সকলই জানাইয়া দিতেছে,—একযোগে সমগ্র জগদ্ব্যাপী কোনও এক বিরাট সাম্যধর্ম্ম বা শান্তভাব আগতপ্রায়! শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের মূল-নীতিই সার্ব্বজনীন সাম্যধর্ম্ম বা পরম শান্তির কারণস্বরূপ হইয়া, এই নির্গতপ্রায় কলির অবসান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উদিত হইবেন। গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। সুস্থির হইবার জন্য—স্থিরতা প্রাপ্তি না পাওয়া পর্য্যন্তই যে-কোন পদার্থ অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বর্ত্তমান জগতের

এই অস্বাভাবিক অস্থিরতা যে, কোনও এক পরম সুস্থিরতাকে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বরূপ বা সূচনা মাত্র, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যে শান্তিকে—যে স্থিরতাকে—যে সমতার মহামিলনকে জগৎ সুদীর্ঘকাল হইতে অন্বেষণ করিতেছে,—সেই প্রেমধর্ম্মের অভ্যুদয় যে প্রাদেশিক বা আংশিক না হইয়া বিশ্বব্যাপী আকারেই উদিত হইবে—এই বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঝটিকা-বিধ্বস্ত অমানিশার অবসানের পর যেমন বালারুণ-চুম্বিত স্নিগ্ধ উষার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এই কলিকৃত জড়বাদ বা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার অবসানেই, ভক্তিবাদ—প্রেমবাদের স্নিগ্ধ ও শান্ত উষার আলোকে আবার জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। হিরণ্যকশিপুর বৃদ্ধি হইলেই যেমন প্রহ্লাদের বিকাশ হয়, তেমনি কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃষ্ট আনন্দের বিকাশ বা প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইয়া থাকে ;—জগতের সেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন—সেদিন উদয় হইবার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই।

অচিন্ত্য গৌরলীলা-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া, বর্ত্তমান জগৎ কল্পের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠতম দুর্দ্দিন ও শ্রেষ্ঠতম সুদিনের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্গমনোন্মুখ কলির পূর্ণ প্রভাবের পশ্চাতে, জগন্মঙ্গল প্রেমযুগের অভ্যুদয়—ইহা জগতের ভাবী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় ঘটনা। প্রেমাবতারী—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলার ব্যাপ্তিক্রিয়ায়, তাঁহার অপ্রকটকালেও বর্ত্তমান জগৎ সর্ব্ববিষয়েই এই পরম বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতেছে। জীবের পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন, সেই ব্যাপ্তিক্রিয়ার পরিপূর্ণ ফল বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষানীতি—সকল ক্ষেত্রেই সেই একই প্রভাব গৌণভাবে কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে প্রেমযুগের আবির্ভাব-চিহ্নের

পরিবর্ত্তে কলির প্রভাবই অধিক ব্যাপক ভাবে দেখা যাইলেও, তাহার জন্য নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই; যে-হেতু সেই জগন্মঙ্গল প্রেমযুগের আগমন-সূচনাও কলি-কৃত আস্ফালনের অন্তরালের মাঝে মাঝে অল্পাকারে দেখা যাইতেছে। নব-বসন্তের প্রারম্ভেই দুই একটি আম্রমুকুল ইতস্ততঃ দেখা যাইলেও, তাহা হইতেই যেমন অনতিবিলম্বে দেশ জুড়িয়া আম্রমুকুলের বিকাশ হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়, তেমনি কলিপ্রভাব-বিক্ষোভিত এই জগতের ভিতর আপাততঃ প্রেমযুগের আবির্ভাব-লক্ষণ যতই অল্পাকারে লক্ষিত হউক না কেন,—বুঝিতে হইবে অদূর ভবিষ্যতে ইহাই বিপুল ও ব্যাপকভাবে সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। মথিত সমুদ্র হইতেই যেমন অমৃতের উদ্ভব হয়, তেমনি বর্ত্তমানে এই নানাভাবে মথিত—আলোড়িত—অস্থির জগতের ভিতর হইতেই—এই বৈষম্যের প্রবল সংঘর্ষণ হইতেই যে প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইবে,—শুধু ভারতের নহে, সমস্ত পৃথিবীর এই বৈষম্য—এই চাঞ্চল্য—এই অস্থিরতা,—সকল বিষয়ে এই দ্রুত ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সে সংবাদ স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।

সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হইবার পূর্ব্বে যেমন দুই চার ঝলক্ হলাহলও উঠিয়া পড়ে, বিনিষ্ক্রান্তপ্রায় কলি-কৃত অনর্থ সকল সেইরূপ কালকূট সদৃশই জগৎবাসীর পক্ষে আপাততঃ ভয়াবহ হইলেও, ইহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। সমুদ্রমন্থনের মূলে কূর্ম্মদেবরূপে অবস্থান করিয়া যিনি নীলকণ্ঠের দ্বারা সেই হলাহলের প্রতিকার করাইয়াছিলেন, সেইরূপ মৎস্য-কূর্ম্মাদি নিখিল অবতারের যিনি অংশী বা অবতারী,—সেই পূর্ণতম ভগবান্ যখন স্বয়ংই এই কলি-মথনের মূলে উহার কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন জগতের উপর কলি-কৃত বৈষম্য-বিষ বমিত হইলেও, সেই উদ্গীরিত বিষের প্রতিকার তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আভাসেই সম্ভব হইয়া যাইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার যেমন মথিত সমুদ্রের

ঘাত প্রতিঘাত, উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, কমলা ও কৌস্তুভের অভ্যুদয়েই অবসান-প্রাপ্ত হয় নাই—যে পর্য্যন্ত অমৃতের অভ্যুদয় না হইয়াছিল ;—সেইরূপ জগতের অপরাপর মঙ্গল সকল এই জগদ্ব্যাপী আলোড়নের ফলে একে একে যাহাই প্রসূত হউক,—যে পর্য্যন্ত না প্রেমধর্ম্মরূপ অমৃত-কলস মাথায় লইয়া 'প্রেমযুগ' কলিঘোর পাথার ভেদ করিয়া, তরুণ তপনের মত সমুদিত না হয়েন—জগদ্ব্যাপী এই অস্থিরতার সম্পূর্ণ বিরাম সে পর্য্যন্ত অসম্ভব।

উষার তরুণ আলোকের মত যে প্রেমধর্ম্ম অনতিবিলম্বে বিশ্বে ফুটিয়া উঠিবে, গলিত—জীর্ণ কদলীবৃক্ষমূল হইতে যেমন শ্যামল—সতেজ তরুণ তরু প্রসূত হয়, সেইরূপ পুরাতনের অবশেষ হইতেই তাহার অভ্যুদয় হইবে। সনাতনধর্ম্ম—নিত্যবস্তু ; সুতরাং কোনও অবস্থাতেই তাহার বিলোপ অসম্ভব। সমাজ দেহের স্বচ্ছতার মধ্যে সমুজ্জ্বল ও অস্বচ্ছতার মধ্যে অনুজ্জ্বল রূপে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। যে কোনও অবস্থার মধ্যেই হউক, তাহার অস্তিত্ব লোপ কখনও হয় নাই বা হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের যে কঙ্কালমূর্ত্তি 'ভোগবাদ' প্রমত্ত বিমলিন জগতের সম্মুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহারই দৈন্যতা—মলিনতা—জীর্ণতার ভস্মাবশেষ হইতে ধীরে ধীরে আবার যে সার্ব্বজনীন ও তরুণ প্রেমধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, তাহা আস্তিক্যভাব-বর্জ্জিত—অহমিকা-প্রমত্ত ও ঐহিক-সুখাশা-সন্তপ্ত—নীরস সাম্যবাদ নহে,—তাহা প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত পরিপূর্ণ ভগবৎ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত—বেদগুহ্য—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত সরস ও বিশুদ্ধ সাম্যবাদ।

প্রেমযুগ অভ্যুদয়ের অপর সুস্পষ্ট শুভ সূচনা এই যে, জড়বাদের বিষক্রিয়া হইতেই 'হিরণ্যকশিপু ভাব' বা কামিনী-কাঞ্চন-মূলক-সভ্যতা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ; কলি-প্রভাবকৃত জড়তার মোহপাশে মানবের চিদ্‌ভাব যখন আচ্ছন্নপ্রায়,—কামিনী-কাঞ্চনের সাধনা ব্যতীত অপর

পুরুষার্থের সন্ধান পর্য্যন্ত যখন বিলুপ্তপ্রায়,—জগতে ঠিক সেই ঘোর অশুভ-মুহূর্ত্তে—কলিপ্রভাবের সেই পরিপূর্ণতার ভিতর হইতে—যেন কাহার মন্ত্রপূত ফুৎকারের স্পর্শ পাইয়া, 'ভোগবাদ' ভুজঙ্গের দুইটি বিষদন্ত স্বরূপ সেই 'কামিনী' ও 'কাঞ্চন' রূপ অনর্থদ্বয়, মানবাত্মাকে আপনিই পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যেমন শাস্ত্রকার বলিয়া থাকেন—'ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্তজ্যতে হ্যসৌ' অর্থাৎ যেমন যোগী কর্ম্মকে ত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যথাকাল উপস্থিত হইলে যোগীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যে কামিনী-কাঞ্চনাবলম্বিত জড়বাদমূলক সভ্যতা—মানবের চিদ্‌ভাবকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল,—প্রেমধর্ম্মের—মানবের শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্মের অভ্যুদয়কাল সমাগতপ্রায় জানিয়া, তাহা যেন আপনিই অপসারিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

জগতে নারীগণ মোহনিদ্রার অবসাদ হইতে জাগরিত হইয়া উঠিতেছেন। কলিপ্রভাব বিমুগ্ধ 'কামিনী' ভাব পরিহার পূর্ব্বক, জগজ্জননী—মহাশক্তির প্রতীক তাঁহারা—তাঁহাদের স্বরূপভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য—বিলাসের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া, শক্তিরূপে আবার তাঁহারা জাগিয়া উঠিতেছেন। যদিও তাঁহাদের এই পরিবর্ত্তনের গতি, এখনও সেই অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় নাই, তথাপি এই গতিই ক্রমশঃ সেই স্থিতির দিকে,—সেই কেন্দ্রাভিমুখেই যে পরিচালিত হইবে, বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী নারী-জাগরণের ভিতর তাহারই সূচনা নিহিত রহিয়াছে। 'কামিনী-ভাবের' মোহজাল-বিমুক্ত নারীগণের মহাশক্তিরূপে জাগরণ,—ইহা কেবল স্বাধীনতার মুক্তসমীরণ সেবনেই অবসানপ্রাপ্ত হইবে না; নারীশক্তি যখন শক্তিমৎ শ্রীভগবানের সেবিকারূপে—আরাধিকারূপে পরিণত হইবেন,—তখনই হইবে এই নারী-জাগরণের পূর্ণ সার্থকতা। 'ব্রজ-মাধুরীর' মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, কেবল ভারতের নহে—জগতের নারীগণ যে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম-বিটপীমূলে বিশ্রাম

লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, বর্ত্তমানে সেই লক্ষণ অল্পাকারে লক্ষিত হইলেও, তাহারই বীজ বা কারণ যে, এই নারী-জাগরণের মূলে নিহিত রহিয়াছে, সে-কথা সুস্পষ্টরূপে আজ না হইলেও ক্রমশঃই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

কাঞ্চনে অত্যাসক্তি বা কাঞ্চনের উপাসনাই ভগবৎ-বৈমুখ্য-সভ্যতা-ভুজঙ্গের অপর বিষদন্ত। এই কাঞ্চনাত্মবোধরূপ অনর্থও যেন কাহার কুহকমন্ত্রে মানবের দৃঢ়মুষ্টি হইতে আপনি অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। জড়ের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে না পারিলে মানবাত্মাকে বিমুক্ত করা যায় না; তাই বিশ্ব-মানবাত্মার মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী এই অর্থ সমস্যার উদ্ভাবনা,—তাই কাঞ্চন-মত্ততার উপর এই প্রচণ্ড কশাঘাত। আজ অর্থের মূল্য যেমন কমিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে রাজার রাজ্যপাট হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের পাতান সংসার পর্য্যন্ত সমস্তই যে, নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক,—জাগতিক বিষয়-সম্পদের এই অনিত্যতার চিত্র, সমস্ত জগতে আজ যেমন ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, এরূপ বোধ হয় পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

'প্রেমযুগের' সুস্পষ্ট আবির্ভাবকাল সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই আর্থিক ও বৈষয়িক বিপ্লবের প্রকৃষ্ট কারণ নির্ণয় অপর কোন উপায়েই যে সম্ভব হইবার নহে,—সে কথা আরও কিছুদিন অতীত না হইলে জগৎ বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে ঈশ্বর-বর্জ্জিত সভ্যতা-সর্পের দুইটি বিষদন্ত উৎপাটিত হইবার আয়োজনের অন্তরতম প্রদেশে, প্রেমযুগ অভ্যুদয়ের কোনও পূর্ব্বাভাস আছে কি না, চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ।

'পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥'

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, অন্ত্য ৪প°)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আজ সর্ব্ব বিষয়ে পৃথিবীর এই দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; বিশ্বব্যাপী এক বিরাট 'প্রেমযুগের' আবির্ভাব এই পরিবর্ত্তনের মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য।

জগতের এই আগতপ্রায় মহা-সৌভাগ্যের দিন, এক অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর দুর্দ্দিনের অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছে। যদিও কলিপ্রভাব অনতিবিলম্বেই অস্তমিত হইবে, কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে কলির শেষ আক্রমণ জগতের উপর এতই ভীষণাকার ধারণ করিবে, যাহা কল্পনাতীত! পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত অনলের উপর অন্তিম লম্ফপ্রদান করে, সেইরূপ একপক্ষে মরণোন্মুখ কলিপ্রভাবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ও শেষ আক্রমণ, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপর নিপতিত হইবে; সুতরাং এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকেও অগ্নি যেমন মরণোন্মুখ পতঙ্গের আস্ফালন অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় কলির পদাঘাত স্থিরভাবে সহ্য করিতে হইবে। অপরপক্ষে সাধুদিগকেও এই সময়ে এক ভীষণ অনল পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যাহার ফলে অকৃত্রিম সাধুত্ব উজ্জ্বল হইবে এবং কৃত্রিম যাহা কিছু ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কলি-কালাগ্নির শিখা তাঁহাদের বুকেই অধিক পরিমাণে আসিয়া স্পর্শ করিবে। এই সময়ে দিন দিন অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন ও অবমানাদি ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগের শেষ পরিশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে। যাহারা যত ধীর স্থির ও প্রশান্তভাবে সে সকল 'শুদ্ধি' অবনত মস্তকে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারাই হইবেন শ্রীভগবানের যথার্থ প্রিয়পাত্র। বিশ্বব্যাপী এই প্রেম-যুগের অভ্যুদয়ে তাঁহারাই হইবেন প্রেম-প্রচারের অগ্রদূত। শ্রীভগবানের মহা গৌরবান্বিত বিজয়পতাকা বহন করিবার এই মহাভাগ্য অর্জ্জন করিতে হইলে, এখন হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। দুর্দ্দিনের অন্ধকার যতই

ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ ততই অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া লইতে হইবে,—ধর্ম্ম ও ভগবানের জয়গান নির্ভয়ে ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হইবে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিরোধী আন্দোলনের যে বিষাক্ত বাষ্প ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, অচিরকাল মধ্যে তাহা ঘনীভূত হইয়া উঠিলে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া এখন হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যদি কাহারও সহযোগিতা না-ই পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাসী সৈনিকের মত একা একাই এই কলির মরণ ও নবযুগের জাগরণ যুদ্ধে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান্ হইয়া,—প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্তও আহুতি দিবার জন্য এখন হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। যথার্থ ভগবৎ বিশ্বাসীর পবিত্র শোণিত যখন নির্য্যাতকের হাত গড়াইয়া বসুন্ধরার উপর পতিত হইবে, তখনই সেই শোণিতাহুতি হইতে কোটি কোটি শুদ্ধ ভক্তের বিকাশ ও কলি প্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ যুগপৎ সংঘটিত হইবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাঁহারা—তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী। শ্রীগৌর-লীলায় ঠাকুর ব্রহ্ম-হরিদাসের বাইশ-বাজারের বেত্রাঘাতের মধ্যে যাহার কারণ বা বীজ সঞ্চারিত ছিল,—তাহারই কার্য্য ব্যাপকরূপে আরম্ভ হইবার দিন আগতপ্রায়।

কলিপ্রভাব-বিমুগ্ধ উদ্ধত জনতার অত্যাচার যখন মুখ্যভাবে সাধু, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে স্পর্শ করিবে, কলিপ্রভাব আশু বিনষ্ট হইবার তখনই ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যে অপরাধ দৃষ্টে সর্ব্বসহ ভগবানেরও অসহ্য হয়, তিনি স্বয়ংই তাহা প্রকাশ করিয়া জগতের জীবগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন ;—

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥

(শ্রীভাগবতে ৭।৪।২৭)

অর্থাৎ যখন দেবতায়, বেদে, গো-সকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুগণে, ধর্ম্মে ও আমার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ-বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তাহার সদ্য-বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

সমষ্টিগতভাবে উক্ত ঘোরতর অপরাধের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, জগতের ঈশ্বর-বহির্ম্মুখতা-ব্যাধি যদি উপশম প্রাপ্ত হইত, তবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের ও মঙ্গলের বিষয় আর কিছুই কল্পনা করা যায় না; কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্দ্দৈব বশতঃ যদি তাহা একান্তই সম্ভব না হয়, তবে জগদ্ব্যাপী সেই মহারোগের উপযুক্ত চিকিৎসাস্বরূপ অনতি-বিলম্বে এমন এক অভূতপূর্ব্ব প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ সমস্ত জগতের উপর সমারব্ধ হইবে, যাহার ফলে জড়বাদের সকল অহমিকা—সকল ঔদ্ধত্য—সকল উচ্ছৃঙ্খলতা একেবারে প্রশমিত করিয়া দিবে—তাহার আয়োজনও পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের ভিতর সঙ্গোপনে চলিতেছে; আগামী যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে জগতের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই আশঙ্কান্বিত।*

---

* এই গ্রন্থ ১৩৪০ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়; সুতরাং তৎকালের ২৩ বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতীত হইয়াছে। যদি আঘাতের পর আঘাত খাইয়া আমরা আত্ম-সম্বিদ্ লাভ করিতে পারিতাম,—জড়বাদের মরীচিকাময় পথ পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা আত্মধর্ম্মের পথে—পরমেশ্বরে বিমল বিশ্বাস-ভক্তির পথে পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে প্রকৃষ্ট শান্তির হাওয়া আবার প্রবাহিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই! কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বাণোন্মুখ কলিপ্রভাব-কৃত জড়বাদ বা ভোগবাদের বিষবাষ্প দ্বারা বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ অধিকতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায়, সহজে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা ক্ষীণতর হইয়াই আসিতেছে। এই জন্যই আশঙ্কা হয়, তৃতীয় আহুতির অর্পণে যজ্ঞ সমাপনের ন্যায়, কলিপ্রভাব নির্ব্বাপিত হইবার শেষ আহুতি স্বরূপ কোনও এক প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় মহাযুদ্ধ, বর্ত্তমান জগতের দুর্ভাগ্যাকাশে অপেক্ষমান রহিয়াছে। যাহার অন্তে হতাবশিষ্ট জগতের প্রকৃষ্ট আবর্ত্তন আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থাকে 'প্রগতি' নামে যতই আমরা জয়ধ্বনি করি না কেন, ইহা যে দ্রুততর দুর্গতির দিকেই—অশান্তি ও ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ, অপরের কথা নহে,—আমাদের স্বাধীন ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, মহামান্য শ্রীযুক্ত নেহেরুজীর স্বীকারোক্তিরই সারাংশের অনুবাদ, সংবাদ পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

কলিকৃত জগতের উত্তাপ যে ভাবেই হউক প্রশমিত হইলেই, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান যুগের অবশিষ্ট কাল সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে বিরাট সাম্যধর্ম্ম—মহামিলনের যে বিরাট উৎসব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিবে,—তাহাই পূর্ণতম ভগবান্—কলিযুগ পাবনাবতার—প্রেমদাতা-শিরোমণি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'প্রেমধর্ম্ম' বা তাহারই মূলনীতি ;—তাহাই পূর্ণ স্বরূপপ্রাপ্ত জীবের পূর্ণ স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরেচ্ছায় যথাকালে নিখিল জাতিসঙ্ঘের সভাস্থলে ভারত সমান আসন প্রাপ্ত হইলেও,—কেবল এই ধর্ম্ম গৌরবের জন্য, নিখিল জাতিসঙ্ঘ একদিন স্বেচ্ছায়—সানন্দে ভারতবর্ষকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিবেন। †

'প্রধান মন্ত্রী বলেন, আমাদের এই যুগ হইল সঙ্কটের যুগ। একটির পর আর একটি সঙ্কট দেখা দিতেছে। কোন সময়ে যদি কিছুটা শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়, সে শান্তিও একেবারে উপদ্রব বিহীন শান্তি নয়। তখনও যুদ্ধের ও সমরায়োজনের আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত থাকে। নিপীড়িত মানব সমাজ প্রকৃত শান্তির জন্য আজ উদ্‌গ্রীব। কিন্তু গ্রহের ফেরে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইতে তাহাকে ক্রমেই দূরে —আরও দূরে সরাইয়া দিতেছে। গ্রহের কোনও ভাষণ ফেরে পড়িয়া মানুষ সর্ব্বদাই একটানা একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে।'

'আজ আমাদের সম্মুখে যে অসংখ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যত্বের সঙ্কটই হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা বড় সঙ্কট। এই মনুষ্যত্বের সঙ্কটের একটা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের অন্যান্য সঙ্কটের সমাধান করা কঠিন হইবে।' (দৈনিক বসুমতী ২৩শে চৈত্র, ১৩৫৪ সাল।)

তিনি যাহাকে 'গ্রহের ফের' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাকেই 'কলির প্রভাব' বলিয়াছি। তিনি 'মনুষ্যত্বের সঙ্কট' বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় ভাষায় আমরা তাহাকেই 'আত্মবোধের অভাব' বা 'আত্মধর্ম্মের অবমাননা' বলিয়াছি,—এইমাত্র প্রভেদ।

† স্বরাজ লাভের অনেক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিখিল জাতি সঙ্ঘের সভায় ভারতের সমান আসন প্রাপ্তি, এই প্রথম বাণীটি সার্থক হইয়াছে। দ্বিতীয় বাণীটি সার্থকতা লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হউক ॥ * ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্য ও মনীষিগণের অভিমত

[১]

প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহোদয়; কলিকাতা;—

* * * 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' গ্রন্থাকারে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। * * * তোমার ভাষার সরলতা, বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। পাইয়া অপরিমিত প্রীতিলাভ করিয়াছি। * * শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা,—তাঁহার কৃপায় তুমি সুখময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর এবং এইরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষায় সিদ্ধান্তগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া জগতের উপকার করিতে থাক। (৫।১১।১৩১০)

[২]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়;—

শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। গোস্বামি মহাশয় পরমভাগবত; শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বহু অধিবেশনে প্রেম-ভক্তি বিষয়ে তাঁহার আবেগময়ী সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমি শ্রুতিযুগল ও অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। তিনি যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রেম-ভক্তির স্বরূপ পরিচায়ক এমন সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার প্রকাশদ্বারা বঙ্গের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার উপর আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সমধিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে সরল ও মধুর ভাষায় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তি তত্ত্ব, জীবস্বরূপ, শ্রীভগবান্, জীব ও পরমাত্মার

সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় প্রভৃতি গৌড়ীয় ভক্তগণের অত্যাবশ্যক অনুশীলনীয় বিষয়গুলিকে তিনি এমনই সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি বঙ্গভাষা-জননীর রত্ন-ভাণ্ডারে আর একখানি মহার্ঘ রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। আশা করি বাঙ্গালার সারসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রচারিত প্রেম-ভক্তির তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সহৃদয় বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট এই গ্রন্থখানি প্রচুরভাবে পঠিত ও সমাদৃত হইবে। (১৮।১১।১৩৪০)

[৩]

প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়; কলিকাতা;—

* * তোমার প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। 'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়' —এই কথা জানিবার জন্যই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীতে চিরদিনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে উপনিষদাদি তাবৎ শাস্ত্রে অনেক রকমে ইহা বিবৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু চির প্রচলিত 'বাঁশ বনে ডোম কাণা' এই প্রবাদ বাক্য এখানে অনেক সময় বাস্তবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ধার, বিজ্ঞের পক্ষেই অনেক সময় সুকঠিন হইয়া পড়ে। সাধারণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে যে একেবারে দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য।

এই গ্রন্থে, সেই সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেরূপ সহজভাবে ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এইরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পূর্ণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হও। (২২।১১।১৩৪০)

[৪]

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় ; শ্রীধাম নবদ্বীপ ;—

গ্রন্থকার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতে সকলের নিকট সুপরিচিত। গ্রন্থের ভূমিকায় মাননীয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, প্রিয়তম গ্রন্থকারের বংশানুক্রমে যে সুপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সুধী ও ভক্তি-রসিক ভক্তগণ মাত্রের হৃদয়ে এক অসাধারণ রসের সঞ্চার করিয়াছেন ; অথচ সেই ভূমিকাটি কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নহে—সকলই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারময়। প্রথমতঃ ভূমিকা পাঠ করিবার কালে আমি এত আনন্দ লাভ করিয়াছি যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। * * *

প্রিয়তম গ্রন্থকারকে আমি যখন প্রথম দর্শন করি, তখনই তাঁহার মনোমুগ্ধকর রূপ ও ভক্তিময় সুব্যবহারে এবং সুলালিত্যপূর্ণ ভক্তি-সিদ্ধান্তময় বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে (২৪ শ্লোক) পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতি মহোদয় কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপারসে অভিষিক্ত প্রিয়ভক্তগণের যে সকল সদ্‌গুণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই সকল সদ্‌গুণের সত্ত্বা ইঁহাতে উপলব্ধি করিতেছিলাম।

* * যেমন ভক্তি নম্রতা, তেমনি বিষয়বার্ত্তায় অরুচি, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, অর্থলালসায় বিরতি, শ্রীনামাশ্রয়ে সদা রুচি, ভক্তজনে বন্ধুতা, গুরুজনে নম্রতা, দীনজনে বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ইনি বিভূষিত। এতাদৃশ সদ্‌গুণে গ্রন্থকার আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার অতি আদরের সম্পদ 'শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর' পত্রিকায় ধারা-বাহিকরূপে বন্ধুপ্রবর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়ের লিখিত

'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যদ্যপি আমার আধুনিক লেখকগণের প্রবন্ধ পাঠ করিবার রুচি একেবারেই নাই, কিন্তু এই প্রবন্ধটি আদর ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অনেকস্থলে অনেক যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত আদরে গ্রহণও করিয়াছি। আধুনিক লেখকগণের প্রবন্ধ না পড়িবার কারণ—প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় উহাতে আপাততঃ রমণীয় এমন সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়, যাহাতে আমার পরমারাধ্য—পরমাশ্রয় শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণগণের সিদ্ধান্তের উপর গুরুতর আঘাত পড়িয়া থাকে; কিন্তু এই প্রবন্ধের ভিতর কোন একটি স্থানেও শ্রীপাদ গোস্বামি-গণের আনুগত্য ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও সিদ্ধান্ত ও যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। বিশেষতঃ এই গ্রন্থখানি যেমন ভাষা-লালিত্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে বিভূষিত তেমনি প্রতি ছত্রে অনুভূতি মাখা। * * * আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই গ্রন্থখানি বহুল প্রচার হইলে অনেক বহির্মুখ জীবের শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্তি লাভ হইবে এবং তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক অভিলাষ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইবে। * * (২।১১।১৩৪০)

[৫]

প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয়; কলিকাতা;—

শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যদিও গ্রন্থখানি বৃহদাকৃতি নহে, তথাপি ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের যথাযথ সমাবেশ হওয়ায় গ্রন্থখানি বড়ই মনোরম হইয়াছে। সংক্ষেপে, অল্প পরিশ্রমে

যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপযোগী।

সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে সিদ্ধান্ত সংগ্রহ এবং তাহার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টায় গ্রন্থকার প্রকৃতই প্রশংসা-ভাজন। প্রভু সীতানাথের চরণে আমরা গ্রন্থকারের মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং এইরূপ সরল মধুর ভাষায় আরও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রকাশের সামর্থ্য ভিক্ষা করিতেছি। (২৪।১১।১৩৪০)

[৬]

পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্য মহোদয় ; কলিকাতা।

* * * শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী উক্ত শ্রীভগবানেরই নিত্যপার্ষদ বংশসম্ভূত। বংশোচিত বহু সদ্‌গুণ তাঁহাতে নিত্য-বিরাজিত ; শ্রীমান্ সচ্চরিত্র, কৃষ্ণভক্ত ও আকৌমার ব্রহ্মচারী। উহার বিনয়াদি সদ্‌গুণে আমরা সর্ব্বদাই আকৃষ্ট। শ্রীকানুপ্রিয় ভক্তবৃন্দের প্রার্থনানুসারে 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্র সমালোচিত শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গদেশীয় বহু নরনারীর হিতসাধন করিয়াছেন। উক্ত শ্রীগ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুমধুর হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় বহু বৈষ্ণব সাহিত্যিক, গ্রন্থকারের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। আশা করি তাঁহার এই শ্রীগ্রন্থখানি বৈষ্ণব জগতে প্রচুরভাবে প্রচারিত হইয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রীমান্ কানুপ্রিয় সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের পরম হিতসাধন করুন। (১৫।১।১৩৪১)

[৭]

শ্রীল মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ; গোবিন্দকুণ্ড; শ্রীগোবর্দ্ধন।

শ্রীমন্ কানুপ্রিয় গোস্বামী 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে রসাভাসাদি রহিত হইয়া পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থের পঠন পাঠনে জীবের বিশেষ উপকার দর্শিবে। (৮।১।১৩৪০)

[৮]

পণ্ডিত শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয়; শ্রীখণ্ড।

শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি-বিরচিত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রথমে গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম যে, না জানি গ্রন্থকার এই জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়া ভাষার বিভ্রাটে গ্রন্থ সাধারণের দুর্ব্বোধ করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু আমার এই ধারণা অল্প সময়ের মধ্যে অন্যাকারে পরিণত হইল। দেখিলাম, ভাষার লালিত্যে এবং বিষয় সন্নিবেশের সারস্যে দার্শনিক জটিল বিষয়গুলিও কাব্যের মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত করিয়া, গ্রন্থকার সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। * * * এ-জাতীয় ক্ষমতায় তাঁহার অনন্যসাধারণতা না থাকিলে, মনে হয় তিনি সগৌরবে আত্ম-পরিচয় দানে কৌতূহলী হইতে পারিতেন না। গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক; কিন্তু আমরা তাঁহার পরিচয় বিষয়ে এই বলিতে পারি যে, তাঁহার নিজ বংশোত্থিত পৌরুষগ্রহে আবাল্য প্রচেষ্টায় তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণের উপযুক্ত বংশধর স্বরূপে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার স্বভাবশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফূরিত ভক্তি সিদ্ধান্তগুলি

দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্র সমন্বয়ে রত্নখচিত মণিদামের ন্যায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষী ভক্তবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থখানি বহুলভাবে সমাদর লাভ করিবে। (১৫।১।১৩৪১)

[৯]

স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সলার।

* * পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্ঞানপিপাসু এবং জটিল বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ইহা পাঠের বিশেষ উপযোগী। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্বজন সমাদৃত হইবে। (৩০।৩।১৯৩৪)

[১০]

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর; এম-এ, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যাঁহারা গ্রন্থকারকে জানেন, যাঁহারা তাঁহার প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে, গ্রন্থকার তাঁহার প্রাণের গভীর অনুভূতিতে তুলিকা ডুবাইয়া ভক্তিধর্ম্মের একখানি নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। ভক্তি-ধর্ম্মের এরূপ সরল অথচ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার প্রেমভক্তির সাগরে অবগাহন করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা অপার; ইহাই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে বারবার মনে হইয়াছে। একাধারে পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবোচিত দীনতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও অপূর্ব্ব রসজ্ঞতা, ভাষার অনাবিল প্রবাহ ও ভাবের স্বচ্ছন্দ লীলা—এই সকল গুণের সমাবেশে তাঁহার রচনায় যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (১৩।৪।১৯৩৪)

[১১]

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি

* * ইহাতে তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব রস-সংযোগে কমনীয় ভাষায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী করা হইয়াছে। শাস্ত্র-বাক্যের সহিত অকাট্য যুক্তি ও রমণীয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া এবং তাহার সহিত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রাণ গলান উক্তির সংযোজনা করিয়া গ্রন্থকার এক অভিনব পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

তিনি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে 'ভক্তত্বই জীব স্বরূপের পরিপূর্ণ সার্থকতা' এবং 'সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই জীবের পূর্ণতম লাভ।' তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'আমরা যে ভগবানকে পাই না, তাহার কারণ তিনি সুদুর্লভ বলিয়া নহে,—আমরা তাঁহাকে চাই-না বলিয়া।' আমার মনে হয় যে এই বইখানি ভাল করিয়া পড়িলে, এই 'চাওয়ার' পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং জীবন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া দিবার একটা প্রেরণা আসিবে। (৭।১।১৩৪১

[১২]

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র, হাইকোর্ট, কলিকাতা।

আপনার প্রদত্ত ও রচিত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। ভক্তি গ্রন্থের মধ্যে ইহা এক উচ্চস্থান লাভ করিবে এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনার জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদ নির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া

আমার মনে হইতেছে। আপনি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তিহীন জ্ঞানের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া শ্রীমৎভাগবত ও গীতাপ্রোক্ত ধর্ম্মকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা সুকৃতিমান্ পাঠকের মঙ্গল কল্পেই হইয়াছে। আপনার পুস্তকখানি ভক্ত হৃদয়ে আনন্দ প্রদানে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। * * * (১৩।৫।১৯৩৪)

[১৩]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয়, কলিকাতা।

* * 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহু অধিকারের পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব কুলের অলঙ্কার।

* * তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তাহার মূল ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অসাধারণ বাগ্মী। আমি অনেকবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার অনুপম চরিত্র ও বৈষ্ণবতা সর্ব্বজন বিদিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামি-মহোদয় এই গ্রন্থে অতি সরল ও সুমধুর ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু দুর্ব্বোধ তত্ত্ব এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা সকলেরই সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কোন গভীর তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা দ্বারা স্বয়ং দৃঢ় বিশ্বাসে গ্রহণ করিলেই এমন ভাবে তাহা প্রকাশ করা যায়। যাঁহারা অল্প সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারমর্ম্ম বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে সফলকাম হইবেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ও এই গ্রন্থ পাঠে অনেক তত্ত্ব-বিচারে সাহায্য পাইবেন। (২৩।১।১৩৪৭)

[১৪]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়; 'লোটাস্ লজ'; কলিকাতা।

* * তোমার প্রীতি-প্রদত্ত অমূল্য গ্রন্থখানি আমি বিশেষ অভিনিবেশের সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতুল ও অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম। 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' তুমি যেরূপ বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া সুন্দর সুযুক্তি দ্বারা জগজ্জনকে বুঝাইয়াছ,—যেরূপ প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভক্তি-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছ,—কৃষ্ণপ্রেমের ক্রমবিকাশ ও পূর্ণ পরিণতির যেরূপ উজ্জ্বল আভাস ও সুমধুর আস্বাদন দিতে প্রয়াস পাইয়াছ, স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম-সুধা-সমুদ্রে চিরনিমগ্ন থাকিয়া কৃষ্ণগত প্রাণে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফুরণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-পিপাসুগণকে তাদৃশী অবস্থায় অব্যক্ত মধুরিমা ব্যক্ত করিতে যেরূপ চেষ্টা ও তৎসাফল্য লাভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অনেকবার অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। * * গোলোকগত তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের তোমার মত লোক-পাবন পুত্র লাভের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। * * (১৩।৪।১৩৪৪)

[১৫]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি-লিট্; বেহালা, কলিকাতা।

* * আমি শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

* * এই পুস্তকে লেখকের পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় আছে, তাহা অসামান্য। সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে দার্শনিক পুস্তকগুলি প্রায় গুরুপাঠ্য ও জটিল হয়; পাঠকেরা প্রণাম করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন; কিন্তু এ পুস্তকখানি সেই শ্রেণীর নহে। ইহার ভাষা সহজ, সুন্দর ও কবিত্বময়। লেখক নিজে বুঝিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং পাঠকের পক্ষে কঠিন তত্ত্বগুলি বুঝিতেও কষ্ট হইবে না। এই গল্প ও উপন্যাস-পরিপ্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে পুস্তকখানি বিশেষ প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। ইহার উদ্দেশ্য হিতসঙ্কল্পিত এবং উচ্চ। পাঠকবর্গ পুস্তকখানি হইতে অনেক উন্নত কথা শিখিতে পারিবেন।

(১১।২।১৩৪১)

[১৬]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনগুপ্ত; ভাজনঘাট; নদীয়া।

তোমার প্রণীত ও প্রদত্ত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি বাস্তবিকই ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ ও মধুর হইতেও মধুর। * * শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপা ও প্রেরণা ব্যতীত এরূপ দুর্ব্বোধ্য ও জটিল বিষয়ে এমন সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নহে। নিশ্চয় তাঁহারই প্রত্যাদেশে তোমার সুমধুর লেখনী হইতে এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভক্তিরসের ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে।

* * তুমি আমাপেক্ষা বয়সে ছোট, কিন্তু তাহা হইলেও তুমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন। তোমার ন্যায় সাধু মহাত্মার যে, "আমার এক গ্রামবাসী," ইহা পরম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি এবং বাস্তবিকই যখনই লোক মুখে তোমার সুখ্যাতি ও অশেষ

গুণবর্ণনা শুনি, তখন আমার হৃদয় পরমানন্দে পরিপ্লুত হয় এবং তোমার ন্যায় সাধু ব্যক্তিকে আমার স্বগ্রামবাসী ভাবিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করি। * * (৭।২।১৩৪১)

[১৭]

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল ; ভাগবতের অনুবাদক ; অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ; কলিকাতা।

'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম। পুস্তকখানির উপর বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত, যাহা পুস্তকের পরিশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার উপর মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অধিক কিছু বলা পিষ্টপেষণ মাত্র ; সেই জন্য সমালোচনা না করিয়া, কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর এমন একখানি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। গীতার সহিত এই পুস্তকখানি কলেজের ছাত্রগণের পাঠ করা বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করি। শ্রীমদ্ভাগবতকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের বোধগম্য করার জন্য যে টীকা লিখিতেছি, তাহা উপলক্ষে এইরূপ একখানি পুস্তক খুঁজিতেছিলাম, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইল। * * * (২।২।১৩৪১)

[১৮]

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, সরস্বতী ; এম. এ. মহোদয়, কলিকাতা।

স্বনামধন্য বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যথার্থই বাঙ্গালীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার ছাত্রজীবন কেবল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য বা অর্থকরী বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যেই প্রধাবিত। ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি দূরের কথা,—প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও দেশের শিক্ষানিয়ন্তৃগণের বিশেষ কোন চেষ্টা নাই ; ইহা বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য। * * ছাত্রগণের মনে এখন নাস্তিকতার প্রভাবই শক্তি সম্পন্ন। কর্ম্মজীবনের সাধুতা ও সরলতা সেই জন্যই এখন লুপ্তপ্রায়। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। গ্রন্থখানির সরলোদার ভাষা, পারমার্থিক সিদ্ধান্ত-সমূহের শাস্ত্রানুমত বিশ্লেষণ এবং প্রাণের অনুভব সম্ভূত উপদেশাবলীর উজ্জ্বলতা ও মর্ম্মস্পর্শীতা যে অতীব প্রশংসনীয় এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ গ্রন্থকার 'আপনি আচরি' পরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন। আমি ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া এইরূপ ধর্ম্মপথের গহন বনে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি বিকিরণ করুন। বাঙ্গালীর জীবনপ্রবাহ পুনরায় ধর্ম্মের পথে পরিচালিত হউক। (২৪।৪।১৩৪১)

[১৯]

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল., পি. আর. এস., বেদান্তরত্ন মহোদয় ; কলিকাতা।

* * আপনার 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' নামক পুস্তক পাইয়াছি ; তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের সুযোগে পড়িয়াছিলাম। পড়িয়া বেশ ভাল লাগিয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িবার সুযোগ হইল, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। * * (৩।৪।১৯৪১)

[২০]

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল; সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, কলিকাতা।

* * ইহা যে শুধু বৈষ্ণবের পাঠ্য তাহা নহে, যাঁহারা এই ব্যবহারিক জাগতিক সত্তার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ইহার মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যমশীল, জাতিধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সকলেই এই পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। * * * লেখক শুধু সুবক্তা ও সুলেখক নহেন, তিনি হৃদয়বান্ প্রেমিক বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহার লেখনীমুখে প্রেমবিগলিত অনুভবসিদ্ধ ভাবধারা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ ঘটে নাই। * * (২৫।২।১৯৩৪)

[২১]

ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহোদয়, সম্পাদক, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষৎ। কলিকাতা।

স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক এবং অত্যন্ত সুবক্তা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়ের গ্রন্থ 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' পাঠ ক'রে অত্যন্ত উপকৃত ও ধন্য হয়েছি। আলোচ্য বিষয় এত সুব্যক্ত এবং গভীরভাবে অনুধ্যাত হয়েছে যে, এ-বিষয়ে এই গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয় বল্‌লে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

* * বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পরম ভক্ত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা, যেন তিনি এই প্রকার গ্রন্থের আরো বহুল অবতারণা ক'রে বর্ত্তমান যুগকে ধন্য-করে তুলেন। * *। (৬।১২।১৯৫৬)

[২২]

ভাগবত পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমৎ তিনকড়ি প্রভুর পত্র—

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ শরণম্।

আমি শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম', 'ভক্তিরহস্য-কণিকা' ও 'শ্রীনামচিন্তামণি'—এই গ্রন্থত্রয় শ্রবণ ও যথা সম্ভব অধ্যয়ন করিয়াছি।

আমি অনুভব ও ভাব-ভাষাবিহীন অজ্ঞ হইলেও, তথাপি আমায় ঐ গ্রন্থের অপ্রাকৃত চিন্ময় অক্ষরগুলিতে জানাইয়া দিয়াছে যে শ্রীমৎ ষড় গোস্বামিপাদের ভক্তিশাস্ত্র সকল ও বিশেষ ভাবে শ্রীমৎ জীবগোস্বামি-পাদের ষট্‌সন্দর্ভের ভূমিকা স্বরূপ হইয়া উহার প্রকাশ।

উক্ত গ্রন্থ সকলের গুণ-মহিমা বলিতে আমি অসমর্থ। তন্মধ্যে এই 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' গ্রন্থখানি উক্ত বিষয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের প্রথম পাঠ্যস্বরূপ বলিয়া মনে করি। ইহা বলিলে অত্যুক্তি কিছু হইবে না শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভৃতি মহানুভবগণের মতই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্নগামিনী অচিন্ত্য কৃপা মহিমায়—পরবর্ত্তীকালে এই গ্রন্থকারও এর মধ্যে একজন।

পরিশেষে আমি এই কথাই বলিতেছি যে গ্রন্থগুলি ঘরে ঘরে থাকিলে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং পরমার্থে পরমানন্দ ও পরমাগতি লাভ করাইতে পারিবে।

(স্বাক্ষর) কিশোরি-কিশোরানন্দ

তিনকড়ি

[২৩]

শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম বৈরাগী (formerly Mr. R. H. Nixion. M. A. (Oxon)

শ্রীশ্রীরাধিকা মোহনো বিজয়তে।

Uttara Brindaban,
P. O. Mirtala ; Dist. Almora.
20. 5. 34.

My dear Goswamiji Maharaj,

Very many thanks for your kind post card and good wishes. * *

Yes I have now read your book—a first reading that is to say, for it will repay further study but it would be quite inappropriate for one like me to express an opinion on it. I have not the competence and to attempt it would be অনধিকার চর্চ্চা। Nevertheless I must at least express my appreciation of the clear way in which you have expounded the main doctrines of Gouriya Siddhanta. The skilful way in which you have marshalled the shastric texts bearing on the subjects involved and the transparently clear exposition of the philosophy should make it an invaluable book for all Gouriya Vaishnavas and indeed for all who are interested in the teachings of Sriman Mahaprabhu. I at least have never come across any book which performed this task with such clearity and conciseness. Comparatively few people are aware that a carefully thought-out system of philosophy underlies the latter's bhakti-teachings and Kaviraj Goswami drew attention to the necessity of a study of 'Siddhanta' for those who wish to acquire bhakti. The original writings of the six Goswamis are

very voluminous (also expensive) and by no means all of them are available in Bengali. To make a complete study of them is beyond the power of most. In your book, however, all the essential doctrines of Goswami Siddhanta are available in a clear and compressed form which should be of great service to many and will perhaps encourage a few to go on to make a study of the original books such as 'Satsandarbha'; I can only hope that the book will reach all who care for these things—too few, I fear, in this materialistic days and that, by extracting profit for themselves from it, they will repay you for your labour of love. For myself, I shall value my copy no less for the kind thoughts which prompted you to send it to me than for the valuable thoughts expressed therein.

Please accept my pronams.

Yours very sincerely,
Sri Krishna Prem.

[২৪]

Prof. G. Tucci, Reale Accademia D' Italia.

My dear Sir,

It has been a great pleasure for me to read your book 'Jiber Swarup-o-Swadharma' which has renewed, as it were, my love of Lord Chaitanya-teachings.

To resume in a clear way the doctrine of his school and to expound the case and the essence of his thought is not an easy task; it is very difficult to analyse mystic experiences so deep and profound as those which inspired the Chaitanya-movement. But with the insight of the lover you could interpret all this and succeeded in giving a very interesting and very learned exposition of the fundamental points of the Vaishnava School of Bengal. With my revered thanks. (28. 8. 34).

[এইরূপ আরও অনেক অভিমত পত্র স্থানাভাবে বর্ত্তমানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।]

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা

(স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল)

আনন্দবাজার পত্রিকা ; ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

* * গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনেক কঠিন তত্ত্ব তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * * তাঁহার ভাষা সুন্দর, সে জন্য কঠিন দার্শনিক তত্ত্বও লেখার গুণে সরস হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বসুমতী ; ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

* * শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী বৈষ্ণব বংশধর। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বৈচিত্র্যের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এবং প্রেমধর্ম্মের সারতত্ত্ব সহজ ও সরল ভাষায় অতি অল্প শিক্ষিতের পক্ষেও সহজবোধ্য করিয়া এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণবতত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে চিন্তাধারার অভিনবত্ব আছে ; সে বিশ্লেষণে তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ভক্তিরসজ্ঞ পাঠক এই ধর্ম্মহীনতার যুগে তাঁহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। * * বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইবে সন্দেহ নাই।

হিতবাদী ; ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সাল।

* * তত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সাধকের চিত্তে যে কয়েকটি প্রশ্ন সর্ব্ব প্রথমে জাগ্রত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই কয়েকটি প্রশ্নই শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই এক প্রকার বা অন্য প্রকার সেই প্রশ্নকারীর মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জগতের সেই সকল সম্প্রদায়ের মূল প্রশ্নের মীমাংসা জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম নির্ণয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুলেখক ও সুবক্তা—নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী এই পুস্তকখানিতে জগতের সেই চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি স্বকপোল কল্পিত উত্তর না দিয়া, শ্রুতিশির উপনিষদ শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, এবং শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যে প্রণালীতে পরম বুদ্ধিমান শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই পুস্তকে অতি প্রাঞ্জল অথচ বিশুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ পাঠ করিলে অল্পায়াসেই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মূল কথা জানিতে পরিবেন।

শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ ; চৈত্র, ১৩৪০ সাল।

* * * এরূপ মধুর গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে আর আমাদের হস্তগত হয় নাই। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম জানা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ভজনই আরম্ভ হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই এই বিষয় চিন্তা না করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হই। সেই জন্য ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান উপলব্ধি হইবে। গ্রন্থখানিতে সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্ব ভক্তির ভিতর দিয়া নবীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভক্তি ও ভাবের

মধ্য দিয়া গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ হওয়ায় অতীব কঠিন তত্ত্বগুলিও একান্ত সুখবোধ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের ভাবের মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। অধুনা বৈষ্ণব সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ একান্ত বিরল। * * গ্রন্থকারের গোস্বামী শাস্ত্রের গভীর অভিজ্ঞতার প্রমাণ, গ্রন্থের প্রতি পত্রে সমুজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থে সরল অথচ মধুরাক্ষরে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। * * গ্রন্থকার শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া 'কে আমি? আমাকে কেন জারে তাপত্রয়' এই মহাবাক্যের উত্তর দিয়াছেন। অনুভূতির দ্বারা গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। যিনিই এই গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রবর্ত্তক ; ভাদ্র, ১৩৪১ সাল।

* * বাঙ্গালার বৈষ্ণব দর্শনের অন্তরঙ্গতত্ত্ব ও রহস্য যে, এমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করা যায়—ইহাতে আমরা নবীন গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব-পরিচয়ে সত্যই আনন্দলাভ করিয়াছি। সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয় ভেদে ত্রিবিধ প্রকরণে গোস্বামী মহাশয় এই দার্শনিক চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকট করিয়াছেন—কোথাও নীরস লাগে নাই; আগাগোড়া সমস্ত বিশ্লেষণের ধারা একটা আন্তরিক তন্ময়তা বিমিশ্রিত হইয়া এমন আস্বাদ্য রসনির্ঝরে পরিণত হইয়াছে, যাহা উপভোগ করিয়া অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কঠিন তত্ত্বকে এরূপ সরস, সজীব করিয়া তোলা, শুধু লিপি-কুশলতা নহে—মরমী ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই মনোরম বইখানি পড়িবার পর, বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনরাজ্যে অনুপ্রবেশ করিবার পক্ষে অনুকূল মানসিক ভিত্তি ও চিন্তাপ্রণালী লাভে যথেষ্ট সহায়তা হইবে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

উদয়ন ; ভাদ্র, ১৩৪১ সাল।

* * দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশ ; ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৫ সাল।

গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু শাস্ত্র, বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। সর্ব্বোপরি তিনি আদর্শ ভক্ত এবং সাধক। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সরসভাবে পরিস্ফুট করিবার দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁহার লেখায় প্রভূত মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যুক্তির বিন্যাসভঙ্গী জটিলতা-বর্জ্জিত এবং সহজ ও সরল। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রথম সংস্করণ বংলার চিন্তাশীল জগতের সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

The Amrita Bazar Patrika ; 1st. April, 1934.

* * The subject matter though purely theological and metaphysical are very lucidly explained in this work in a style, chaste, elegant and eloquent and the exposition is original, marked by cognet and scholarly reasonings. We have no doubt a careful and attentive perusal of this book will benefit every student of Vaishnavic Theology. Though this is the first work of its author, it reflects his considerable merit and scholarship, indicating his bright and promising future as a writer on subjects, theological, metaphysical and spiritual. We are optimistic of the author's success as a writer if he devotes himself assidiously to this particular field and we are happy to find ample evidence of this devotion in this, his first attempt.

The Advance ; 10th. June, 1934

This book by a devout Vaishnava and written in an elegant discusses some of the main tenets of Vaisnavism as preached by Sri Chaitanya Deva and shows the author as a person who has complete mastery over an intricate subject and very good graps over the problem of Prem and Bhakti, Jiba and Paramatma, as set forth by Sri Chaitanya. Vaisnavism has profound influence over the Bengali mind and this book is a sure indication that the study of such a subject occupies the leisure of many followers of the Saint of Nadia.

The East Bengal Times ; Saturday, June 22, 1935.

* * Every line of the book is eloquent of the fact that the author has a call from High to enlighten and warn the world rushing headlong towards a cataclysm under the fascination of siren sisters—woman and gold, the base of modern civilisation. * * We wish so much that this book were rendered into English so that the world might know that Goudiya Vaishnavism is the fulfilment of all world religions—the fulfilment beyond dream of the dreams and visions of the mystics and prophets of all times and climes; * *

ঝটিকা বিধ্বস্ত অন্ধকার নিশায় দিশাহারা পোতের মত, বর্ত্তমান ধর্মসঙ্কটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাস্ত্র নিরূপিত প্রকৃষ্টপথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ তিনখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী—প্রণীত

দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত বহু ধর্মাচার্য্য মনীষী, সুধী, সজ্জনগণ ও পত্রিকা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থিত ও অভিনন্দিত। প্রত্যেক গ্রন্থ সহ বিস্তারিত অভিমত পত্রে উহা দেখিতে পাইবেন। স্থানাভাবে কয়েকটি অভিমতের নমুনা মাত্র উদ্ধৃত হইল। ইহার একটি বর্ণও আমাদের নিজের কথা নহে।

১। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

"এই শ্রেণীর এমন একখানি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।" "ইহাতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে বিরল।" "সর্বতোভাবে অতুলনীয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।" চিন্তাধারার এরূপ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব অন্যত্র অতীব বিরল।" মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডি, লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন,—"অনুশীলনীয় বিষয়-গুলিকে গ্রন্থকার এমন সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বঙ্গভাষা জননীর রত্নভাণ্ডারে আর একখানি মহার্ঘ রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

২। শ্রীনাম চিন্তামণি

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

"দেশে ভগবৎবিশ্বাস ও ভক্তিভাবের পুনরুত্থান জন্য এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে পঠিত হউক।" "এ বিষয়টি সম্বন্ধে এমন পুস্তক নাই, একথা অসঙ্কোচে বলা

চলে।" এই শ্রীনাম চিন্তামণির কিরণ নানা ধর্মতত্ত্বের নিবিড় গুহাভ্যন্তর আলোকিত করিয়াছে এ বিষয়ে সংশয় নাই।

শতজীব বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থরচনা করা সম্ভব নহে। আমার এই সুদীর্ঘ বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই।"

৩। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি টাকা মাত্র।

"ইহা 'কণিকা' নহে; কৌস্তভমণি।" "প্রতিছত্রে শ্রীজীবপাদের লিখন শৈলীর স্মরণ করাইয়া দেয়।" "আঁধারের মধ্যে বাতি পাইলাম! প্রাণ পাইলাম! শান্তি লাভ করিলাম—আপনার কৃপায়!" মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।" "সর্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপনি জলের মত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।"

মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডি-লিট, পদ্মবিভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন "ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্ম্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্তসমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। গ্রন্থকারকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এতদিনে ঐ অভাব দূর করিলেন।" এইরূপ বহু বহু। প্রত্যেক পুস্তক পাঠাইতে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। সত্বর সংগ্রহ করুন। নূতন সংস্করণের মূল্য অনেক বর্দ্ধিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীরমানাথ গোস্বামী,

৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইক পাড়া, কলিকাতা-২

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

"পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।"

পরতত্ত্ব-সীমা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী
সার্থক হইবার দিন আগতপ্রায়।
সেই সুসংবাদ বহন করিয়া, কলিকৃত তিমিরের
আলোক স্বরূপ—শ্রীভাগবত-ধর্মের সার মর্ম
"শ্রীভাগবতী-বাণী গ্রন্থমালা" নামে
ধারাবাহিক আলোচনার সঙ্কল্প লইয়া, উহার
প্রথম মালিকা **"মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ"** প্রকাশিত হইয়াছে।
জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম, শ্রীনাম চিন্তামণি, শ্রীভক্তি রহস্য-কণিকা
প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা বৈষ্ণবাচার্য্য
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়ের
ভাষণ, প্রবন্ধাকারে রূপায়িত হইয়া,
শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
ইহা পাঠে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন,
কলিকৃত এই ধর্ম সঙ্কটের অন্ধকার মধ্যে।

ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য যথাসম্ভব সুলভ।
১·৭৫ মাত্র। ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

—প্রধান প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরমানাথ গোস্বামী,

৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্র-পরিচয়

শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবস্থ নিত্যধামের নিত্য পরিকর-গণ হ'তে আরম্ভ ক'রে ভক্ত পরম্পরাক্রমে—পবিত্র শঙ্খ-ধারার মত ভক্তিধারা নেমে আসেন বিশ্ব-প্রপঞ্চে। সেখানে এসে ভক্তি দীর্ঘিকারূপে বিরাজ করেন তিনি।

তথায় মরালরূপ সাধুসঙ্গ ও তা'থেকে উত্থিত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদিরূপ হরিকথার যুগপৎ সংযোগ হ'তে, অনাদি সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত—কমলস্থানীয় জীবে, সঞ্চার হয়—শুদ্ধাভক্তি। জীব-কমল তথায় বর্দ্ধিত হ'তে থাকেন—ভক্ত-মরালের সেবায় ও সঙ্গে। উক্ত চিত্রে প্রথমে ব্যাঞ্জিত হ'য়েছে—এই অভিপ্রায়ই।

পঙ্কোত্থিত কমল-কলিকার মুকুলিত অবস্থা থেকে প্রস্ফুটিত শতদলে ক্রমিক অভিব্যক্তির মত' জীব-হৃদয়-কমলও যথাক্রমে 'শ্রদ্ধা' 'সাধুসঙ্গ' 'ভজন-ক্রিয়া' 'নিষ্ঠা' 'রুচি' 'আসক্তি'-রূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে, পরে 'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি' বা প্রেম-শতদলে পরিণত হ'য়ে থাকে—শুদ্ধাভক্তির সংযোগে।

'ভজন-ক্রিয়ার' আনুষঙ্গিক ফলেই ক্রমে নিবৃত্তি হ'য়ে যায়—ভজন পথের সকল অনর্থ।

চিত্রে, সরসীস্থিত আটটি কমলের ক্রমিক বিকাশ দ্বারা প্রদর্শিত হ'য়েছে—জীব-হৃদয়ে প্রেমোদয়ের সেই ক্রমিক অভিব্যক্তি।

ফুল্ল-কমলিনীর স্নিগ্ধ সুবাসের প্রীতি আমন্ত্রণে আকৃষ্ট হ'য়ে, মধুব্রত যেমন স্বেচ্ছায় সাধু ক'রেই ছুটে এসে সংবদ্ধ হয় তামরস-কোষে,—প্রেম-পরিমলে আকৃষ্ট হ'য়ে স্বয়-মুনীন্দ্র-দুর্লভ শ্রীভগবানও সেইরূপ ভ্রমরের মত ভক্তের হৃদয় দুয়ারে আপনিই আসেন; এসে ধরা দিয়ে আবদ্ধ হ'তে চান—ভক্তের প্রেম-পাশে। প্রস্ফুটিত শতদল-সকাশে ভ্রমরের আবির্ভাব-চিত্রে উহাই ব্যাঞ্জিত হ'য়েছে।

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট, কলিকাত